কাজল গাঁয়ের কাহিনী

শক্তিপদ রাজগুরু

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

সঙ্গীত-শিল্পী বন্ধু

এ কানন ও মালবিকা কাননকে

২০শে ফেব্রুয়ারী

এই লেখকের—

শালপিয়ালের বন

মনের মানুষ

অগ্নিস্বাক্ষর

মধুমাস

বনমাধবী

স্বপ্নময়ী

মায়া দিগন্ত

অমৃতের স্বাদ

ইত্যাদি।

রেললাইন থেকে প্রায় আঠার মাইল দূরে ছায়াঘেরা গ্রামসীমা ; গ্রামও নয়—জমাটি সহর বলা চলে না। কোর্ট কাছারি উকিল মক্কেল—দুচার জন ব্যবসাদার মহাজন আছে, ছোটখাট বাজার গঞ্জও আছে। তবে রাঢ় দেশের মুখথুবড়ে পড়া প্রান্তরের মাঝে কেমন যেন আকাশযোড়া নিস্তব্ধতার বুকে ওরা জেঁকে বসতে পারে নি। ওর আকাশে এখনও ধোঁয়ার কালো দাগ ওঠেনি—মেঘমুক্ত ঘন নীল আকাশ কুমারীকন্যার মত শুচিতা নিয়ে দিনের আলোয় জাগে আবার অসংখ্য তারার স্বপ্ন নিয়ে রাত্রির প্রহর গোনে।

যাতায়াতের উপায় বলতে বহরমপুর থেকে আঠার মাইল রাস্তা গরুর গাড়ী, পাল্কী না হয় পায়দল। অথবা পশ্চিমে মাইল তিরিশ দূরে সাঁইথিয়া রেল ইষ্টিশান, কাঁচা সড়ক আছে। সে-পথেও গাড়ী পাল্কীতে যাতায়াত করা যায়। বনবাসের

স্তব্ধতা বুকে নিয়ে কাজল গাঁ বেঁচে আছে। সভ্যতার গতিপথ ওখানে গরুর গাড়ীর বেগে এগিয়েছে, দীর্ঘ পথে পথে অপেক্ষা করে রাতের অন্ধকারে ডাকাত ঠ্যাঙাড়ের দল। একা দোকা পথ চলা যায় না। দল বেঁধে যাত্রীরা যাতায়াত করে ইষ্টনাম জপ করতে করতে। দুর্গম কোন তীর্থের মত ওর যাতায়াতের পথ—

কিন্তু কয়েক বৎসর হ'ল সে পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হয়ে উঠেছে। কাজল গাঁয়ের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। সাঁইথিয়ার দিক তেমনি দুর্গমই রয়ে গেছে—তবে সদরের সংগে যোগাযোগ ঘটেছে। খোয়া ঢালা রাস্তা। কয়েকখানা যাত্রীবাহী বাস চলতে সুরু হয়েছে। সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে, কাজল গাঁ জাগছে—অবস্থা অন্ধকারের বুক থেকে জেগে উঠছে রহস্যপুরী, তার একক বিচিত্র নিঃসংগ জীবনযাত্রায় অনুপ্রবেশ করছে ভিন্ন ধারা। কেউ কেউ বলে রন্ধ্রগত শনি। তাদের প্রসার প্রতিপত্তিতে হাত পড়বে কিন্তু তবুও এ পরিবর্তন এল কাজল গাঁয়ে।

গড়ে উঠল মটর অপিস—বাঁশ-বনের আড়ালে খানিকটা জায়গা সাফ-সুতরো করে চালাঘরও উঠেছে—লাল নীল রংএর গাড়ীগুলো কি যেন এক রহস্যঘেরা; ওরাই সহরের নাড়ীতে চাঞ্চল্য এনেছে। হর্ণের শব্দ নীরব ছায়াঘেরা পরিবেশের শান্তিভগ্ন করেছে।

শ্যামের চা খাবারের দোকানে বিক্রী বেড়ে চলেছে। রেণুবাবুর দয়াতেই কোম্পানীর সীমানায় সে এই জায়গা পেয়েছে। মালিকদের চেয়েও কোম্পানীর প্রতিভূ ওই রেণুবাবুকেই বেশী খাতির করে সে।

হাতের কাছে চায়ের গেলাস আর গরম সিংগাড়া দুটো এগিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—সেবা করুন গো দাদা।

রেণুবাবু একটু ভোজনবিলাসী ব্যক্তি, হাতে কালো কারে বাঁধা ঢোলের মত মাদুলি, বাবা রুদ্রদেবের থানে অমঙ্গলের জন্য ধারণ করেছে। গোঁফগুলো বারদুয়েক জানলার খড়খড়ির মত ওঠানামা করিয়ে বলে,—

—পেঁয়াজ-টেঁয়াজ দিস্‌নি তো?

—আজ্ঞে কি যে বলেন? দেখুন ঘিটা, নরু গোয়াল দিয়ে গেল, তিনটাকায় দেড়সের।

রেণুপদ এককাগড় দিয়ে তারিফ করে—না, ভাল বানিয়েছিস। আর এই চা টায় নেশা ধরিয়ে দিলি দেখছি। সাহেবী নেশা যেরে ?

হঠাৎ রেণুপদ শশব্যস্ত হয়ে ওঠে, গরম চা এক ঢোক মুখে পুরে বসেছে, না পারে ফেলতে না পারে গিলতে। চোখমুখ কপালে উঠে পড়েছে।

চটির শব্দ—ভারি গলার আওয়াজটা শোনা যায়, এগিয়ে আসছে এইদিকেই। পঞ্চা ময়রাকে ইসারা করে দেখায় রেণুপদ, কথা যেন ঠিক বার হচ্ছে না।

—পালা, গেলাসটা তুলে নিয়ে পালা। ঠাকুরমশায় আসছেন।

চা-টা কেউ খাক তিনি পছন্দ করেন না। সাহেবী নেশা।

কোন রকমে বাকী পানীয়টুকুকে উদরজাত করে রেণুপদ সামলে উঠেছে, খাতাপত্র টিকিট বই নিয়ে বসে পড়ে পেন্সিলহাতে যোগ বিয়োগ করতে।

—কি গো রেণু, তোমার নটার ট্রিপ গেল ?

রেণুপদ উঠে দাঁড়াল—এই ছেড়ে দিলাম বলে।

—তাই দাও বাপু, ওরা বড় চেঁচামেচি সুরু করেছে। হাজার হোক ট্রেন ধরতে হবে তো, মাঝ পথে নদী, একা নদীই ষোল ক্রোশ।

রেণুপদ হাতের গলেপড়া ইষ্টকবচ সামলাতে সামলাতে উঠে গেল। প্যাসেঞ্জাররা নিশ্চয় সাতপাঁচ করে লাগিয়েছে মালিককে। ভাল করে বসিয়ে ওদের সুযোগ সুবিধা মত গাড়ী ছাড়ে কি না, তাই পেয়ে বসেছে। আজ গুড়ের নাগরী বোঝাই করে ছাড়বে ওদিকে। মর তোরা গুঁতোগুঁতি করে গাড়ীর মধ্যে।

বেশ মেজাজের সংগে হুংকার ছাড়ে রেণুপদ,—উঠুন গো সব, নটার ট্রিপ ছাড়ছি। মোনা গাড়ীতে ষ্টার্ট দে।

নামটা ঠাকুরমশায়ে কি ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে তার হিসাব কেউ করেনি। সবাই শ্রদ্ধা সমীহ করে, ওই নামেই ডাকে, তিনিও খুব অখুসী হন নি তাতে ; ওদের ডাকটা এই ভাবেই বহাল হয়েছে।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ত্রিসন্ধ্যা জপ করেন, মাথায় বেশ বড়সড় গোছের একটা শিখা। চেহারাখানাও ব্রাহ্মণজনোচিত সুঠাম। কয়েক বৎসর আগে অবধি কোলিয়ারী অঞ্চলেই ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ছিলেন, কি কারণে কাজল গাঁয়ে কোন এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে আসেন। পথে আসবার সময়ই এই ব্যবসার

কথা তাঁর মাথায় ঢোকে। ইতিমধ্যে কোলিয়ারী অঞ্চলে বাস চোলু হয়েছে, পয়সাও রোজকার হয় মন্দ নয়, এবং মার খাবার ভয়টা কম এ ব্যবসায়। পথঘাট দেখে গিয়ে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির হলেন। এস-ডি-ও তাঁর কথা শুনে মহা খুসী। অন্ততঃ যাতায়াতের পথটা কিছু সুগম হবে বাস সার্ভিস হলে। তাঁর সুপারিশেই ডি-এম সাহেব মত দিলেন।

কাজল গাঁয়ের ইতিহাসে সেই দিনটি একটি স্মরণীয় তিথি। তিনখানা বাস একেবারে কলকাতা হতে তৈরী হয়ে ট্রেন থেকে ইষ্টিশানে নেমে এগিয়ে আসছে কাজল গাঁয়ের দিকে। ইতিপূর্বেই রটে গেল খবরটা। মটর আসছে—আর রাত্রি দুপুরে রামজোলার মাঠে পড়ে পড়ে ঠ্যাংগানি খেতে হবে না, প্রাণ হাতে নিয়ে পথ চলবার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল তারা! কোন হাংগামা নেই, গাড়ীতে উঠে বসো, টিকিট কাটো—ব্যস, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এসে পৌঁছবে গংগার ধারে—খেয়া পার হলেই সদর সহর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো লোকজন। মহাদায় থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন তাদিকে রমণবাবু। তাই সারা কাজল গাঁয়ের লোক নবাগত অপরিচিত এই লোকটিকে কি এক অদৃশ্য পথে আপনার করে নিতে পেরেছিল সেইদিনই।

মেঠো রাস্তার দুপাশে লোকজন জমে আছে, গ্রাম থেকে মুড়ি চিঁড়ে বেঁধে এসেছে বুড়ী—নাতি নাতকুড় নিয়ে। শীতের বৈকাল···হলদে রোদ জেলাবোর্ডের রাস্তার দুপাশে শিরীষ আম গাছের মাথায় ফিকে আমেজ এনেছে—পাখীর ডাক ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে; দূরে রাস্তার মাথায় দেখা যায় ধুলোর মেঘ উড়ছে, বাতাসে ভেসে আসে গুরু গুরু গর্জন। হর্ণের শব্দ কদাচিৎ শুনেছে তারা—আজ তাদেরই বাড়ীর পাশ দিয়ে যাতায়াত করবে ওগুলো। ঝকঝকে তিনখানা বাস বার হয়ে গেল কাজল গাঁয়ের দিকে। ধুলোর ঝড় ভেদ করে ওদের পিছনে ছুটছে আশে-পাশের গ্রামের ছোট ছেলের দল, কেউ বা পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছে ওগুলোর সংগে।

···তিনখানা বাস নিয়ে প্রথম এলেন রমণবাবু। রেণুপদ এসে জুটলো, রমণবাবু একনজরেই একে দেখে পছন্দ করেছিলেন।

—বেশ কাজকর্ম করো, তবে বাবা মানুষকে বিশ্বাস করি—সেটা যেন না হারাতে হয়। রেণুপদ তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে।

আজ চার বৎসর হয়ে গেছে। অবশ্য এর মধ্যে ঝড়ঝাপটা যে আসেনি তা নয়। রমণবাবু হাসিমুখে সেগুলোকে মেনে নিয়েছেন, এবং সদাহাস্যময় লোকটি চাদর গায়ে দিয়ে আর চটি পায়ে সদর কাছারী ডিম-এম পর্যন্ত যাতায়াত করে সে সবের একটা মীমাংসা করেন। সে ঘটনাও কাজল গাঁয়ের লোক অনেকেই জানে।

...রমণবাবুর বাস জোর চলেছে। তিনখানা গাড়ী হরদম দৌড়ে ও যাত্রী বয়ে শেষ করতে পারে না। বিশেষ করে কোন যোগ পার্বণের সময়, পুজোর আগে বাড়ী ফিরতি চাকুরে বাবুরা ভিড় জমান। ভিতরে রড ধরে, পাদানিতে ছাদে সর্বত্র ঝুলেও কূলকিনারা হয় না, এবং এসব সত্ত্বেও রমণবাবু নিজে তদারক করেন যাত্রীদের, কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার দিকেও তাঁর নজর। নিজের পয়সায় যাত্রীদের জন্য বিশ্রাম ঘর—ড্রাইভার ক্লিনারদের থাকবার ঘর তুলে দিয়েছেন। ওভার টাইম বলে আইনকানুন কিছু নেই। তিনি বলেন,

—ওহে নিতাই, দুট্রিপ বেশী দিয়েছো, বাড়তি টাকা দরকার হয় নিয়ে যাও নাহলে কাবারে নিও। এই তোমার জলপানি।

টাকাগুলো বুঝিয়ে দিয়ে তিনি গঙ্গাস্নান করতে চলে গেলেন গামছা কাপড় নিয়ে। বৈষ্ণব মানুষ, রোজই কাজল গাঁ থেকে স্নান করতে আসেন আঠার মাইল দূরে গঙ্গায়। ভোর পাঁচটায় প্রথম ট্রিপ ছাড়ে সেই গাড়ীতে তিনি আসেন—ফেরেন দশটার ট্রিপে। রোজই তাঁর এই প্রোগ্রাম। বলেন,

—স্নানাদিও হয়, তাছাড়া কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধাও দেখা দরকার। নিজে না দেখলে দেখবে কে?

ঠাকুরমশাইকে ঘিরে ধরেছে কয়েকজন যাত্রী।

—বাড়ী যেতে পারবো না ঠাকুরমশাই?

—এতদূর এসে শেষকালে এইখানে ঠেকে যাবো?

না-না। ও মদন, অন্য কোন গাড়ী থাকে তবে স্পেশাল ট্রিপ একটা দাও হে। এনারা সব আটকে পড়েছেন।

স্পেশাল ট্রিপ দেওয়া মানেই অনেক হাঙ্গামা। সরকারের ঘরে রিটার্ণ পাঠাতে হবে, সে অনেক ফৈজৎ। কিন্তু মালিকের হুকুম—না করতে পারে না। মদন তাই

প্রথম চুপচাপ থাকে। কিছুদিন থেকে সে এই পথ ধরেছে। কানে কম শুনছে সে। অর্থাৎ প্রায় কালা হয়ে পড়েছে।

এতে অবশ্য লাভ ছাড়া লোকসান নেই। অনেক অপ্রিয় প্রসংগ এড়িয়ে যাওয়া যায় এই কালাগিরির দোহাই দিয়ে। ঠাকুরমশায় হাসেন।

—রোগটাকে আর সারিও না মদন, নানা উপকারে লাগবে। পুষে রাখো।

…বেশ চলেছে কারবার, তিনখানা গাড়ী থেকে চারখানাতে দাঁড় করিয়েছেন তিনি। ক্রমশঃ খবরটা ছড়িয়ে পড়ে—মধুর চারপাশে যেমন মৌমাছি জোটে—তেমনি ডি-এম অপিসের বাবুদের কাছে দু চারজন ইতিমধ্যেই জুটে গেছে কাজল গাঁ লাইনে বাস পারমিটের জন্য। ফণী চক্রবর্তী মশায় করিতকর্মা লোক। শীর্ণকায় লোকটি, কাজল গাঁয়ের মধ্যে একজন নামকরা ব্যক্তি। মামলা-মোকদ্দমার ঘুণ—লোকে সহজে তাঁর ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে চায় না, বলে ওর সাতহাতের মধ্যে গেলেই নাকি মামলা বাধবে। এড়িয়ে চলে তাকে।

ধানচালের রাখি কারবার করে বেশ দুপয়সা কামিয়েছে; নোতুন বাড়ীর মাথায় লক্ষ্মীর মূর্তি গড়ে হাতে তুলে দিয়েছে একটা প্রকাণ্ড ঘট, যেন শূন্যপথে মা লক্ষ্মী তার মাথায় স্বর্ণবৃষ্টি করছেন। এ হেন চক্রবর্তী মশায়ও উঠে পড়ে লেগেছে বাস পারমিটের জন্য। খবর সবই রমণবাবুর কানে আসে। তাঁরই বাসে চড়ে ওরা যাতায়াত করে।

মোনা ড্রাইভার বলে, একি হচ্ছে রেণুদা, যারই শিল তারই নোড়া তারই ভাংগবে দাঁতের গোড়া। বাবাঠাকুরের গাড়ীতে চডে গিয়ে ঠাকুরমশায়ের সব্বোনাশ করবার মতলব।

রেণু গম্ভীর ভাবে বলে—প্যাসেঞ্জার লক্ষ্মী রে।

—হুঁ—অলক্ষ্মী।

চক্রবর্তীমশায় পয়সাকড়ি খরচা করেই সদর থেকে সেদিন হাসিমুখে ফিরে আসে। কথাটা প্রকাশ হতে দেরী হ'ল না। একা তিনি নন—সদরের বসন্তবাবুও পেয়েছেন বাস পারমিট এই রুটে। সারা জেলায় যেখানে একটু রাস্তার চিহ্ন আছে সেইখানেই বাস চালাবার চেষ্টা চলেছে—সভ্যতার ঢেউ সর্বত্র বইয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সরকার।

মাসখানেকের মধ্যেই ঘটল ব্যাপারটা।

যাত্রী তেমন কিছু বাড়েনি, বেড়েছে কয়েকখানা বাস। সাধারণ চাষী-বাষী অনেক রয়েছে, ওই আঠার মাইল পথ তারা ছেলেবেলা হতেই হেঁটে আসছে। ও তাদের কাছে কিছু নয়। পায়ের সুড়সুড়ি মারবার পথ।

ফলে তিনটা কোম্পানী এগিয়ে এল ঠাকুরমশায়ের বাসের প্যাসেঞ্জার তুলতে। ক্রমশঃ সুরু হ'ল টানাটানি।

ট্রেন থেকে প্যাসেঞ্জারকে মোটবহর নিয়ে নামতে দেখে এগিয়ে যায় মদন—ঠাকুরমশায় কোম্পানীর গাড়ীতে আসুন দত্তমশায়।

—ওরে মালগুলো তোল্! অন্যজন বলে।

—আটআনা ভাড়া দেবেন আসুন কাজল গাঁ! চক্রবর্তী কোম্পানীর গাড়ী! একেবারে নোতুন। হাওয়ার বেগে যাবে।

—আটআনা। আটআনা। দর কমতে থাকে।

পুরানো প্যাসেঞ্জাররা অনেকেই অভ্যাসমত ঠাকুরমশাইএর গাড়ীতে উঠেছিল, তারাও নেমে পড়ে। দুআনা কমভাড়ায় যেতে পারবে।

চটে ওঠে মদন—ওকি দত্তমশায়! তিনবছর এই গাড়ীতে যাচ্ছেন, আজ দু'আনার জন্যে বিশ্বাস হারাবেন?

ওদিকে চক্রবর্তী কোম্পানীর গাড়ী ভর্তি হয়ে গেছে। ঠাকুর কোম্পানীর রেণুপদ নিজে গেছে ইষ্টিশানে, হঠাৎ হুংকার দিয়ে ওঠে রেণুপদ,—

—চলে আসুন ছ'আনা। কাজল গাঁ ছ'আনা।

আবার একচোট ঘোড়দৌড় সুরু হ'ল প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে। চক্রবর্তী কোম্পানীর ড্রাইভার হ্যাণ্ডেল নিয়ে তাড়া করে—ঠাকুরকোম্পানী তোলে 'জ্যাক'।

—চলে আয়। চারবছর গাড়ী চালিয়েছি, দুমাস দাতব্যি করে গেলেও দুধে হাত পড়বে না। জলের উপর দিয়েই যাবে।

বসন্তবাবুর ড্রাইভার বেগতিক দেখে হাত মিলিয়েছে ঠাকুর কোম্পানীর সংগে। বেশ কয়েকদিন কেটে গেল এমনি লাঠালাঠি ফৌজদারী হবার সম্ভাবনায়। চক্রবর্তীমশায় বিষয়ী লোক, একে গাড়ী কিনতে থোক টাকা গেছে—তার উপর মাসখানেক চলেছে লোকসানের উপর। তেল ড্রাইভার ক্লিনারের মাইনে সব কিছু

ঘর থেকে যাচ্ছে, সেদিন খোয়ার রাস্তায় ফেটেছে একখানা টায়ার, গেল কয়েকশো টাকা বাড়তি। বড় ছেলে অপূর্ব বলে,

—কেন এ-সবের মধ্যে গেলেন, যার কাজ তাকেই সাজে—আমাদের ও ব্যবসা নয়।

ঠাকুর কোম্পানী বেশ চালিয়ে যাচ্ছে। বাজারে সেই এসেছে প্রথম। লোকের একটা মমতা পড়ে গেছে তার উপর, তাছাড়া ঝড় বৃষ্টি বাদলা হোক গাড়ী ঠিকই সময়মত ছাড়বে।

শেষকালে বেগতিক দেখে চক্রবর্তীমশায় একদিন নিজেই হাজির হলো ঠাকুরমশাই-এর বাড়ীতে। বিস্ময় চেপে রেখে অভ্যর্থনা জানান ঠাকুরমশাই।

—আসুন, আসুন।

ছড়িটা দেওয়ালের কোণে রেখে বসলো ফণীবাবু। কথাটা কি ভাবে পাড়া যায় তাই ভাবছে। ঠাকুরমশাইও জানেন কেন এসেছে সে। নিজেরও লোকসান হচ্ছিল তবুও আগবাড়িয়ে কথা বলতে যেতে চাননি তিনি। ফণীবাবু বলে,

—এসেছিলাম একটা আপোষ পরামর্শের জন্য। জানেন তো এক কারবারী আমরা, আমাদের একটা মেলামেশা থাকা দরকার, বসন্তবাবুও আসবেন খবর দিয়েছেন।

—আমার তাতে আপত্তি থাকবার কি আছে। বলুন কি ভাবে কি করা যায়।

ঠাকুরমশাই বেশ জানেন তাঁর রোজকার হয়তো কিছু কমবে। কিন্তু তবুও একটা শান্তি আসুক। দিন বদলাবেই—একচেটিয়া ব্যবসা করবার দাবী তাঁর নেই।

এর কিছুদিন পর থেকেই গড়ে উঠলো কাজল গাঁ এটোমোবাইল এসোসিয়েশন। গাড়ীগুলো সবই কোম্পানীর—লাভলোকসান হোক যৌথভাবেই চলবে। ভাড়া ঠিক হলো থার্ডক্লাস বারোআনা।

এতদিন প্যাসেঞ্জাররা বেশ ফাঁকি দিয়ে মজাসে গিয়েছিলো—এইবার থেকে সেটা বন্ধ হলো। ঠাকুরমশাই হলেন তার সেক্রেটারী। জাঁকিয়ে বসলো কোম্পানী সহরের মধ্যে, বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে গ্যারেজ, যাত্রীদের বিশ্রামের ঘর, চায়ের দোকান—সবই গড়ে উঠলো। রেণুপদকে আর মোটা দেহ নিয়ে

ছুটোছুটি করতে হ'ল না। সে এখন কোম্পানীর হেড ক্লার্ক—একাধারে সবই। কাজল গাঁয়ের ইতিহাসে এও একটা অধ্যায়।

গরম সিঙ্গাড়া দুটো কোনরকমে পার করে রেণুপদ কাগজকলম নিয়ে বসেছে ঠাকুরমশাইকে গতদিনের হিসাব দিতে।

-- রোড সাইড এত কম কেন হে ?

সদরের অপিস থেকে বুকিংক্লার্ক মদন টিকিট কেটে প্যাসেঞ্জার তুলে দেয় তার হিসাব থাকে টিকিটে, কিন্তু পথে যে দু চারজন ওঠে তাদের কোন হিসাব কিতাব নেই। ড্রাইভার কনডাকটার যা দেয় জমা তাইই নিতে হয়।

—আজ্ঞে ও গাড়ীর ড্রাইভার ছিল তারিণী।

—তিনট্রিপে একটাও রোড সাইড নেই ? ইয়ার্কি পেয়েছে সে ? এদিকে জলপানিও ঠিক নিয়েছে। সে এলে পাঠিয়ে দিও।

বাইরে কিসের গোলমাল শুনে বার হয়ে এল রেণুপদ। মোনা ড্রাইভার গাড়ী থেকে জোর করে নামাচ্ছে একজন যাত্রীকে।

—টিকিট দেবে না গাড়ীতে উঠবে কি হে !

লোকটা কান্নাকাটি করছে—ছেলে বেমার পড়ে আছে বাবু হাসপাতালে। একটি পয়সাও নাই।

– দেখি কাছাটা, ওই ফতুয়ার পকেট।

দু'জনে মিলে চেপে ধরেছে লোকটাকে, তল্লাসী করতে বার হ'ল একটাকা তিনআনা। লোকটা কেঁদে ফেলে।

– দুটো ফলপাকড় কিনে নিয়ে যাবো বাবু ছেলের জন্য।

রেণুপদ গম্ভীরভাবে বলে—কি করবো বল কত্তা, কোম্পানীর গাড়ী, ভাড়া তো দিতেই হবে।

টাকাটা হাতের তেলোয় নিয়ে বাজাচ্ছে রেণুপদ। লোকটা ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে। বার হয়েছেন ঠাকুরমশাই। চটিপরা খালি গা, পৈতেটা ঝুলছে। কর্মচারীরা সরে দাঁড়ালো।

—কি হয়েছে ?

জবাব দেয় মোনা—পয়সা আছে তবু ভাড়া দেবে না।

—ওর টাকাটা ফিরিয়ে দাও রেণু। ভাড়াটা আমার নামে খরচা লিখো।

লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেন—কি হয়েছে কত্তা তোমার ছেলের?

কণ্ঠে কি এক অসীম ব্যাকুলতা। অতৃপ্ত পিতৃহৃদয়ের নীরব ক্রন্দন ফুটে ওঠে ওঁর কণ্ঠে।

—একজ্বরী হয়ে হাসপাতালে রয়েছে বাবু, আজ একুশ দিন হয়ে গেল, একটি মাত্র রোজকেরে ছেলে।

—বাড়ী ফেরবার সময় তুমি একে গাড়ীতে তুলে দিও রেণু, তোমার চ্যালা-চামুণ্ডারা যেন গোলমাল না বাধায়। বুঝলে—ভাড়া নিও না।

লোকটা চলে গেল। মোনা নীরবে গদিটা বার করে গাড়ীর নীচে ফেলে হাতুড়ি নিয়ে ঢুকলো—গিয়ারটা গোলমাল করছে। রেণুপদ ভিতরে চলে গেল।

—হিসাব দেখবেন না?

ঠাকুরমশায় কি যেন ভাবছেন গম্ভীরভাবে। হাসিমাখা মুখে ফুটে উঠে চিন্তার ছায়া, কি এক বেদনা গভীর ভাবে ফুটে উঠেছে সদাহাস্যময় ওই মুখে; রেণুপদর ডাক তার কানে ঢোকে না। তিনি অন্য কোন জগতের কথা ভাবছেন।

—হিসাবটা!

—ও!···হিসাব! ওটা থাক! ওবেলায় দেখবো। ছাতাটা তুলে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন তিনি।

রেণুপদ—বুকিংক্লার্ক হাবু একটু বিস্মিত হয়ে ওঠে।

কাজল গাঁকে কেন্দ্র করে ঘুরে গেছে কানা ময়ূরাক্ষী; পূবদিকে সুরু হয়েছে হিজলের বিল, গাঁ নামে হলেও আয়তনে সহরই বলা যেতে পারে। তবে বাসিন্দার চেয়ে ঝোপ বেশী; বিলের উর্বরা মাটিতে যেখানেই ফাঁক পেয়েছে সেইখানেই গজিয়েছে নরম ঘাসের গালচে—কালকাসিন্দা আলকুষী বন। বাড়ীর চেয়ে পড়ো বাড়ী কম নেই, আর আছে ভাঙ্গা দালান, কার্নিসে আলসেয় গজিয়েছে বট অশথের গাছ; শিকড় ফাটিয়ে দিয়েছে গাঁথুনিকে; শেওলাপড়া বাড়ীগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে অতীতের স্বপ্ন বুকে নিয়ে।

ফতেসিং পরগনা। নবাবী আমলে এই এলাকার চাক্‌লাদার, জমিদারদের প্রতাপ ছিল অসাধারণ। নবাবের হাজারী, পঞ্চহাজারী মনসবদারের নীচে ওদের পূর্বপুরুষ কেউ ছিলেন না। আজ তাদের ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে গেছে—চাপা পড়ে রয়েছে ওই ধ্বংসস্তূপের নীচে, বংশধররা টিকে আছে—সে নামেই টিকে থাকা। জমিদারী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে নস্যাৎ হয়ে গেছে। তবুও দুচার জন এখনও বেশ প্রসার প্রতিপত্তি নিয়েই আছেন। কাজে অকাজে এই অঞ্চলের এখন তাঁরাই নেতা।

…পূর্বপুরুষ ভাগ্য পরীক্ষা করতে এসেছিলেন বাংলার মাটিতে, অপরের ভূমিহরণ করেই জমিদারী পত্তন হয়েছিল তাদের; ভূঁইহার বলেই পরিচিত তারা। আজ তাদের বংশধররা গেড়ে বসেছে বাংলার বুকে—বাঙ্গালীই হয়ে গেছে—তবে সামাজিক চালটা এখনও চলে নি। কাজল গাঁয়ের কয়েকটি মহল্লার মধ্যে রূপপুর, আমীর পাড়া, খোসবাগ—নাম করা অঞ্চল। নাম আলাদা হলেও একই মিউনিসিপ্যাল এলাকাভুক্ত। তবে এক একটি অঞ্চল বিভিন্ন মুকুটহীন সম্রাটের তাঁবে।

খোসবাগের বাজার সবে খুলতে সুরু হয়েছে। দোকানদাররা ঝাঁপ খুলে ধুনো গঙ্গাজল দিচ্ছে টাটে, গোবিন্দর চায়ের দোকানে ছেলেটা তখনও ওঠেনি। গোবিন্দ হাঁকডাক করছে—হারামজাদার রকম-সকম দেখ না।

ফটিকবাবু প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ঘুরে এসেই বাইরের ঘরে বসবার আয়োজন করছে। হরেরাম বাবুর বৈঠকখানায় একটা খানদান আছে। বাবা—ছেলের আলাদা ঘর, সকাল বেলায় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসে দুটো বৈঠক। আড্ডাধারীর দলও বিভিন্ন। খোসবাগের মুকুটহীন সম্রাট-বংশ এরা।

তরিতরকারী নিয়ে চাষীর দল চলেছে কাজল গাঁয়ের বাজারের দিকে। ডাক দেন বৈঠকখানা থেকে হরেরামবাবু।

—কে আছিস, ওদিকে থামা।

দেউড়িতে গোলাপ সিং বসে বসে খৈনী মলছিল। একটা চোখ ছেলে-বেলাতেই বসন্ত হয়ে কানা হয়ে গেছে—বাকী আছে অন্যটা, কিন্তু তার শ্যেন-দৃষ্টির জন্য ওই একটিই যথেষ্ট। হুকুম পাবামাত্র ঘটা করে গিয়ে চেপে ধরল চাষীদের একজনকে।

ফাটা কাঁসির মত খনখনে গলায় আওয়াজ বের হয়—খাড়া রও।

অবশ্য স্বার্থটা তারও আছে। বাবুর বাজারে ওরা বসলে তোলা আদায় করতে যাবে গোলাপ সিং, তরকারীটাও মুফৎ জুটবে।

কর্তা চটিটা গলিয়ে বের হয়ে এলেন, বিশালভুঁড়ির উপর থেকে কাপড়ের কষি প্রায়ই নেমে যায়, একটা হাত দিয়ে ধরে থাকতে হয় সেটা।

—এ বাজারে কেন বসবি না তোরা?

চাষীগুলো দলবেঁধে চলেছিল মেয়ে পুরুষে। কাজল গাঁয়ের বাজারে লোকসমাগম বেশী; কোর্টকাছারির গায়েই বাজার, কোর্টফেরতা লোকজন মামলা সেরে ভালমন্দ তরিতরকারী কিনে নিয়ে ফিরে। খদ্দেরের মেজাজ দেখে দর হাঁকা যায়। কিন্তু এখানে তা চলবে না, আধসের—একপোর খদ্দের, ফাউ দিতে হবে, তার উপর বাকী। দোরে দোরে গিয়ে হামলা করতে হবে।

বুড়ো চাষী একজন ভবিষ্যযুক্ত হয়ে হরেরামবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় বুকে ঠেকিয়ে বলে ওঠে—আজ ও হাটে যেছি, মাপ করেন আজ।

—আমাদের হাটে কি পয়সা পাও না?

—সি কি বলেন আজ্ঞে! আর দিন আসবো আজ ক্ষ্যামা করেন।

হরেরামবাবুকে কোন কথা বলবার সময় না দিয়েই দলের মেয়েমদ্দদের উদ্দেশে বলে ওঠে - চলরে।

মাথায় বাজরা তুলে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলে কোন দিকে না চেয়ে।

হরেরামবাবুর পার্শ্বচর মুরারী বলে ওঠে,

—ব্যাটা চাষার বড্ড 'ওয়েল' হয়েছে। কাজল গাঁয়ের অনাদি হাটি ওদিকে আসরফি দেবে। হুকুম দেন—দেখুন দুলকি চালে গিয়ে ব্যাটার 'নেক' ধরে স্ট্রেট করে দিই।

কিছু বললেন না হরেরামবাবু। আজ সে ক্ষমতা আর নেই। থাকলেও কাজটা পূর্বপুরুষদের দর্শিত পথে আরও ভাল করে তিনি নিজেই করতে পারতেন। মুখটা অপমানে লজ্জায় সিন্দুরের মত রাঙা হয়ে ওঠে, কিছু না বলে ঘরে ঢুকলেন, ফটিক দূর থেকে বাবার দিকে চেয়ে থাকে। পরাজয়ের বেদনা তাকে নিষ্কৃতি দেয় না। সামন্ততান্ত্রিক নীলরক্ত মাথা চাড়া দিয়ে

ওঠে মনে হয় লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে ওই বাক্সরা সমেত লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। পরক্ষণেই সামলে নিল কি ভেবে।

রাস্তা দিয়ে সাইকেল হাঁকিয়ে চলেছে কাজল গাঁয়ের শচীন, কাজটা তার কি সঠিক তা কেউ জানে না। তবে গতি তার যত্রতত্র। থানা-এস-ডি-ওর বাংলো সর্বত্রই তার অবাধ গতি। সাইকেল থেকে মিত্রিরদের রকে পা রেখে সে শুনেছে সব কথাই। এগিয়ে গিয়ে ফটিকবাবুকে বলে ওঠে দাঁড়িয়ে দেখছো কি, দাও না ব্যাটাদের মুখ ছিঁড়ে, তারপর আমরা আছি। যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা।

ফটিক নামতে যাবে, বাবার ডাক শুনে দাঁড়ালো।

—মাথা গরম করো না ফটিক, ভেবেচিন্তে করা যাবে যাহোক।

শচীন তবুও বলে ওঠে—ওদিকে প্রশ্রয় দেবেন না বড়বাবু, মাথায় উঠে বসবে।

তবুও কেউ তাতলো না, জমলোনা ফৌজদারীটা। শচীন ক্ষুণ্ণ মনে সাইকেলে চেপে এগিয়ে চললো বাড়ীর দিকে।

ঢিলে-ঢালা জীবন। প্রায়ান্ধকার সহরের জীবনে কোন তাড়া নেই। কাছারি পাড়ার গায়েই বড় ইস্কুল। পাঁচিলঘেরা জায়গাটায় বহুকালের পুরানো কয়েকটা বট অশ্বত্থ গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখানে ওখানে মূর্তিমান বিদ্রোহের মত সোজা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দু' একটা নারকেল গাছ। ওপাশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সরকারী ট্রেজারীর সীমানা, বন্দুকের উপর সংগীন চড়িয়ে পুলিশ ফৌজ পাহারা দিচ্ছে, বাড়ীটার মাথার উপর এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে 'ইউনিয়ন জ্যাক'।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কয়েকটা চা খাবারের দোকান, রাস্তাটা খালের উপর সাঁকো পার হয়ে চলে গেছে গ্রামের দিকে। সহরের যেটুকু কর্মচাঞ্চল্য-প্রাণ এইখানেই। নিরবচ্ছিন্ন সময়কে এখানে চিহ্নিত করা হয় ঘণ্টাধ্বনি করে প্রহরে প্রহরে। জীর্ণ মলিন কোট প্যাণ্ট পরে, পোকায় কাটা শ্যামলা চাপিয়ে উকিল মোক্তারের দল মক্কেলের আশায় ওৎ পেতে থাকে।

—এই যে, ওগো মোড়ল, বলি হন্ হন্ করে যেছো কথি? শোন—শোন।

একজন মোক্তার বটতলায় উঠে গিয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে। রতন উকিলের মুহুরী বসেছিল কাছারীর বারান্দায়, ব্যাপার দেখে হাতের কলম কানে গুঁজে ছুটতে ছুটতে আসে।

—আরে পটল যে! এসো—এসো। বাড়ীর খপর-সপর ভালো তো?

মোড়ল অবাক—আজ্ঞে আমার নাম মুকুন্দ।

মুহুরীর মুখে খই ফুটে চলেছে—আরে যে পটল, সেই মুকুন্দ। এসো · কি বাধালে আবার?

অনেক কথা কাটাকাটির পর মুকুন্দ মোড়ল ছাড়া পায়।

—আজ্ঞে, ছেলেটার ব্যামো, ডাক্তারখানায় যেছি। মামলা করতে আসি নাই আজ্ঞে।

—ধ্যাৎতেরি! তিতিবিরক্ত হয়ে মুহুরী আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসো গজরাতে থাকে—সব শালাই ধম্মোপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়েছে আজ্ঞে, মামলা-ফামলা আর করবে না। এদিকে আমাদের চলে কিসে। নেহাত মাথাই ফাটা দু একটার। সবগুলোই মাদী হয়ে গেছে হে।

থামের কোণ থেকে হুঁকোটা তুলে নিয়ে তাতেই পড় পড় করে টান দিতে থাকে, হঠাৎ শোনা যায় গুরু গুরু শব্দ। কাছারীর অংগন-প্রাংগণ, ছাদ বারান্দা কাঁপছে। এগারোটার ট্রিপ আসছে। হুঁকো ফেলে রেখে ছুটলো মুহুরী মোক্তারের ঝাঁক। বাসটাকে ইতিমধ্যে ঘিরে ফেলেছে ওদের দল জালে মাছ ঘেরার মত।

—এই যে, এই দিকে। ভাল উকিল দোব, এক কোর্টেই সব সাফ হয়ে যাবে।

শচীন ছোঁ ছোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আশেপাশে। ছোট মক্কেলে সে হাত দেয় না। মক্কেল তৈরী করে কেস করায় সে। পুলিশ থানা পর্যন্ত তার হাতে। দরকার হলে সেইখানেই মুখবন্ধ করে দিতে পারে সে। মামলা কাছারি অবধি গড়াতে দেয় না।

ছোক্‌রা উকিল বসন্ত লাহিড়ীর ওখানে বসে আড্ডা জমাচ্ছে, আর তারই পয়সায় সিগারেট ফুঁকছে অনবরত। বলে ওঠে,

—ভালো মক্কেল আজ একটা হাত ছাড়া হয়ে গেল হে। পুলিশ কেস না হলে কি আর কাঁচা পয়সা আসে। দেওয়ানী মোকদ্দমায় মাপা পয়সা।

বসন্ত বলে ওঠে—কোথায় ?

—কোথায় আবার ! খোসবাগে। খোসবাগ ভারসাস কাজল গাঁ। বাঁধলো বলে। তুমি তৈরী থেকো ভায়া।

কাছারির বারান্দা থেকে বিজাতীয় কণ্ঠে হাঁক শোনা যায়—দীনু মড়ল হাজির-ই-ই।

বসন্তের মক্কেলের বাকী কর মামলায় ডাক পড়েছে। উঠে পড়ে সে তাড়াতাড়ি।

—সন্ধ্যায় আসবি কিন্তু।

ঘাড় নেড়ে শচীন বার হয়ে গেল।

কাজল গাঁয়ের সমাজতন্ত্রীতে শিক্ষার আলো এখনও অনুপ্রবেশ করেনি। দুচারজন যারাই একটু লেখাপড়া শিখেছে—তারা অন্নসংস্থানের আশায় বার হয়ে গেছে এখান থেকে। বর্তমানে সমাজ গড়ে উঠেছে উকিল মোক্তার আর ধবসেপড়া জমিদারনন্দনদিকে নিয়েই। এ সমাজের মধ্যমণি এস-ডি-ও সাহেব, মুনসেফ-হাকিমের দল নৈবেদ্যের উপর চিনির মণ্ডার মত শোভা পান। বড়জোর এখানে প্রবেশাধিকার জুটেছে অবনী হাটির মত ব্যবসায়ী দু' চারজনের। তারা নিজেরা আসে না—দরকার হলে চাঁদা দিয়েই খালাস। বাজে কাজে নষ্ট করবার মত সময় অবকাশ তাদের নেই।

সন্ধ্যাবেলায় নতুনপুকুরের ধারে বসন্ত লাহিড়ীর বৈঠকখানায় রুদ্রদেব তলার গাজনের কমিটিমিটিং বসেছে। বহুকালের পুরোনো জাগ্রত দেবতা। চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে চারদিনরাত্রি ব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। বৎসরের অন্য সময় কোন কর্তাদের সেখানে দেখা যায় না, ঘন বাঁশবন আম বাগানের মধ্যে শেওলাপড়া পুরোনো মন্দিরের মধ্যে বিরাজ করেন তিনি। এই ক'দিন বিগ্রহকে প্রকাশ্য স্থানে এনে নদীর ধারে পুরোনো মণ্ডপে বসিয়ে উৎসব সারা হয়। শৈব উপাসনার মূলক্ষেত্র রাঢ়দেশের মহোৎসব রচিত হয় এই মহাদেবকে কেন্দ্র করেই। দু চার পয়সা বেশ আমদানী হয়,—দোকান পশার—বাজীও এসে জোটে। আর আসে রাঢ়ের খেনো অঞ্চল থেকে গরুর

গাড়ী বোঝাই মেয়েপুরুষ, বুড়োবুড়ীর দল। কাজল গাঁ এই ক'দিন জমে ওঠে। সহরের জীবনে ওটা বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

হাঁকডাক করে কমিটি তৈরী করতে শচীন ওস্তাদ। আগে থেকেই সেই মূল-গায়েন হয়ে দাঁড়ায়, যাতে তার কায়েমী অধিকারে আর কেউ হাত না দিতে পারে।

কমিটিতে মটর কোম্পানীর ঠাকুরমশায়, অবনী হাটি, সরকারী উকিল মাধব-বাবু (বসন্ত অবশ্য মাধববাবুকে হাতে রাখবার জন্যই দলে এনেছে) আরও কে কে আছেন। এস-ডি-ও সাহেব প্রেসিডেণ্ট আর সেক্রেটারী শচীন।

বিপক্ষ দল অনেকে অনেক কথাই রটিয়েছে শচীনের নামে। পয়সাকড়ির ব্যাপারে শচীন কোনদিনই পরিষ্কার নয়। হিসাব-নিকাশ ঠিক কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেবে কিন্তু সেই হিসাবের রন্ধ্রপথে উট গলে বের হয়ে যেতে পারে। শচীন চিরকালই সেই এক ভাবেই চালিয়ে আসছে। বলে,

—দিন ঠাকুরমশায়, আমার চেয়ে যোগ্য লোক অনেক আছে। তাদের কাউকে ডাকুন। খেটে-খুটে এত দায়িত্ব নিয়ে এসব ক্রিটিসিজম সইতে পারবো না আমি।

ঠাকুরমশায় বলেন—ইংরাজী আমি বুঝি না বাবু, কাজের লোক থাকে এগিয়ে আসুক। যতদিন কেউ না আসছে কাজ তো চালাতে হবে।

এস-ডি-ও সাহেব ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে ওঠেন,

—আমার আবার লাইব্রেরী ওপেনিং মিটিং-এ প্রিজাইড করতে হবে। যা হয় আপনারা করুন, পরে খবর দেবেন আমায়।

তিনি বার হয়ে গেলেন। মাধববাবুকে ওদিকে বসন্ত নিয়ে পড়েছে,

—কালকের দেওয়ানী কেসটায় আপনার আর্গুমেণ্ট দেখলাম, কি সাফ্!

হাসেন মাধববাবু—একি দেখেছো বসন্ত, তোমাদের মত বয়সে কত দুঁদে হাকিম পার করেছি। গানডেন সাহেব—খাস লালমুখ, তাঁর সামনে যে সে উকিল এগোতে ভয় পেতো। গলাতো নয় যেন বাঘের ডাক—হৃৎকম্প উঠতো। তেমনি হাকিমকে একদিন ফ্যালসানি কেসে ঠাণ্ডা বানিয়ে দিইছি।

বসন্ত উকিল বড় হাকিমের সামনে গরুড়পাখীর মত বসে বসে হাত কচলাচ্চে।

—মাঝে মাঝে এসো হে। আজকাল ছোকরা উকিলরা পাশ করে এসে ভাবে সব জেনে ফেলেছি। এ বিদ্যার কি আদি অন্ত আছে?

ফাংসন কমিটির মিটিং এইভাবেই শেষ হলো। শচীন উপড়েঠে লেগেছে তোড়জোড় করতে।

উৎসবের আয়োজন লেগেছে কাজল গাঁ—রাঢ় অঞ্চলের আশে পাশে সর্বত্র। গ্রামে গ্রামে দল বেঁধেছে বোলান, গম্ভীরার।

শিব ভোলানাথ। সমাজজীবনের সব সমস্যারই তাকে সমাধান করতে হয়। গানের সুরে সেই দেবতার উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে নালিশ শোনায় তারা। বাঘছাল পরে ত্রিশূল হাতে শিব দাঁড়িয়ে রয়েছে শূন্য দৃষ্টিতে। ওরা গান গায়—

ওহে হর তোমার লীলা—
বুঝা বড়ো দায় হে।

…তার চেয়ে সমৃদ্ধশালী গ্রামে বসেছে যাত্রার মহড়া। থিয়েটার হবে কাজল গাঁ করোনেশন ক্লাবে। সরকারীলোক এবং সহরের কর্তাস্থানীয়দের ক্লাব। সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। বাকী লোক তাই ফাঁকা মাঠেই তরওয়াল ঘুরিয়ে এক্টো করে যাত্রার আসরে।

হরেরামবাবু শুনেছেন কথাটা। কমিটি তৈরী হলো তাঁকে একবার জানানোর দরকার বোধ করেনি কেউ। ফটিক খবরটা আনে কাজল গাঁয়ের রণজিত কেবিন থেকে। শচীন তাকে দেখে অন্যদিকে চলে গেল মুখ ফিরিয়ে। রাগে গজরাতে গজরাতে এসে সংবাদটা বাবাকে দিল। হরেরাম বাবু বলেন,

—কেন গিয়েছিলে তুমি আগ বাড়িয়ে চড় খেতে?

—এত বোকা আমি নই। কানে এলো শুনলাম।

একটু ভেবে হরেরামবাবু বলেন—আমাদের মোড়ল পুকুরের ধারে কালই খুঁটি আর কাঁটাতার দিয়ে বেড়া দেবার ব্যবস্থা করো। রুদ্রদেব নদীর ধারে যাবার দিন বেড়ার মধ্যে লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করবে। হ্যাঁ—জমিটাতে ইতিমধ্যে চাষ আবাদ দিয়ে কলাই ছিটিয়ে দাও।

বলে ওঠে ফটিক—ও যে বেহ্মডাং, ঘাস গজায় না কোনকালে।

—ফসল তুলতে চাইনি, চারা ভাংগানীর মামলা—অনধিকার প্রবেশ, আইনের ফাঁক বন্ধ করতে হবে তো। যাও, যা বলছি তাই কর গিয়ে। আর মাঠে কাজল

গাঁয়ের ছেলেরা ফুটবল খেলতে আসবে, হটিয়ে দিও। বলো চারা পুঁতেছি ও-মাঠে।

হরেরামবাবু ছেলেকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন।

মুরারী সামন্ত ঘুণ লোক, তাক বুঝে সেও যোগান দেয়—সত্যি তো। কয়েক-বছর খেলছে তারা। এইবার না তাড়ালে বলে বসবে দখল সাব্যস্ত হয়ে গেছে। হটানো দরকার ওদিকে।

চাকা নড়েছে, মুরারী সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে পায় ঈশান কোণে ঝড়ো মেঘ দেখা দিয়েছে; কালো মেঘের গায়ে কে যেন মুঠো-মুঠো আবীর ছিটিয়ে রাঙিয়ে তুলেছে। ঝড় আসছে। ভেঙে পড়বে কত বৃদ্ধবট—কাঠকুড়োনীর দল আশাভরে চেয়ে থাকে।

শচীন সাইকেল হাঁকিয়ে চলেছে, হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনে নামলো। পাড়াটার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। দুপাশে পচা নর্দমা ভ্যাঁট ভ্যাঁট করছে।

বাড়ীগুলো একটু নীচু—টিন কিংবা খড়ের ছাউনি। দিনের বেলাতে দেখা যায় বাড়ীর নীচু রকে বসে মেয়েরা এ-ওর মাথার চুল হাতড়ে উকুন মারছে—না হয় হাসাহাসি করছে। বয়স্কাদের অনেকে বিড়ি টানছে।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার রূপ বদলে যায়। রাস্তার আশেপাশের রকে লম্প জ্বলে ওঠে। কেরোসিন কুপীর লালাভ ম্লান আলোয় জটলা করে রূপোপ-জীবিনীদের দল।

—কি গা বাবু, সাঁ-সাঁ করে যেছো। একেবারে মনেই নাই পারা।

সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল শচীন।

—বল কি বলছিস?

—ওই পথে দাঁড়িয়ে সব কথা কি বলা যায়। দেখা হলো কতদিন বাদ, ঘরে চলো—চা পান খাবে।

—আজ সময় নেই। পরে আসবো।

হাসে গঙ্গামণি—তা আসবে বৈকি। নিজের দরকারে অনেকে অমন আসে গো। আমাদের দরকারে কাউকে পাওয়া যায় না।

—আবার কি ঠেকা পড়লো ?

—চলই না, বলছি।

পুলিশী হাংগামা আছে, নানা ফৈজৎ আছে এদের ব্যবসায়। সেই সব কাজকর্ম এদের শচীন করে দেয়। অবশ্য তার বিনিময়ে অর্থ বা অন্য কিছু দাম তার চাই। সেটা তারা দিতে কার্পণ্য করে না।

ঘরের ভিতর একটা তক্তপোষে বসেছে শচীন, গংগামণির ডাকে ওঘর থেকে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। সবে নোতুন এসেছে এপথে। কোন্ ঘাটের খড়কুটো কোন্ ঘাটে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে। কে জানে পিছনে কি ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে এসেছে ; হয়তো কোন দাবিদার এসে জুটবে পিছু পিছু।

শচীন চেয়ে থাকে ওর দিকে। শচীনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে অনভ্যস্ত মেয়েটি লজ্জায় মাথা নীচু করে ; অজানা ভয়ে কাঁপছে সারা দেহ।

—নোতুন বলে মনে হচ্ছে। শচীন মন্তব্য করে।

ঘরের ভিতর তক্তপোষে ধবধবে বিছানা পাতা, কয়েকটা ফরসা তাকিয়া গড়াগড়ি যাচ্ছে। দেওয়ালে ঝুলছে কয়েকটা পট, কোণে লক্ষ্মীর আসনের পাশে একটা অস্পষ্ট টেমি জ্বলছে। সারা ঘরখানায় একটা বীভৎস ছাপ মাখান ! থমথম করছে স্তব্ধ নির্জনতা। সারা ঘর জুড়ে—আদিম অরণ্যের নির্জনতা, গংগামণি কোন ফাঁকে বার হয়ে গেছে চতুর বিড়ালের মত। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে গেছে।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে ওর প্রকম্প দেহের দিকে। কেরাসিন কুপীর লালাভ ক্ষীণ শিখা নিভে গেছে দমকা বাতাসে ; ঘরখানায় নেমে এসেছে অন্ধকার। একটু অস্ফুট আর্তনাদ ক্ষীণ কণ্ঠে ভেসে ওঠে।

হু হু বাতাসে নড়ছে জানলার কপাট।

…বারান্দায় হাসিমুখে গংগামণি এগিয়ে আসে শচীনের দিকে।

—যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দাও বাবা। বোনঝি আমার কাছেই থাকবে।

—বড় বাবুকে বলি।

—উহুঁ, শুধু বলি নয়। একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তোমার ভরসাতেই আছি।

গলা খাটো করে বলে ওঠে গঙ্গামণি।

—যদি লাগে বলো বাবা, পান খাওয়া বাবদ দোব কিছু। আর তুমিও মাঝে-মাঝে এসো বাবা। কবে আছি কবে নাই। খোঁজ-খপরটা নিও।

বার হয়ে এলো শচীন রাস্তায়। সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে চললো, পাড়ার আশেপাশে সুরু হয়েছে নগ্নজীবনের আদিম অভিসার। কোথায় গানের সুর ভেসে আসে—মদ্যপ.জড়িত কণ্ঠে কে গান গাইবার চেষ্টা করছে কোনখানে।

সদ্য পাশ করে এসেছে অনিমেষ মেডিক্যাল কলেজ থেকে। এখানে এই অন্ধরসাতলে আসবার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। পাশ করে অন্য কোথাও প্রাকটিস্ করবে সে। কিন্তু পাকেচক্রে আসতে হল তাকে এই কাজল গাঁয়ে। এককালে বিশাল সম্পত্তির মালিক ছিল তার পিতামহ। কিন্তু জমিদারসুলভ মনোবৃত্তির সবগুলোই ছিল তার পূর্ণমাত্রায়। ফলে জমিদারী দেখতে দেখতে কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঁধা পড়লো ভূঁইহার পত্তনিদার ওই হরেরামবাবুর বাবার খপ্পরে। একহাজার দেনা দিয়ে সময় সুযোগমত একটা শূন্য বসিয়ে তাকে দশহাজারে দাঁড় করাতেও রাধাকিষণ পাণ্ডের বিবেকে বাধেনি। ক্রমশঃ এমনি করেই মিথ্যা দেনার দায়ে তার পিতামহ জীবিতাবস্থাতেই অনেকটুকুই সাফ করে গেছেন। বর্তমানে বাকী আছে ওই সামান্যতম অংশ।

অনিমেষের বাবা তখন সরকারী কলেজে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে বাইরেই থাকতেন। দেশের প্রতি আকর্ষণ তাঁর ছিল না এমন নয়, কিন্তু অতীতের প্রতিপত্তির তুলনায়—আজ তাঁর হীনাবস্থার কথা মনে করেই কোথায় যেন একটা গ্লানি বোধ হতো। তাছাড়া বাবার অতীত ইতিহাসটাও গৌরবজনক ছিল না। কোন একটি মেয়েকে নিয়ে সহরে খুব খানিকটা কুৎসা রটে; তাকে নিজের পয়সায় বাড়ীও করে দিয়েছিলেন, তার বংশধররাও নাকি আজও বেঁচে আছে। এই সব নানা কারণে তিনি দেশে বড় একটা আসতেন না।

অনিমেষ বাবা মারা যাবার পর কলেজ থেকে বার হয়ে কি যেন এক দুঃসাহসিক কৌতূহল বশেই কাজল গাঁয়ে এসে হাজির হলো। পথের কষ্ট সব ভুলে

গেল এইখানে এসে। নদীর ধারে বিরাট বাগানঘেরা বাড়ী—অযত্নে কাঁকর ঢালা পথে গজিয়েছে আগাছা—বনকাসুন্দির ঝোপ। কোথায় ফুটেছে কাঁঠাল চাঁপা গাছে অজস্র ফুল, ঘন কালো পাতার বুকে পিছলে পড়ে একফালি দিনের আলো। নদীর বুক থেকে বাঁধনহারা বাতাস আছড়ে পড়ে জানলার শার্সিতে।

বুড়ো মালি ভাল করে দেখতে পায় না, তবু তার মনে কত আশা আনন্দ উঁকি মারে।

—এলে দাদাবাবু, আজ শূন্যপুরীতে একা যক্ষের মত বসে আছি তোমাদের পথ চেয়ে।

·· কি এক অদৃশ্য মায়ায় আটকে পড়েছে অনিমেষ।

যেন সে এতকাল ঘুরেছে যাযাবরের মত, পাটনার কথা মনে পড়ে, শৈশব কৈশোর কেটেছে সেইখানে। কর্মব্যস্ত সহর, আজ সেখান থেকে কয়েক বৎসর চলে এসেছে আর কোন মায়া সেখানে নেই। কলকাতায় কেটেছে সাতবছর।

অনলস জীবনযাত্রা সেখানে তাকে যন্ত্রের মত কাজ করিয়ে নিয়েছে, অদৃশ্য দানব তাকে পিছন থেকে ঠেলে সাতবছরের ব্যবধান পার করে দিয়েই মনের স্নেহ মমতার কোন স্পর্শই রাখেনি। আপন করে টেনে নিতে পারেনি সেই মহানগরী অনিমেষকে। অনিমেষেরও কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রা অগণিত মানুষের শোভাযাত্রার ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ভেবেছিল এই বোধ হয় জীবন।

কিন্তু আজ অকস্মাৎ একটি মহামুহূর্তে সে থমকে দাঁড়ালো। স্তব্ধ দিগন্তের বুকে সন্ধ্যা নেমে আসছে, মানুষের সাড়া নেই। জাফরানী রং-এর মেঘের ভিড়ে ভরে উঠেছে পশ্চিম দিগন্ত। বাতাসে মেতে উঠেছে কাঁঠালচাঁপার সুবাস।···দিনের শেষ—সন্ধ্যার প্রারম্ভ। কোথায় আকাশে ডানা মেলে উড়ে গেল সাদা হাঁসের দল··· ক্লান্ত পাখার বিধুননে ইঙ্গিত আনে অসীম যাত্রার।

···পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি আজ সজীব হয়ে তার সামনে ফুটে ওঠে। ওদের কলঙ্কিত নাম সে দূর করে দেবে। বিস্মৃত বংশের বুকে নোতুন বংশধর গৌরবের সৌধ গড়ে তুলবে নিজের সাধনায়। এ যেন তার কর্ত্তব্য। মনে হয় সামনে মৃত আত্মার দল ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। নীরব ব্যাকুল চাহনিতে

চেয়ে আছে তার দিকে কি যেন আশা নিয়ে। সারা শরীরে শিহরণ জাগে। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে গড়ে-ওঠা মন তার সব শিক্ষা ভুলে গিয়ে মনে মনে সেই শপথ নেয়।

…তোমাদের নাম করতে আর কেউ শিউরে উঠবে না, তোমরা নিশ্চিন্ত হও।

…কখন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার বাগানে নেমে এসেছে খেয়াল করেনি অনিমেষ। দু'একটা তারার স্নিগ্ধ চাহনি ফুটে উঠেছে নীল নির্মল আকাশের আঙিনায়। মনে কি যেন শান্তির সন্ধান পায় সে।

—বাইরের ঘরেই বিছানা পেতো পূর্ণ।

—খাবার কি করবো দাদাবাবু?

—যা হয় করো, আমি একটু ঘুরে আসি।

…অপরিচিতের মতই বের হল সহরে। সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্যরূপ ফুটে উঠেছে সহরের। দেহাত থেকে ধানবোঝাই গাড়ীগুলো ফিরে গেছে। দু'চার জন রয়েছে পূর্ণ চক্রবর্তীর আড়তের কাছে নদীর ধারে বটতলায়। ইট কুড়িয়ে এনে উনুন তৈরী করে খড়ের জ্বালে ভাত রাঁধছে মালসায়। গরুগুলো নীরবে জাবনা খাচ্ছে। নদীর কাঁচ-ধার জলে ফুটে উঠেছে তারার প্রকম্প শিখা, ওপারের আম-জাম-সরবনে রাতের প্রথম জ্যোৎস্না কি এক মধুর স্পর্শ বুলিয়েছে। মটর অপিসের কোলাহল থেমে গেছে, লোহার পোস্টে জ্বলছে একটা আলো।

বাজারের নীচু খড়ের চালের দোকানে খদ্দেরের আশায় বসে আছে দোকানদার। অবনীহাটির কয়েকটা দোকানে জ্বলছে হেসাক।…অপরিচিতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সভ্যতার কোলাহল থেকে দূরে—নির্বাসিত এক প্রায়ান্ধকার সহরের পথে অনিমেষ। চোখে তার আগামী দিনের স্বপ্ন।…স্তব্ধ জীবনযাত্রার ক্ষীণ নাড়ীতে সে যেন শুনেছে আগামী নবজাতকের জন্মবার্তা, নির্জন…ধুলো-ভরা পথটা দিয়ে ফিরছে সে বাড়ীর দিকে।

কাছারী পাড়ায় অফিসারদের ক্লাবে বাজছে গ্রামোফোন—একফালি হেসাকের আলো নির্জন প্রান্তরের বুকে ছিটকে পড়েছে।

নির্জনতার বুকে ঝড় তুলে চলেছে হিমেল বাতাসের আনাগোনা।

কানাই কবরেজ বহুদিনের পুরানো লোক। বংশপরম্পরায় তিনপুরুষ ধরে কাজল গাঁয়ে গড়ে উঠেছে তাদের আটন। রম রম পশার, এখনও বৃদ্ধ বয়সে কানাই কবরেজ ও-চাকলার মধ্যে সুপরিচিত। তাকে না দেখিয়ে কেউ যেন মরেও শান্তি পায় না। বাজারের একদিকে তার বিরাট বাড়ী, বৈঠকখানায় রোগীদের ভিড় জমে সকালেই বেশী, অন্যসময়েও দু'চার জন আছে। ছোটখাট কেসের ব্যাপারে তার ভাইপো জগবন্ধু আছে, পুরোনো কর্মচারী নিধিরাম আছে। কানাই কবরেজ গায়ে একটা বালাপোষ জড়িয়ে পুরানো বন্ধুদের নিয়ে পাঁশায় বসে। এসময়টা দু-একটা খোসগল্পও হয়।

খবরটা শম্ভু সিং আনল—কাজল গাঁ এইবার পুরোপুরি সহর হয়ে গেল যে হে।

নিধিরাম কর্মচারী নামেই, পুরোনো আমলের লোক, কানাই কবরেজের পার্শ্বচর। গাল টেবো করে কলকেতে ফুঁদিয়ে টিকে ধরাচ্ছিল, হঠাৎ বলে ওঠে,

—তার আর বাকী কি আছে বলেন, শুনছি নাকি থানার সামনে ওই যে দত্তদের বেলগাছওয়ালা বাড়ীটা সেখানে গার্লি'ক ইস্কুল বসবে।

—সেটা কি হে?

—আজ্ঞে, ওই যে বল্লাম। গার্লি'ক ইস্কুল। মেয়েদের ইস্কুল। মাণ্টারও নাকি আসবে মেয়েছেলে।

কানাই কবরেজ রসিক ব্যক্তি, মন্তব্য করে—নিধুও নাকি চাকরি নেবে ওই ইস্কুলে।

হাসে নিধু; নিবিষ্ট মনে কলকেতে ফুঁ দিতে থাকে, তামাক তৈরী হয়ে এসেছে। শম্ভু সিং বলে ওঠে—বাজারে নোতুন ডাক্তারখানা হচ্ছে হে। এলোপ্যাথিক মেডিকেল পাশকরা ডাক্তার—এম. বি. এসেছে।

খবরটা বিস্মিত হবার মতই। দু'একজন যা এলোপ্যাথ আছে তারা প্রায় হাতুড়েই—একজন আছে ন্যাশন্যালে পড়া। সেই সহরের বড় ডাক্তার। তার চেয়ে অনেক বড় ডাক্তার নিজে যেচে সহরে এসে বসছে—একটু বিস্ময়কর ঘটনা বৈকি।

—কে হে, কে আসছে?

—পরমেশ সিংহ মশায়ের নাতি অনিমেষ।

পরমেশ সিংহ মশায়ের বিক্রমে বাঘে বলদে একঘাটে জল খেতো, তারই বংশ। আর কিছু হোক না হোক, তেজ যাবে কোথায়? প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তার মত দুঁধে ছেলে সত্যিই কঠিন। কানাই কবরেজ যেন কি ভাবছে। জগবন্ধুর কথাটা কানে যেতে টনক নড়েছে। কাকা একরকম ভালভাবেই তার কাল কাটিয়েছেন, পাল্কী হাঁকিয়ে সসম্মানে। কিন্তু সামনে তার ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। প্রথম থেকেই তার ইচ্ছা ছিল ডাক্তারি পড়তে যায়। কিন্তু কাকাই বাধা দিয়েছিলেন।

—আসুরিক চিকিৎসায় কি ফল হবে বাবা!…পিতৃ-পিতামহের আটনে বসো তাদের দয়াতেই ঠিক চলে যাবে।

জগবন্ধু চিনেছে খল নুড়ি, আসব রসায়ন, সূচিকাভরণ ইত্যাদি।

মনের গোপন কামনা আজ যেন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তার ভবিষ্যতের খ্যাতি কীর্তি আর একজন আসছে ছিনিয়ে নিতে। ভাইপোর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে কানাই কবরেজ। ওর মুখের ভাবান্তর বৃদ্ধের চোখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

কবরেজ মশাই বলে…আমাদের ধাত আলাদা জগবন্ধু, এতদিন—এতকাল থেকে যে বিদ্যা বেঁচে আছে, যে জ্ঞান যুগযুগান্তর ধরে চলে এসেছে তার মধ্যে নিহিত সত্য কিছু না থাকলে সে কবে কোনদিন নিঃশেষ হয়ে যেতো। মন দিয়ে কাজকর্ম করো। সরক্ষেত্রেই মানুষের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

জগবন্ধুও জানে এতদূর এগিয়ে এসে আর পিছোবার উপায় নেই। এই পথেই তাকে থাকতে হবে। দরকার তার মনের দৃঢ়তা আর ঐকান্তিক বিশ্বাস।

সেদিন পাশার আসর কেমন যেন জমে না, চালে কেবলই ভুল হচ্ছে কবরেজের। আজ থাক।

হুকটা তুলে ফেললো কবরেজ। নীরবে তামাক টানছে শম্ভু সিং, কবরেজ কি ভাবছে আকাশ পাতাল। এভাবনার তার শেষ নেই।

বলে ওঠে—বুঝলে শম্ভু, জগবন্ধু খুব ভয় পেয়েছে, ছেলেমানুষ কিনা। আরে আমাদের ধাতুর চিকিৎসাই আলাদা। এ চ্যবনপ্রাশ-মকরধ্বজের রোগী আসবেই। সূচিকাভরণ কি নিষ্ফল হয়ে গেছে আমাদের?

জোর দিয়ে কথাগুলো বললো কানাই কবরেজ সত্যি, কিন্তু মনে মনে কোথায় যেন নিজেই দুর্বল হয়ে পড়েছে বৃদ্ধ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই মনও যেন দুর্বল—স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে তার।

আঠারো মাইল পথ—তারপর গঙ্গা পার হয়েই সদর সহর। দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা; এপাশে ছায়াঘন আম-বাঁশ বাগান। পলিমাটির বুকে ফাঁকা জায়গাতে বর্ষার জল পেয়ে গজিয়ে ওঠে পাটক্ষেত; সবুজ সতেজ ডাঁটাগুলো জমাট শ্যামলিমার মত দাঁড়িয়ে থাকে। ওপারেই সদর সহর। গঙ্গার কাজল কালো জলরাশি বাঁক ফিরেছে এইখানে; জলের ধারেই সুরু হয়েছে সহরের পরিক্রমা।

সবুজ মাঠ থেকে গজিয়ে উঠেছে ইট কাঠের রাজত্ব। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে গঙ্গার ধারে উঠেছে ইলেকট্রিক পোস্ট; রাতের অন্ধকারে আলোগুলো গঙ্গার কালো জলে ঝিকিমিকি তোলে, এপারের বনে বনে জমাট বাঁধে জোনাকী-জ্বলা অন্ধকার।

কলকাতা থেকে ছাড়া পেয়ে বেড়াতে এসেছে মনীষা পিসীমার ওখানে। বি এ. পরীক্ষা দিয়েছে এবার, দীর্ঘ কয়েক মাস ছুটি। কলকাতা থেকে বহরমপুর এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে খুব। কাছেই মুর্শিদাবাদ সহর; ইতিহাসের ছাত্রী সে। নবাবী আমলের জায়গাটা ঘুরে এসে তারই আলোচনা করছে পিসেমশাইএর সঙ্গে। জাহানকোষায় বিস্তৃত ইতিহাস, কাঠরার মসজিদের গঠনরীতিতে সেকালের স্থাপত্যের প্রভাব সম্বন্ধে চুটিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে তার কথায় ছেদ পড়লো—অকস্মাৎ একজনের আবির্ভাবে।

একটু অবাক হয়ে গেছে মনীষা, ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে থাকে সে। দীর্ঘ সুঠাম দেহ—সাহেবী পোশাক পরা চেহারা, চোখে মুখে প্রতিভার শাণিত দীপ্তি। সহজভাবেই ভদ্রলোক এসে চেয়ারে বসে হাঁফ ছাড়তে থাকে।

—উস্, রাত্রে আর নড়ছিনা কাকাবাবু।

পিসীমাও ওর গলার শব্দ পেয়ে বাইরের ঘরে এসে পড়ে—অনিমেষ যে! ওমা কতদিন পর। কলকাতা থেকে ফিরছো?

—হ্যাঁ, মালপত্র প্রায়ই এসে গেছে লগেজে। সারাদিন ট্রেনে কেটেছে, স্নান-টানের ব্যবস্থা করুন।

পিসেমশাই এতক্ষণ যেন কথাটা ভুলেই গেছলেন, বলে ওঠেন—এসো-এসো। এই আমাদের মনীষা—এবার বি. এ. দিয়ে বেড়াতে এসেছে। আর তুইতো অনিমেষের নাম শুনেছিস। এই অনিমেষ এম. বি. পাশ করে নিজেই প্রাকটিস করছে।

হাসে অনিমেষ—করছি নয়, করবো ঠিক করেছি। তবে এসহরেও নয়—এখান থেকে আরও আঠারো কুড়িমাইল দূরে—এক মহকুমাসহরে। নামেই সহর—আসলে পাণ্ডব-বর্জিত বুনো দেশ। তিনদিকে তার নদী আর বিল অন্যদিকে রাঢ়দেশের ধুধু মাঠ।

—বাঃ, চমৎকার জায়গাতো ?

—শুনতেই ভালো, দেখলে কান্না পাবে আপনার।

কাকীমার তাগিদে উঠে পড়লো অনিমেষ,

—অনিমেষ স্নান করে কিছু খেয়ে গল্পসল্প যত পারো করো !

উঠে গেল অনিমেষ। মনীষা চুপ করে বসে থাকে। জাহানকোষা-মুশলিম স্থাপত্যে মিশরী-প্রভাব বাইরের রাজনীতির কচকচানির সূত্র ছিঁড়ে গেছে তার মন থেকে।

মনীষা চুপ করে কি ভাবছে। কলকাতায় অনেক এমন দেখেছে। রূপে গুণে বিদ্যায় তারা কোন অংশেই কম নয়। কিন্তু ভিড়ে মিশে যায় তারা। একলা একান্ত দেখবার চেনবার সুযোগ তাদের হয় না ; তার মনও তেমনি প্রস্তুত থাকে না ; আজ মহানগরের কোলাহল থেকে দূরে শান্ত স্তব্ধ কর্ম-চাঞ্চল্যহীন পরিবেশে মনের স্পর্শকাতরতা বেড়ে ওঠে।

এমনি করে নিভৃতে—একান্তে পাবার প্রলোভন যেন সামলাতে পারে না কামনাতুর মন।

—কি এত ভাবছেন ?

ঘরের আলোটা জানলার বাইরে গিয়ে পিছলে পড়েছে ছোট্ট নারকেলগাছের চিরল সবুজ পাতায় ; দু'-একটা জোনাকী পোকা অন্ধকারে ঘুরে মরছে কিসের সন্ধানে।

নিশুতি হয়ে এসেছে সহর। অনিমেষের কথায় ফিরে চাইল মনীষা। মুখে একটু হালকা খুসির আভাষ ছড়িয়ে বলে,

—কই না তো ?

—দেখতে পাচ্ছি।

—মনের ভিতরেও নজর দিতে পারেন নাকি ?

—ডাক্তারি শাস্ত্রে ওটাও খানিকটা শেখান হয়। ভুলে যাচ্ছেন আমি একজন ডাক্তার।

মনীষা কি যেন জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল, কথাটা ঘুরিয়ে নেয়—রাত অনেক হোল, সারাদিন ক্লান্তিতে কেটেছে। বিশ্রাম করুন।

বার হয়ে গেল সে।

এমন প্রায়ই ঘটে কাজল গাঁয়ের পথে। দ্বারকানদীতে হঠাৎ বান এসেছে। রাস্তা দুতিন জায়গায় ভেঙে গেছে, নদীতে খেয়াবন্ধ, অর্থাৎ সংবাদপত্রের ভাষায় কাজল গাঁ সভ্যজগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। বাস বন্ধ, যাতায়াতও নেই।

—এদিকে যে মুস্কিলে পড়লাম কাকীমা ?

অনিমেষের বাবা এবং নিবারণবাবু একই কলেজে অধ্যাপক ছিলেন পাটনায়। নিবারণবাবু রিটায়ার করার পর এসে বসবাস করছেন বহরমপুরে। ছেলেবেলা থেকেই অনিমেষ নিবারণবাবুর বাড়ীর ছেলের মতই হয়ে রয়েছে, সেই সম্পর্কটা এখনও বজায় আছে। কাকীমা বলে,

—এতো ভাবনার কি আছে বাবা, জলে তো আর পড় নি। যে ক'দিন রাস্তাঘাট ঠিক না হয় গরীব কাকীমার কুঁড়েতেই না হয় রইলে।

অনিমেষ জবাব দেয়—তা নয় রইলাম, কিন্তু মালপত্র যে রইল রেলকোম্পানীর জিম্মায়—কবে যে পথ ঠিক হবে জানি না।

ভাবনাতে পড়েছে অনিমেষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে এমনি বসে থাকবে ক'দিন কি ভাবে। ওদিকে কাজল গাঁয়ে তার অনেক কাজ বাকী, কি হচ্ছে সেখানকার অবস্থা কে জানে। অজ্ঞাতেই যেন এতদিনের ভুলে যাওয়া কাজল গাঁ তার মনের মণিকোঠায় বিশিষ্ট একটি স্থান অধিকার করে বসেছে।

— ভয় পেয়ে গেলেন নাকি ?

হাসিতে মুখ রাঙিয়ে উত্তর দেয় অনিমেষ—কেন ?

—জলে পড়েন নি সত্যিই, কিন্তু কুমীরের হাতে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে নাকি ?

—মানে ?

— সবকথার মানে নাই বা বুঝলেন।

একটু হাসির লহর তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মনীষা।

সহরে দু'একটা দরকারী কাজ সেরে বাড়ীতে ফিরে খাওয়া-দাওয়া আর ঘুম। এছাড়া কোন কাজই নেই অনিমেষের। সারাদিন তার কাজের ছক বাঁধা। সব যেন ওলটপালট হয়ে গেছে এই কদিনে।

বাবা মায়ের কথা মনে পড়ে অকারণেই ; চোখের উপর ভেসে ওঠে ছায়াচ্ছন্ন বাড়ীটা, নদীর উপরেই নুইয়েপড়া বাগানের পাঁচিল, বহুকালের পুরনো, শেওলা পড়ে কালো হয়ে উঠেছে। পড়ন্ত রোদের আভায় নির্জন বাগানটা কেমন স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে একটি কিশোর, কাঁঠালী-চাঁপার গাছে প্রজাপতি ধরবার প্রয়াস।

—শুনছেন ?

বিছানায় পাশ ফিরে শুলো অনিমেষ। কোথায় গেল সেই কিশোর—সেই প্রদোষের ছায়াচ্ছন্ন বাগান।

—স্বপ্ন দেখছেন নাকি দিন দুপুরে ?

চোখ মেলে চাইল অনিমেষ। বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মনীষা। পরনে কচিকলাপাতা রং-এর শাড়ী, পুরুন্ট দেহে অফুরান যৌবন প্রবাহ, চুলের লতিতে জমে রয়েছে চূর্ণ জলকণা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে অনিমেষ।

—মনে হচ্ছে স্বপ্নই দেখছি।

—ডাক্তার মানুষের কবি হবার সখ কেন ? হাঁড়ি যে সিকেয় উঠবে তাহলে। মনীষার কথায় হেসে ফেলে অনিমেষ—এমন স্বপ্নচারিণীর জন্য উপোস দিতে রাজী আছি। কবির ভাষায়—

এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান।

—থাক, থাক। আপনার কাকীমা শুনলে খুব ভাবনায় পড়বেন।

উঠে বসলো অনিমেষ। চাকরটা চা নিয়ে এসেছে। মনীষা চাকরের হাত থেকে টি-পটটা নিয়ে নিজেই চা বানিয়ে এগিয়ে দিল তার দিকে।

—উঠুন, একটু ঘুরেও আসতে হবে না ?

কয়েকদিন থেকেই ওদের প্রাত্যহিক কাজে পরিণত হয়েছে ওটা। গঙ্গার ওপারে গিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে খোঁজ নিয়ে আসে। ক'দিন থেকে শুনছে ওই একই কথা। বাস এখনও বন্ধ, রাস্তা মেরামত হচ্ছে।

কালা মদনের অবস্থা এখন বিপজ্জনক। গঙ্গার ফুলে ফেঁপে ওঠা জলস্রোত বেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে গাছপালা সমেত মাটি ধ্বসে পড়ছে ওর অতল গর্ভে ; ওপারে সদর সহর ; মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ইট-পাথর দিয়ে ওদিককার বাঁধ মজবুত করা হয়েছে, এদিকে এখনও বনরাজ্য। ভেঙে যাক—ধ্বসে যাক বাঁশবন আর আমবাগান কার তাতে কি এমন এলো গেলো। নদীও এই খবরটা কেমন করে পেয়ে গেছে—তাই থাবা বসিয়েছে এই দিকেই। একটু একটু করে পিছিয়ে আসছে আটকে পড়া বাস ক'খানা। আশপাশের ছিটে বেড়ার ঘর—দরমা ঘেরা মেজেতে জমেছে যাত্রীদল, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কেউ বা আশ্রয় নিয়েছে লোক ভর্তি ইস্টিশানের শেডে।

মদন তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছে। দিন গেলে পাঁচশো জনকে শোনাতে হয় সেই এক কথা—রাস্তা বন্ধ, বাসও বন্ধ। বানে ভেসে গেছে মশাই।

—কোনখানে ভেঙেছে দাদা ?

—ক' যায়গায় ?

—কতদিন লাগবে ? যাবো তো ?

মদন স্রেফ কালা হয়ে গেছে। একটা কাগজে ধ্যাবড়া করে লিখে টাঙিয়ে দিয়েছে সামনে ওই মূল কথা কয়টি। তাও কি নিস্তার আছে। অধিকাংশ লোক লেখাপড়া জানে না—জেরা করে।

—কোন্ কোন্ গাঁ ভেসে গেছে মদনদা ?

—আরে মলো, আমি কি দেখতে গেছি নাকি ?

—এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন ? প্রশ্নকর্তা অনিমেষ, ঘাটে নৌকায়

বসে আছে মনীষা, সে উঠে এসেছে খপরটা নিতে। এসে জল চেয়ে বসে। মদন বেশ চীৎকার করে বলে ওঠে,

—বাস বন্ধ, রাস্তা ভেঙে গেছে। গাড়ী চলতে দু'একদিন দেরী হবে।

—খাবার জল চাইলাম।

—বললাম তো রাস্তা তিন যায়গায় ভেঙে গেছে।

উপস্থিত জনতা অনিমেষের পোশাক, হাবভাবের দিকে চেয়ে থাকে। হেসে ফেলে কেউ কেউ। একটু ইসারা করে একজন দেখিয়ে দেয় অনিমেষকে মদনের কানের অবস্থাটা। নীরবে হাসি চেপে বার হয়ে এল অনিমেষ। মদন লোকটার দিকে চাইতেই দেখে ফেলে তার ইসারাটা। দপ্ করে তিক্ত-বিরক্ত মেজাজ সপ্তমে ওঠে—

—ইয়ার্কী পেয়েছো নাকি মোড়ল? আমার সঙ্গে রসিকতা? আমি কালা?

লোকগুলোও কদিন চালায় পড়ে ঝড়বৃষ্টি সহ্য করে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

—লও তো কি? ধান শুনতে কান শোন! মিছে কথা তো লয়।

গজরাতে থাকে মদন—দেখবো বাসে কেমন ওঠো তুমি!

ফস্ করে বলে ফেলে লোকটা—তোমার চোদ্দপুরুষের লরি হে! পয়সা দিই চড়ি, মাগ্‌নায় যেছি? গুটেক ফুটুনি দেখিও না।

ঠুসে গেল মদন। এতক্ষণ যে বাতচিৎ হচ্ছিল সেটা শুনতে তার কোন অসুবিধাই হয় নি।

উজানে দাঁড় বেয়ে চলেছে নৌকা। ছইয়ের বাইরে বসে আছে মনীষা আর অনিমেষ। একফালি চাঁদ এপারের ঘন আঁধারঘেরা বাঁশবনের মাথায় জেগে উঠেছে, ভিজে আলোয় বিষাদময় হয়ে উঠেছে আকাশ বনানী। দূরে গঙ্গার বুকে এগিয়ে যায় দু'একটা নৌকা।

চুপ করে বসে কি ভাবছ অনিমেষ, মনীষার কথায় হুঁস ফেরে।

—রাত্রি প্রায় ন'টা!

মেয়েরাই এ বিষয়ে হিসেবী। ছেলেরা ভালবেসে বাঁধন ছিঁড়ে উধাও হতে চায়। মেয়েরা ভালবেসে বাইরের থেকে ঘরের সীমানায় আসে। ছেলেরা ঘর

ভাঙে—মেয়েরা ভালবেসে নীড় বাঁধে। নীড় বাঁধবার জন্যই তাদের ভালবাসা। হিসেব আঙুলের ডগে।

—চলুন, ফিরতে হবে না?

হাসে অনিমেষ—কেন না ফেরার কোন লক্ষণ দেখেছেন নাকি? ভয় নেই। সে বয়স দুজনেই পার হয়ে এসেছি। আমার তো তাই মনে হয়।

—মানে? মনীষা অনিমেষের মুখে এমন কথা শুনবে আশা করতে পারে নি।

ব্যাপারটাকে হালকা করে দেয় অনিমেষ।

—না, আপনার বয়স যে ইতিমধ্যে ডেঞ্জার জোন পার হয়েছে তা বলতে চাইনি। মেয়েদের যদি বলা যায় আপনার রঙ্গীন বয়স ওভার হয়ে গেছে, চার্ম গ্লামার কমে আসছে তাহলে মেয়েরা নিশ্চয়ই খুব খুসী হবে না। অবশ্য আপনার প্রসঙ্গে ওকথা প্রযোজ্য নয়।

হেসে ফেলে মনীষা—মহারাণী হলে আপনাকে বিদূষকের চাকরীটা নিশ্চয়ই দিতাম। আপাততঃ নামুন—নৌকা ঘাটে এসে গেছে। সহরের লোকগুলো যেন কি! হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—দোষ তাদের আমি দিই না। ও কাজটা মাঝে মাঝে আমিও করে থাকি।

—ঢের হয়েছে—চুপ করে মুখ বুজে বাড়ী চলুন দিকি। মনীষা বলে ওঠে।

পিসীমা একটু যেন চিন্তায় পড়েছে,

—আমার বাপু এসব ভালো লাগে না। বয়স হলে ছেলেমেয়েদের মতিগতি কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যায়। মণিই বা টো টো করে ঘুরে বেড়ায় এমনি করে—তুমিও ওকে কিছু বলো না।

নিবারণবাবু ডেকচেয়ারে বসে আরাম করে ফুরসিতে টান দিচ্ছেন আর গভীর মনোযোগ দিয়ে বইখানা পড়ছেন। হুইটম্যানের কবিতা।

I am the poet of the body and I am the poet of the soul,

The pleasures of the Heaven are with me—

চমৎকার লাগে ওর কবিতা, সোজা চোখা তীরের মত কথাগুলো বলিষ্ঠ চেতনার দ্যোতক। আঁক-বাঁক নেই জড়তা নেই কোথাও প্রকাশ ভঙ্গীতে। আমেরিকান কবির পক্ষে এই বলিষ্ঠতা অস্বাভাবিক ঠেকে। হঠাৎ স্ত্রীর কথাগুলো যেন আবছা তার কানে আসে, বিরক্তি চেপে বইখানা বন্ধ করে চশমাটা খুলে বলে ওঠেন—আমাকে বলছো?

—নয়তো কি দেওয়ালকে? তোমাকে বলাও যা—দেওয়ালকে বলাও তাই। চোখ কান কি বন্ধ করে থাকো? পরের মেয়ে ঘরে এসেছে তার দিকেও নজর নেই তোমার?

হাসেন নিবারণবাবু—নেই কেন, ঠিকই আছে। জানো তো বয়স হয়েছে মেয়ের। নিজের ভালমন্দ ও বোঝে। লেখাপড়াও জানে—

—তোমার ওই এক কথা। হাজার লেখাপড়া শিখলেও মেয়েরা সেই মেয়েই থাকে। এগারো হাত কাপড়েও কাছা জোটে না। শুধু মাথাটাই বিগড়ে যায়—গিয়েছেও ওর।

রেগেই ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। নিবারণবাবু আবার বইখানা তুলে নেন।

দরজায় কাদের পায়ের শব্দ। ঢুকলো অনিমেষ আর মনীষা। জুতো, প্যাণ্টে গঙ্গার পলির আধশুকনো দাগ। মনীষার শাড়ীতেও লেগে রয়েছে তার চিহ্ন।

—কি grand তোমাদের নদী পিসীমা। খুব খানিকটা নৌকায় বেড়ালাম আজ। গোরাবাজার থেকে ওদিকে সৈদাবাদ পর্যন্ত। ভয় যা লাগছিলো ইস্। তবে জানো তো উটের কাঁটাগাছ খাওয়ার ইতিহাস। মুখ কেটে রক্ত পড়ে, তবুও খাওয়া তার বিরাম নেই।

পিসীমা তাদের পায়ের শব্দে ঘরে ঢুকেছে—কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। মুখখানা থমথমে। মনীষা পিসীমার ছায়াঘন মুখের দিয়ে চেয়ে বলে ওঠে—খুব ভাবছিলে বুঝি?

—সে কি আর তুমি বুঝবে? ওদিকের খবর কি অনিমেষ? বাস কবে চলবে? ওই কথাটাই যেন তিনি বেশী করে জানতে চান। অনিমেষ ও বেশ বুঝতে পারে সেটা। কাকীমার কণ্ঠে ফুটে ওঠে বিরক্তির চাপা সুর। জবাব দেয় অনিমেষ,

—কাল সকাল থেকেই বাস চলবে কাকীমা। ভোরেই বের হয়ে যেতে হবে।

কাকীমা যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

—যাক—তাহলে রাস্তা ঠিক হলো ?

—হ্যাঁ। ক'দিন আপনাদিকে বড় অসুবিধায় ফেলে গেলাম।

ভদ্রতা করে কাকীমা—না—না। তুমি তো ঘরের ছেলে।

মনীষার দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল অনিমেষ। সে স্তব্ধ চাহনিতে ডাগর কালো দুটো চোখের নীরব ভাষায় তার দিকে চেয়ে রয়েছে। বাড়ীর সবাই এ কথাটা বিশ্বাস করলেও সে করে না। অনিমেষ এখান থেকে চলে যাচ্ছে এবং কেন তাও সে জেনেছে।

নীরবেই বের হয়ে এলো অনিমেষ। বাড়ীর সকলে তখনও জাগেনি। কাকীমার একটু বেলায় ওঠা অভ্যেস। সুতরাং তাকে জানাবার দরকার করে না। নিবারণবাবু উঠেছেন ; রোজকার মত প্রাতভ্রমণে বের হবেন—অনিমেষ যাবার জন্য তৈরী হয়ে পড়েছে।

—বেরুচ্ছো ?

—হ্যাঁ।

একটা দায়সারা গোছের প্রণাম করে রিক্সায় উঠলো অনিমেষ।

পথ খুলতে তখনও দু একদিন দেরী। একটা হোটেলের তেতলার ঘরে উঠেছে অনিমেষ। সকালের দিকে বের হয় না। কি জানি যদি পথে দেখা হয়ে যায় কারো সঙ্গে। মনে একটু কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল। কাকীমার সেই রাত্রের মুখখানা ভুলতে পারে না সে। অকারণেই তিনি সন্দেহ করেছেন তাকে। মনীষাও প্রতিবাদ করলো না। অহেতুক দীর্ঘ দিনের সম্বন্ধটা তিক্ত হয়ে উঠলো কোথায়। বাড়াবাড়ি তারা করেছিল নিশ্চয়।

জানালার পাশেই খাটে শুয়ে আনমনে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। সকালের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বাড়ীগুলোর মাথায়। গঙ্গা থেকে নালা বের হয়ে সহরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে বিলের দিকে। ঘোলা জল দুর্দাম বেগে বয়ে চলেছে। ইলেকট্রিক পোলের মাথায় বসে রয়েছে নিঃসঙ্গ একটা কাক। মাঝে মাঝে চারিদিকে সন্তর্পণী দৃষ্টি মেলে ডাকছে কর্কশ কণ্ঠে।

হঠাৎ ঘরের দরজা ঠেলে কাকে ঢুকতে দেখে চমকে উঠে বিছানায় বসলো। অর্দ্ধভুক্ত চায়ের পেয়ালাটা সরিয়ে রেখে বলে ওঠে অনিমেষ,

—আরে সর্বনাশ! আপনি!

মনীষা ঘরে ঢুকে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো। বলে ওঠে,

—বসতে তো বললেন না, নিজেই বসলাম। রাগ করে বের হয়ে এলেন আমিতো খুঁজে খুঁজে হন্যে। শেষকালে—উস্!

একটু বিস্মিত হয়ে যায় অনিমেষ—আমাকে কার কি দরকার পড়লো? যাক্, এও জেনে রাখলাম—আমার জন্যে একজনও পথে পথে বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হেসে ফেলে মনীষা—এই সবের জন্য কাকীমার বাড়ী থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন, এবার কিন্তু হোটেল থেকেও গলাধাক্কা খেতে হবে। ডাক্তার হলেই কি মুখের লাগামটা খুলে যায়? চোখের পর্দা তাদের নেই জানতাম—এখন দেখলাম মুখের লাগামও।

গম্ভীরভাবে জবাব দেয় অনিমেষ—ও দুটোই মানুষের উন্নতির পথে মস্ত বড় অন্তরায়।

উঠে দাঁড়াল অনিমেষ—অনেকক্ষণ তো বকলাম। একটু চা আনাই।

মনীষা জবাব দেয়—অতিথিসৎকার নিশ্চয় করা দরকার।

পিসীমার ব্যবহারে সেদিন মনীষা সত্যই মর্মাহত হয়েছিল। তাদের বাড়ীতে অতিথি, তার বলবার কোন অধিকার নেই। তাই নীরবেই ছিল। তার জন্য অনিমেষও অপ্রস্তুত হয়েছে রীতিমত, একটা নীরব সমবেদনায় তার মন ভরে উঠেছিল। তাই বোধ হয় ক্ষমা চাইবার জন্যই এ'কদিন সহরের সব হোটেলগুলোই খুঁজে পেতে অনিমেষের পাত্তা বের করেছে।

—আমার ক্ষমা চাইবার মুখও নেই।

জোর গলায় বলে ওঠে অনিমেষ—নেই-ই তো। থাকলে পরদিনই আসতেন। এলেন এমন দিনে যখন আর সময় আমার নেই। বেলা বৃথাই কেটে গেল কোন দিকে।

—সে কি! কি হল আপনার? মনীষার কণ্ঠে রীতিমত বিস্ময়।

গম্ভীরভাবে বলে ওঠে অনিমেষ—কাল আমার গাড়ী ছাড়ছে।

—চলুন আমিও বেড়িয়ে আসি আপনার ওখানে। বলে ফেলে মনীষা।

রীতিমত আঁৎকে ওঠে অনিমেষ—উরে বাবা! তাহলে কি রক্ষে থাকবে?

—কাকীমার ভয়? মনীষা প্রশ্ন করে।

—মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু। বিশেষ করে এই সব ব্যাপারে। মেয়েদের চরিত্রদুর্গের কড়া পাহারাদার পিসীমারা। দূর থেকেই তাঁকে নমস্কার করি।

পরদিনই চলে যাচ্ছে অনিমেষ। বৈকালের দিকে মালপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে ট্রাকে করে। সেদিন এসেছে মনীষা। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে কাশিম-বাজারের নির্জন রাস্তা দিয়ে। দুদিকের বনে নেমেছে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। সবুজের সীমানা ভেদ করে লাল সুরকী ঢালা পথটা ছায়াকালো দেওদার সারি ছুঁয়ে গেছে। জুতোর অস্পষ্ট শব্দ ওঠে ওদের, বাঁ পাশে দেখা যায় কালোজল ভরা বিল; ধারে ধারে ফুটেছে ঘন কচুরীপানার দামে ভেলভেট রং-এর ফুলগুলো—কি যেন গহিন প্রশান্তির আভাষ আনে।

—যাবেন সত্য কাজল গাঁয়ে?

অনিমেষ যেন বদলে গেছে, পরিহাস তরল কণ্ঠস্বরে নেমেছে আন্তরিকতার গাঢ় স্পর্শ; মনীষা কথা কইল না, সেল ফ্রেমের চশমা তুলে চাইল ওর দিকে, বুদ্ধিদৃপ্ত দুটো চোখের নীরব চাহনির সামনে অনিমেষ তার সব কথা যেন হারিয়ে ফেলে।

—কথাটা ভোলেন নি দেখছি?

—ও কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে।

মনীষার একখানা হাত কখন সে অন্যমনে তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। মনীষাও কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে, কি এক নীরব উচ্ছ্বাস কানায় কানায় তার মন ভরে দিয়েছে—তৃপ্তির পরশ যেন উপছে পড়বে এইবার।

—চলুন, ফেরা যাক। সন্ধ্যা নেমে এলো।

উঠে দাঁড়াল আত্মসংযত নারী। নীরবে ধূমায়িত অন্তরের সব ব্যথাকে চেপে রাখা ওদের সহজাত ধর্ম—বর্মের মত অভেদ্য একটা আবরণে আবৃত করে রেখেছে ওদিকে।

—আবার কবে দেখা হবে জানি না। তবে এই ক'দিন—

—ভুলে যাবার চেষ্টাই করবেন। এ নিয়ে ভাববার মত কিছুই হয় নি। মনীষা যেন ওর কথায় রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কথা বাড়ালো না অনিমেষ।

ভাংগা পথে প্রথম গাড়ী নিয়ে বের হতে সাহস করে তারিণী। ছোকরা ড্রাইভার, মাত্র কয়েক বৎসর লাইসেন্স পেয়েছে।

—পারবি তো?

—নিশ্চয়! তবে গাড়ী আমার মনের মত দিতে হবে। তুমাদের লড়বড়ে গাড়ী দিলে আমি নাই।

ওদিকে সমবেত জনতার মধ্যে মারামারি বেধে গেছে বসবার জায়গা নিয়ে, গাড়ীর বডি এইটুকু, দাঁড়ানোর উপায় নেই, রাস্তার ঝাঁকানিতে ধাক্কা লেগে মাথা চৌফালা হয়ে যাবে। তিনদিন-চারদিন ধরে আটকে আছে ওরা, খাওয়া-দাওয়া নেই, মনের উৎকণ্ঠা মুখে চোখে—চেহারায় ফুটে বের হয়েছে। কে জানে দ্বারকা-ময়ূরাক্ষীর বানে কার কি সর্বনাশ হয়েছে। সর্বস্ব পড়ে আছে ওখানে।

—দুটাকা দিছি বাবু। ও মদনবাবু!

ওপাশে কে শিরীষ গাছের নীচে মদনবাবুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস কি বলছে।

—এ্যাঁ! মদন কথাগুলো শুনতে পায় না।

গোপন কথা জোরেই বা বলা যায় কি করে। লোকটা মদনের হাতে গুঁজে দিল পাঁচটাকার একখানা করকরে নোট।

—দুখানা টিকিট চাই।

ক্রমে ক্রমে দরটা সরকারী হয়ে দাঁড়াল। বেশী পয়সার জোর যাদের তারা সিট ঠিক পেয়ে গেল। কয়েকজন কাকুতি মিনতি করে, মদন তখন বেশ দু-পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। আড়াইটাকা হাতে নেয় টিকিট দেয় কোম্পানীর বারো আনার।

গোল বাধলো অনিমেষের সংগে—ফার্স্ট ক্লাস দেড় টাকা, তার বেশী আমি দোব না।

—চারটাকা লাগবে। নাহলে নেমে যান।

—রসিদ দেবেন চারটাকার ?

—টিকিট দোব দুটাকার।

তারিণী দূর থেকে ব্যাপারটা সবই দেখে মদনকে বলে ওঠে -বেশী বাড়াবাড়ি করোনা দাদা। কে জানে কোন অফিসার-টফিসার হবে কিনা ?

মদন বলে ওঠে—ধ্যাৎ। অফিসার আছে তার কাছারীতে, এখানে আমরাই সব। লে!

হাত তুলে দিতে আসে কয়েকটা টাকা। হাতটা সরিয়ে নেয় তারিণী—তুমিই ও লাও দাদা। কথাটা কিন্তু ভালো হল না। মালিকরা শুনলে কি হবে বল দিকি ?

রাস্তাটা ঠাঁই ঠাঁই বসে গেছে, কোথাও এধার থেকে ওধারে বয়ে গেছে জলস্রোত, খোয়াগুলো দাঁত বের করে রয়েছে। সাঁকোগুলোর নীচে দিয়ে তখনও বয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে বন্যার ন্যায় জল।

চাকাগুলো পিছলে যাচ্ছে, শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে রয়েছে তারিণী। অনিমেষ দূরের পানে চেয়ে আছে—চক চক করছে জল আর জল, হিজল বিলের সীমাহীন জলধারায় সূর্যের আলো হাজারো রেখায় পড়েছে, নাচছে ঢেউয়ের মাথায় বাসুকীর অজস্র ফণা—মাথায় মাথায় ওর মাণিক ছোঁয়ানো।

—সিগারেট খাও ?

পাশেই বসে আছে অনিমেষ, তার দিকে মুখ তুলে চাইল তারিণী। মাথা নীচু করে জবাব দেয়—আজ্ঞে না।

—ওই বুকিংক্লার্কের নাম কি হে ? তোমাদের অফিসারটির ?

—মদনবাবু, আজ্ঞে মদন পাল।

সামনে একটা খন্দ! পাথর উঠে গেছে জলের স্রোতে, গর্তটাকে বাঁচিয়ে চলে সে স্টিয়ারিং-এ মোচড় দিয়ে।

অনিমেষ কাজল গাঁয়ে এসে কয়েকদিন কাজের ভিড়ে ডুবে যায়। নোতুন চেম্বার খুলেছে। নিজের প্যাথলজির ছোটখাট ল্যাবেরেটরীটা খাড়া করে

নিয়েছে এরই মধ্যে। দামী মাইক্রোসকোপটা টেস্ট করে দেখেছে। মফস্বলে ভাল করে চিকিৎসা করতে হলে অন্ততঃ নিজের মত করে ত এগুলো চাই। টাইফয়েড—কালাজ্বর—ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইটস-ডিটেক্ট করার সুবিধা করে নিয়েছে; ছোটখাটো অপারেশন করবার ব্যবস্থাও হয়েছে। এক কথায় ছোটখাটো সাজানো প্রতিষ্ঠান করে তুলেছে সে—ইতিপূর্বে সহরে যা কখনও হয়নি। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হয়ে গেছে।

যেচে এসে আলাপ করে শচীন, নড়বড়ে সাইকেলটা থেকে নেমে নিজেই নমস্কার করে।

—এলাম, দেশের গৌরব আপনি, দেশের সেবাতেই নিজেকে যিনি দান করেছেন—তাঁকে দেখবার লোভটা সামলাতে পারলাম না!

—আসুন! অনিমেষ ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, এমন নির্লজ্জ স্তুতিবাদ এর আগে কখনও শোনে নি।

চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখে শচীন বলে ওঠে—এ যে মেডিক্যাল কলেজের মত মস্ত কাণ্ডকারখানা বানিয়েছেন মশাই। ঝকঝকে তকতকে। কাজল গাঁয়ের লোক আর অবহেলায় মরবে না। এ চাকলার মহাউপকার হ'লো মশায়।

তারই উদ্যোগে উদ্বোধন পর্বটা করতে হ'ল। সারা সহরের গণ্যমান্য সকলকে নিমন্ত্রণ করে এনে দেখান হল সব কিছু। সরকারী উকিল মাধববাবু প্রধান অতিথি—হাকিম মিঃ পালিত সভাপতি হলেন সে সভার। সাধারণ লোক এ ভিড় করে দাঁড়াল খানিকক্ষণ। দলে মিশে হাততালিও দিল।

কবরেজখানায় কানাই কবরেজ বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে পড়ে আছে বুড়ো ভালুকের মত, কেমন যেন শীত শীত করছে। বৈঠকখানায় আর কেউ নেই। আড্ডাধারীর দলও এসে জোটে নি আজ। বোধ হয় ওইখানে মজা দেখছে। কেমন যেন হতাশার অন্ধকার ছেয়ে আসছে কানাই কবরেজের দেহমনে। বার্ধক্যের অবসাদ ঘিরে ফেলেছে তার সমস্ত দেহমন। রোগীপত্তর আর তেমন নেই। কেমন যেন রোগগুলো সব উপে গেছে দেশ থেকে। আগেকার সেই নামডাক—পাল্কী বেহারা কোন দিকে মিলিয়ে গেছে; কাশছে বুড়ো খক্ খক্ করে। কাশির আবেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর সারা দেহ।

—কে যায় ?

—আমি। সাড়া দিল জগবন্ধু।

—তামাক দিয়ে যাও এক ছিলিম।

সারা গা জ্বলে ওঠে জগবন্ধুর। বুড়োর তামাক সাজতে সাজতেই হন্দ হয়ে গেছে সে। কাঁহাতক পারা যায়। সারাদিনে দুটো টাকার দেখা নেই, লোকজন এককালে ছিল তখন এসব ঘড়ি ঘড়ি তামাক সাজা হয়েছে। এখন কি আর সেই হাল আছে ? বুড়ো কি তা বোঝে।

গজগজ করতে করতে তামাক সেজে এনে দিল কাকাকে। কয়েকটা টান দিয়েই বুড়ো সটকাটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়,

—দাকাটা মান্দিরী তামাক আমার চলে ?

ফস করে বলে বসে জগবন্ধু—তবু ও মিলছে এখন। পরে ?

—মানে ? সোজা হয়ে উঠে বসলো বুড়ো। দুচোখে তার অস্বাভাবিক একটা দীপ্তি। গায়ের বালাপোষ গেছে খসে ; জীর্ণ বেনিয়ানের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে কঙ্কালসার বয়োজীর্ণ একটা দেহ ; রাগে অপমানে নখদন্তহীন সিংহ ক্ষেপে উঠেছে—এখনও মরি নি। মতিভ্রমও হয় নি। নাড়ী দেখে বিধান-নিদান সবই দেবার আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। আসুক দিকি কালকের ফচকে ওই ডাক্তার, তার এলোপ্যাথি ! তোর মাথা খারাপ হয়েছে জগা—আমার হয়নি। এ শাস্ত্র অমর। আমাদের দিন ঠিকই চলবে।

বের হয়ে গেল জগবন্ধু। মুখের উপর জবাব দিল না সত্যি—কিন্তু মনে মনে ক্ষেপে উঠেছে সে। বুড়ো তার পরকালটা ঝরঝরে করে দিয়েছে—এখনও রোখ দেখায়।

জড়ি-বুটি, বক্কেল—শুখনো লতাপাতাগুলোকে টেনে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে তার। আজ সেই পূর্বেকার অবস্থাও তাদের নেই—তার ভবিষ্যৎও কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে মনে হয়। অভাব অনটনের পর্ব এখন থেকেই সুরু হ'ল। কানাই কবরেজ তার যৌবনকালে এমনি অবস্থায় পড়ে নি।···জগবন্ধু এমন একটা যুগে জন্মেছে—যে যুগ এমন পরিবর্তনশীল এবং সে পরিবর্তন এতই দ্রুত যে তাল সামলানো ত দায়।

কবরেজ বলে,

—সহজ সরল জীবনযাত্রাই ভালো জগবন্ধু। বাজে ভড়ং—উপরচাল আর সহজ চাকচিক্য দিয়ে ভালো কাজ কিছু করা যায় না।

জগবন্ধু বিরক্ত হয়ে ওঠে—ভেক না হলে ভিখ্ মেলে না কাকা। ডাকে কেউ আর তোমাকে? হুট করতেই লোক ছুটছে ওই ডাক্তারদের দরজায়। যার পয়সা নেই--মাগনা ওষুধ পাবে সেই-ই আসে এখানে।

স্তব্ধ হয়ে যায় কানাই কবরেজ, এত বড় কথাটা এমনি করে ওর মুখের উপর জগবন্ধু বলতে পারবে কল্পনাই করেনি। কি যেন বলতে গিয়ে তার দিকে চেয়ে থেমে গেল কবরেজ। নীলাভ চোখ দুটোতে একটা অসহায় বেদনা ফুটে উঠেছে,

—তুমি যদি সত্যিই এই নিয়ে পড়াশোনা করো, মন দিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করো—তোমার বাপ-ঠাকুরদার মত তুমিও সব কিছুই পাবে। হিংসা করো না অপরকে; লোভ করো না। তোমারযোগ্যতা প্রমাণ করো—সব অভাব দূরহয়ে যাবে।

জগবন্ধু বিরক্ত হয়ে উঠেছে বুড়োর নীতিবাক্য শুনে, মেজাজও চড়ে রয়েছে। কথাবার্তা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল তাসের আড্ডায়।

কাজল গাঁ অটোমোবাইল এসোসিয়েশনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে; এরকম অভিযোগ কোম্পানীর কর্মচারীর নামে এই প্রথম, সমস্ত কোম্পানীর বদনাম এতে। ঠাকুরমশাই মিটিংএ বলে বসেন—কোনও মায়া-দয়া নেই, দূর করে দাও ও লোককে।

ফণী চক্রবর্তী ঘুঘু লোক, পাকা ব্যবসাদার। ফাটকা নামক বস্তুটির তখনও রেওয়াজ হয় নি, কিন্তু সুযোগমত খপ্ করে কিছু রোজকার করে নেবার সুবুদ্ধির মনে মনে তারিফ না করে পারে না। কালা মদন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে, এবং এদিকে সাফ বুদ্ধিওয়ালা লোককে কোম্পানীর আর তার মালিকরা প্রশ্রয় না দিলেও চক্রবর্তী এমন লোকের প্রয়োজন বোধ করেন।

—লোকটার দোষ হয়েছে কি জানেন, একটু বেশী চালাক।

ঠাকুরমশাই বলে ওঠেন—দূর করে দিতে হবে ওকে। পাঁচজনকে নিয়ে কারবার, এতে বদনাম হলে চলে না।

অনিমেষের অভিযোগ এসে পেঁীছেছে, তার অভিযোগের স্বপক্ষে যুক্তি রয়েছে যথেষ্ট, প্রমাণেরও অভাব নেই।

অনিমেষ ফিরে এসেই লিখিত অভিযোগ করছে মদনের নামে। সঙ্গের চারজন যাত্রীও সাক্ষী আছে। এই নিয়ে ব্যাপারটা এস-ডি-ও অবধি গড়িয়েছে, ডি-এম অবধিও গড়াতে পারে। কোম্পানী মান ইজ্জত বাঁচাবার জন্য মদনকে ডাকিয়েছে—এর বিচার করতে হবে।

একপাশে দাঁড়িয়ে আছে মদন। অজানা ভয়ে কাঁপছে সে। কোম্পানীর চাকরীতে বেশ দুপয়সা কামায়—লেখাপড়া তার ক্লাস 'ফোর' অবধি, এ চাকরী গেলে খাবে কি!

মালিকদের ভাবগতিক দেখে সে বুঝেছে চাকরী তার যাবেই। কি যেন বলতে যায় অশ্রুভেজা কণ্ঠে। ধমকে ওঠেন ঠাকুরমশায়,

—থাক, থাক আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, তোমাদের ব্যবহারের সব নমুনাই দেখেছি। বাকি মাইনে চুকিয়ে নিয়ে আজই বিদায় হও। চোর-জোচ্চর নিয়ে কাজ চলবে না আমাদের।

তিনিই কোম্পানীর অর্ধেকের মালিক, তাঁর কথাই হুকুম।

ঠাকুরমশাই কথাগুলো বলে আর দাঁড়ালেন না। উঠে বের হয়ে গেলেন হন হন করে।

মদন এসব কথাগুলো স্পষ্টই শুনতে পায়। চাকরী তার খতম। ঠাকুর-মশাইএর হুকুম রদ করবার ক্ষমতা এঁদের কারো নেই, মনে মনে যতই গজরাক কেন—তাঁর 'না', কে 'হ্যাঁ' করবার সাধ্য এঁদের হবে না।.

একলা চুপটি করে বসে ভাবছে মদন। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সংসার, ছাপোষা মানুষ। এখন সে যেন অকুল পাথারে ভাসছে। ড্রাইভার-কনডাকটারদের মধ্যে অনেকেই মদনের ব্যবহারে খুসী ছিল না, বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ওর। তারা বলে—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হয়েছে।

মদনের ভরসা এখন একমাত্র রেণুদা।

—কি হবে দাদা?

রেণুদা একটু গলা খাটো করে পরামর্শ দেয়—বাবাঠাকুরের বাড়ী গিয়ে পা চেপে ধর।

চমকে ওঠে মদন, সাক্ষাৎ যমের মুখে যেতে সে এতো ভয় পেতো না, কিন্তু নিরুপায়।

অনিমেষ চেম্বারে কয়েকটা রুগী দেখা শেষ করে একটু জিরুচ্ছে। একটা কেস নিয়ে বিব্রতে পড়েছে। প্রায় সপ্তাহ দুয়েক জগবন্ধু কবরেজের হাতে ছিল, কানাই কবরেজ ভাইপোকে হাত পাকাতে দিয়েছিল বেচারার উপর, দুসপ্তাহ ধরে ভুগে ভুগে জ্বর ছাড়ে নি, কবরেজও ছাড়তে চায় না, বলে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে—কিন্তু রক্তে দেখা গেছে টাইফয়েড ব্যাসিলি। এই নিয়ে কানাই কবরেজ কিছু না বললেও জগবন্ধু বাজারের মধ্যে জোর গলায় হেঁকে বলেছে,

—ওর ডাক্তারি যদি আমি লাটে না তুলি, তবে আমার নাম মিছে।

নিতাই বোষ্টম এসে পড়েছে অনিমেষের কাছে। দুসপ্তাহ রোগভোগ করার পরও সারা মুখে লেগে রয়েছে একটা শান্ত মাধুর্য, বয়সও বেশী নয়; নিতাই বৈরাগী আকুতি মিনতি করে,

—আপনিই হাতে নিন ডাক্তারবাবু। বাঁচবে তো?

কণ্ঠস্বরে কি এক ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে। অনিমেষ একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না, বিস্ময় চেপে পেশাদারী কণ্ঠে অভয় দেয়,

—আচ্ছা, দেখে যা হয় ব্যবস্থা করবো।

নিতাই ছাড়বার পাত্র নয়। বসে থেকে নিয়ে গেল তাকে।

নিতাই জোড় হাত করে বসে আছে। যমুনা একটু হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলে বলে,

—ওকে ভাবতে মানা করে যান ডাক্তারবাবু, ও মনে করেছে, আমি বুঝি মরেই গেছি।

ওর কথায় কি যেন একটা বিচিত্র সুর। অনিমেষ চাইল ওর দিকে।

যমুনার সিঁথিতে সিন্দুর নেই, তবু দুজনের সম্পর্কের মাঝখানে কোথায় যেন একটু মাধুর্য লুকোন রয়েছে—যা দুজনের চাল-চলনের মধ্যেই ফুটে উঠেছে ওদের চাপবার শত প্রচেষ্টা সত্বেও। অবশ্য তার জন্য লজ্জা দুজনের মনে কোথাও নেই।

বার বার যমুনার কথা যেন অকারণেই মনে পড়ে। মনে পড়ে আজ মনীষার কথা। কেন জানে না, দুই চিন্তাধারার মধ্যে যোগসূত্র কোনখানে খুঁজে বের

করতে পারে না। ও'দের দ্'জনের মনে যে রামধন্র বর্ণালী তার বিন্দ্মাত্র আভাস কি কোনদিনও অজান্তে তাদের দ্'জনের মনে পরশ ব্লিয়েছিল? এর জবাব খ‍ু'জে পায় নি অনিমেষ।

হ্যাঁ! যম্নার কথায় ফিরে আসে। বলে ওঠে অনিমেষ,

—বহ্দিন ভোগাবে বলে মনে হচ্ছে। দ্'সপ্তাহ ভ্ল চিকিৎসা হয়ে রোগ অনেকটা এগিয়ে গেছে।

কেসটার উপর তার কেমন যেন জেদ চেপে গেছে। জগবন্ধ্ নিদেন হে'কেছিল,

—তোর এ রোগের আর ওষ্ধ নাই, নাওয়া-খাওয়া কর—সারবার হলে সেরে যাবে।

বাকীটার অর্থ পরিষ্কার, অর্থাৎ সারবার কোন অস্বিধা হবে না। সেই কেস এসেছে তার হাতে, কানাই-জগবন্ধ্ শ্ধ্ নয়, সহরের লোকও বেশ ঔৎস্ক্য নিয়ে চেয়ে রয়েছে।

যম্নাদাসী সহরের মধ্যে বেশ পরিচিত। স্কণ্ঠী—স্রসিকা—সহরের একটা আকর্ষণই বলা যায়।

কি যেন ভাবতে ভাবতে চেম্বারে ফিরে এল অনিমেষ। সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ওঠবার উদ্যোগ করছে অনিমেষ, হঠাৎ একটি ভদ্রলোককে দেখে এগিয়ে এল। রোগের পরামর্শ চাইতে এসেছেন বোধ হয়। অভ্যর্থনা জানায়—আস্ন!

খালি গায়ে একটা চাদর জড়ানো, মাথার শিখায় গ্রন্থিবাঁধা ফ্ল, কপালে জীর্ণ তিলকের দাগ। হাতের লাঠিখানা কোণে হেলান দিয়ে বসলেন চেয়ারে। অন্ধকার পথ, সঙ্গে একটা হ্যারিকেনও আছে, সেটাকে কমিয়ে নীচে নামিয়ে রাখলেন।

অনিমেষ কিছ্ বলবার আগে ভদ্রলোক একটা কাগজ বের করে দিলেন ওর হাতে।

পড়তেই অনিমেষ ব্ঝতে পারে—সেবার সদর থেকে আসবার সময় ব্কিং-ক্লার্ক মদনের নামে সে অভিযোগ করেছিলো—সেইখানা। জিজ্ঞাস্ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে অনিমেষ ওর দিকে।

—আপনার এই অভিযোগের উত্তরে আমরা সেই কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছি।

ভদ্রলোককে দেখেছে অনিমেষ ইতিপূর্বে। কাজল গাঁয়ের সুপরিচিত ব্যক্তি কণ্ঠস্বরে একটা আভিজাত্য ফুটে ওঠে, আর্থিক সংগতিতে এ আভিজাত্য নয়—এই কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে সজীব একটি নিষ্ঠা। এ'র ইতিহাস অনিমেষ জানে।

—আপনি ঠাকুরমশাই? নমস্কার। নাম শুনেছিলাম আজ পরিচয় হোল!

একটু বেশ উষ্ণতাই ফুটে ওঠে অনিমেষের কণ্ঠে—ভালই করেছেন, এ রকম অসৎ লোক থাকলে কোম্পানীর বিপদ।

ঠাকুরমশাই কোন কথা বললেন না, নীরবে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, অনিমেষ চুপ করলো। ধীরে ধীরে ঠাকুরমশাই বলে ওঠেন,

—আমি বর্তমানে এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী, আমাদের যা করবার ছিল করা হয়েছে, এখন এসেছি আপনার কাছে। লোকটা বড্ড গরীব, লোভ সামলাতে পারে নি।

ও'র কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে একটা অক্ষমতা। অনিমেষ ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—আমি কি করতে পারি?

—ওকে মাপ করুন। ভবিষ্যতে ও এরকম কাজ কোন দিনই করবে না।

অবাক হয়ে যায় অনিমেষ, কে করল অপরাধ—আর কে চাইতে এল ক্ষমা।

—তার হয়ে আমিই এসেছি আপনার কাছে। চরম শাস্তি এর মধ্যে হয়ে গেছে তার। আটদিন চাকরী নেই, আট দশায় পড়েছে।

অনিমেষ চেয়ে থাকে ও'র দিকে, শাস্তিটা যেন ও'কেই এসে লেগেছে। ওর অবস্থাটা অনুমান করতে পারে সে—কি ভেবে একটা প্যাড পেপার টেনে খস খস করে দুলাইন লিখে দিল।

—এই নিন্। এতেই হবে আশা করি।

ঠাকুরমশায়ের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে—যাক বাঁচলাম একদিকে। ওরা নরকের কীট, বুঝলেন। এই শেষবারের মত চাকরী রইল ওর, আর যদি কিছু করে স্রেফ পত্রপাঠ বিদায়। আচ্ছা—উঠি।

চাদরখানা তুলে গায়ে জড়িয়ে বের হয়ে গেলেন তিনি। অনেক দেরি হয়ে গেছে, রাত্রির দিকে একবার লাইব্রেরী হয়ে যেতে হবে। কম্পাউণ্ডার—চাকর দুজনকে বলে বের হয়ে এল রাস্তায়।

ঘটনাটা ঘটে গেল অতর্কিতে।

আগে হতেই হরেরামবাবু তৈরী হয়েছিলেন কাজল গাঁয়ের লোকদিকে শিক্ষা দেবার জন্য। মুখবুজে শক্তি সংগ্রহ করছিলেন তিনি। শচীন ঠিক সময়মত গা ঢাকা দিয়েছে। এই সময় চাঁদা আদায় করতে বের হয়েছে সে বাজারের দিকে। একমাস শুদ্ধভাবে থেকে ভক্তের দল গেরুয়া উত্তরীয় ধারণ করেছে—কয়েকদিন হবিষ্যান্ন আর উপবাস। মেজাজ তাদের এমনিই সপ্তমে চড়ে আছে। হৈ হৈ করে প্রায় খান তিরিশ ঢাক নিয়ে চলেছে তারা ঠাকুর কাঁধে করে, বাধা পেল বার-কোণার মাঠের বেড়ার কাছে।

এদিকে তৈরী হয়ে আছে হরেরামবাবুর লাঠিয়ালরা, ঝোপঝাপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে। ভক্তদের কে গর্জন করে ওঠে—ভাঙ্গ বেড়া। বাবাকে যেতে দেবে না কুন শা—

চার পাঁচশ লোক কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাঁশ খুঁটো উপড়ে ফেলেছে—ঢাক বাজছে জোরে। তিরিশখানা ঢাক। ঢাকের মাথায় পালক নাচছে—নাচছে ভক্তের দল—রণবাদ্যি বাজছে,

উরু কুড়ুক কুড়ুক কুড়ুক ড্যাং ট্যানা ট্যাং ট্যাটাং ট্যাটাং—

এমন সময় অতর্কিত আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল লাঠিয়ালের দল। ওদের জয়ধ্বনি পরিণত হয় আর্তচীৎকারে। কোনদিকে কি হয়ে গেল কেউ বুঝতে পারে না, জনতা—ভক্তের দল প্রতিরোধ করবার মত মানসিক অবস্থায় আসবার আগেই ওরা কাজ সেরে কোনদিকে উধাও হয়ে গেল। জায়গাটা ভরে ওঠে আর্তনাদে, বেশ কয়েকজন জখম হয়েছে। মাথা ফেটেছে—হাত ভেঙেছে, পাঁজর ভেঙেছে অনেকেরই।

কয়েকজন ভক্ত কোনরকমে ঠাকুর নিয়ে নদীতীর অবধি পেঁছাল, সহরের মধ্যে তখন বিরাট চাঞ্চল্য পড়ে গেছে। উৎসবের না প্রতিআক্রমণের প্রস্তুতি সুরু হয়েছে কে জানে! শচীন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে না এসে সোজা হাজির হয়েছে এস-ডি-ওর বাংলোয়।

সাহেবের কানেও সংবাদটা পেঁীছেছে। দারোগাবাবু তাঁকে খবরটা জানিয়েই ঘটনাস্থলে চলে গেছেন। শচীন সাইকেল থেকে নেমে উস্কোখুস্কো চেহারায়—চোখমুখ কপালে তুলে এসে একরকম আছড়ে পড়ে চাতালের উপর। আর্তনাদ করে ওঠে,

—সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার।

এস-ডি-ও সাহেব ওর দিকে চেয়ে একটু থমথমে কণ্ঠে বলে ওঠেন,

—শুনেছি সহরের সব খবরই আপনার নখদর্পণে, এতবড় একটা কাণ্ড ঘটবার ষড়যন্ত্র চলেছিল আপনি তার কিছুই জানতেন না ?

চমকে ওঠে শচীন, এস-ডি-ও সাহেবের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে এতবড় সত্যটাকে লুকোতেও সে যেন পারে না। হাউমাউ করে বলে ওঠে,

—দিনরাত এই নিয়েই ডুবে রয়েছি স্যার। আপনি দয়া করে অবনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন। ওদিকে যাবার সময়ও পাই নি।

সাহেব কোন কথা না বলে বের হয়ে এলেন বাংলো থেকে, পিছু পিছু সাইকেল ঠেলে চলেছে শচীন।

—হরেরামবাবু সহরে নেই, ফটিকবাবুও গেছেন আত্মীয় বাড়ী দুদিন আগে।

দারোগাবাবু সাহেবকে কথাটা জানাবামাত্র সাহেব ফেটে পড়েন বোমের মত।

—আগে এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, দরকার হয় বাস রিজার্ভ করে এদের সদর হাসপাতালে পাঠান, তারপর ওসব তদন্ত হবে। এটুকু কমনসেন্স আপনাদের নেই ?

সহরে হাসপাতাল বলতে তেমন কিছুই নেই। আছে নামমাত্র একটা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী। তাও সেখানে নেহাত গরীব এবং নিশ্চিত মৃত্যুপথ-যাত্রী ছাড়া কেউ বড় একটা যেতে চায় না। ডাক্তারও ভালো নেই, একজন এল-এম-এস ডাক্তার টিম্‌টিম্‌ করছে। এসব কেসের হাঙ্গামা দেখে তিনিও ঘাবড়ে গেছেন।

বারান্দায় সারি সারি পড়ে রয়েছে আহতদের দল, আর্তনাদে জায়গাটা ভরে গেছে। দু'একজন গোঙাচ্ছে।

—আর কোন ডাক্তার ?

শচীন সাহেবের মুখ থেকে কথাটা বের হবামাত্র বলে ওঠে,

—আছে স্যার, নোতুন এসেছেন অনিমেষবাবু, এম-বি। আপনি যদি একটা স্লিপ দেন তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। আমিই যাচ্ছি।

শচীন সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেল।

অনিমেষ এসেই অবাক হয়ে যায়।

—যুদ্ধ হচ্ছে নাকি?

এস-ডি-ও সাহেব শচীনের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন,

—সেনাপতিকেই জিজ্ঞাসা করুন।

প্রথম পরিচয় পর্ব শেষ করে অনিমেষ তৈরী হয়ে কাজে লেগে যায়। বহু স্টিচিং কেস, হাত পা ভেঙ্গেছে কয়েকজনের।

—কিছু ওষুধপত্র দরকার। আমার ওখান থেকেই নিয়ে আসুন।

ঘণ্টা চার পাঁচ অমানুষিক পরিশ্রম করার পর একটু নিশ্চিন্ত হোল অনিমেষ। সর্বদাই এস-ডি-ও সামনে ছিলেন। স্তব্ধ দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে থাকেন অনিমেষের দিকে। এতবড় একজন গুণী, নিপুণ ডাক্তার সহরে এসেছেন এটা যেন আনন্দেরই কথা।

—এরা থাকবে কোথায়? এই অবস্থায় বাড়ীতে গেলেই সেপটিক হবে, না হয় অন্য কিছুতে মারা পড়বে।

এস-ডি-ও সাহেব যেন চিন্তায় পড়ে যান, তাঁর এলাকায় একটা হাসপাতালের প্রয়োজনের কথা এমন ভাবে কোনদিনই ভাবেন নি। আজ বেশ বিব্রত হয়েছেন।

—এইখানেই কোন রকমে থাক।

হাসপাতালের ডাক্তার অবিনাশবাবুর বয়স হয়েছে। জ্বর-জ্বারির চিকিৎসা করতেই ভালবাসেন, এসব আসুরিক ব্যাপার তার আসে না। ঝামেলা কাটাবার জন্যই বলে ওঠেন তিনি—এ আর এমন কি? যাক যে যার বাড়ী, এখানে এসে ব্যাণ্ডেজ খুলে নিয়ে যাবে।

অনিমেষ কথা বলল না, একবার বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে চাইল তার দিকে, আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, থেমে গেলেন অনিমেষের চাউনির সামনে।

সাহেব বলে ওঠেন—না, না, ওরা এইখানেই থাক। আমিই সব ব্যবস্থা করছি। আপনি কিন্তু এদিকে দেখাশোনার ভার নিলেন। অবশ্য এর জন্য আপনার ফি বা আনুষঙ্গিক—

সাহেবের কথায় বাধা দেয় অনিমেষ—একবার যখন টেক্ আপ করেছি, দায়িত্ব আমারও আছে। দ্যাট্স্ মাই প্রফেসন।

হাসতে থাকেন সাহেব।

...যমুনা ক'দিন অন্নপথ্যি করে উঠে বসেছে।

রাতের আকাশে জেগে আছে মল্লিকাফুলের মাতাল করা সৌরভ, নিতাই গুন্ গুন্ করে পদাবলি গাইছে।...মন্দির থেকে বের হয়ে আসতেই দেখে ওপাশে আবছা অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে।

—কে? কে ওখানে?

—আমি। অন্ধকারের বুক থেকে ঈষৎ প্রকম্প কণ্ঠে জবাব আসে।

—আমি তো সবাই গো। আবার আমিটি কোন্ জন? এসো—সামনে এসো দেখি তুমাকে?

...এগিয়ে এল সে। প্রদীপের ক্ষীণ আভায় দেখা যায় ফটিকবাবু।...কি যেন একটা পাপ কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে; আমতা আমতা করে—মানে যাচ্ছিলাম এই দিকে ভাবলাম খবরটা নিয়ে যাই।

নিতাই একটু গলা তুলে যমুনার উদ্দেশে বলে,

—ওরে তোর খপর নিতে এসেছেন ছোটবাবু? একটু দেখা দিবি না?

ঘরের ভিতর থেকে চাপা কণ্ঠে বিরক্তিভরা সুর ভেসে আসে—আমরণ। রাতদুপুরে ডাকাডাকি হাকাহাকি!

নিতাইএর মুখে প্রচ্ছন্ন হাসির বিদ্রূপ; গলায় সুর তুলে বলে ওঠে—আজ আর দেখা হবে না বোধ হয়, কুঞ্জ ভঙ্গ হয়ে গেছে।

ফটিক কিছু না বলে বের হয়ে এল আশ্রম থেকে। কেন জানে না যমুনার সন্ধানে সে অকারণেই ঘুরে মরে। তবু না এসে পারে না। এই ক'দিন মামলা-ফৌজদারীর জন্য আসতে পারে নি। আজও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

নিতাই বাগানের আগড়টা টেনে ভিতরে যেতে যমুনা বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে ওঠে,

—আপদগুলো কেন আসে বলোতো? তাড়িয়ে দিলেও আসে। ওরা আবার ভদ্রলোক! ছিঃ!

নিতাই হাসতে হাসতে বলে—পরশপাথর খুঁজছো যমুনা—সব পাথরই তো বুকে তুলে নিতে হবে, নইলে কোনটা পাথর আর কোনটা পরশপাথর চিনবে কি করে গো।

—ছাই! এরা লোহাপাথর, দেখতে কালো—ভিতরে বাইরে কালো, যেমনি কর্কশ আর তেমনি ভারি!

—ঠিক কথা বলেছো যমুনা, না হলে তোমার চুম্বুকে টানবে কেন?

চটে ওঠে যমুনা—রাতদুপুরে হাঁকডাক করে ঘুম ভাঙিয়ে ইকি রসিকতা তোমার?

নিতাই হাসছে; মৃদু মৃদু হাসি তার থামে না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাসতে থাকে। বেজায় চটে গেছে যমুনা।

—নে রাত অনেক হয়েছে শুয়ে পড়—অসুখ শরীরে রাত জাগে না।

মদনের হাঙ্গামা মিটিয়ে বেশ যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন তিনি। ঠাকুরমশায় শাস্তি দিতে চাননি কোনদিনই; কিন্তু অন্যায়কে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না, তাই ওকে বরখাস্ত করবার জন্য তিনিই হুকুম দিয়েছিলেন; অবশ্য যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি যদি ক্ষমা করেন তাহলে সবদিকই রক্ষা পায়, পেয়েছেও। হালকা মনে বাড়ী ফিরছেন। ধুলোঢাকা পথে পড়েছে প্রথম শীতরাত্রির হিমকণা; ভাঁটফুলের গন্ধ হিমেল বাতাসে লুকোচুরি খেলছে—আশপাশের বাড়ীগুলো ডুবে রয়েছে থমথমে অন্ধকারে,

চালতাতলায় রামাবেনের হাঁড়িকুড়ি তেলনুনের দোকানে তখনও জ্বলছে একটা টেমি, অশ্বত্থতলায় ক'জন নামালের গাড়োয়ান গাড়ী ছেড়ে আট নিয়েছে, ইটের চৌখুপি উনুনে খড়ের জ্বাল দিয়ে ভাত চাপিয়েছে তারা।

—পেন্নাম হই ঠাকুরমশায়। আফিস থেকে ফিরছেন? এতো রাত হয়ে গেল যে!

—একটু কাজ ছিল বাবা। এগিয়ে চলেন ঠাকুরমশাই।

বাড়ীতে পা দিতেই সরমা উপর থেকে বলে ওঠে,

—হাত পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এসো। কোথাকার কোন কাপড়ে উপরে এসো না।

ঠাকুরমশাইএর এমনিতেই ওসব দিকে কড়া নজর। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করেন, নিরামিষআহারী-শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ। স্ত্রীর কথায় কোন উত্তর না দিয়েই কুয়োতলার দিকে এগিয়ে যান।

মঞ্জু নেমে এল বাবার কাছে—বামুনমাসীকে কড়াই চাপাতে বলি বাবা; তুমি হাত পা ধুয়ে নাও। কাপড় তোমার ঘরে রেখে এসেছি।

—তুই শুতে যাস নি?

—এই তো পড়ে উঠছি বাবা; রাত তো মোটে ন'টা।

সরমা গিয়ে শুয়ে পড়েছে, হুকুম করে উপর থেকে—দোক্তার ডিবেটা দিয়ে যা তো মঞ্জু।

বাবার পাতের পাশে বসে হাওয়া করছিল মঞ্জু, মায়ের ডাকে একটু বিরক্ত হয়। গলা তুলে জবাব দেয়,

—টেবিলের টানায় আছে—উঠে নাও।

রমণবাবু বলেন—মা ডাকছে—যাও।

—আরও দুটো কাঁচাগোল্লা দিই বাবা, নিজের হাতে করেছি আমি।

—তাই নাকি! চমৎকার হয়েছে।

মঞ্জুর দিকে চেয়ে থাকেন রমণবাবু; বয়স এমনই বা কি হয়েছে, এরই মধ্যে বুঝতে পেরেছে মায়ের ব্যবহার। বাবার জন্য ওর মন তাই ব্যাকুল। সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে। শাড়ী সামলাতে পারে না, রমণবাবু তবুও চান মেয়ে শাড়ীই পরুক।

—চাকরী রইল মদনদার ?

—হ্যাঁ ; মেয়ের দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়েন রমণবাবু—একটুও ধম্মোজ্ঞান ওদের নেই।

জবাব দেয় মঞ্জু,

—ধম্মোজ্ঞানটা তোমাদের কোম্পানীর কি বাবা ? ভারি কে ডাক্তার মিছেকথা বলেছে না সত্যি কথা তা শুনেই ব্যস।

—পাগলী কোথাকার।

উপর থেকে সরমার রুক্ষ কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—হোল তোদের, না সারারাত ধরে বাপমেয়ের খোসগল্প চলবে ? রাত যে দুপুর হয়ে গেল। সদর বন্ধ করেছে কিনা দেখে এসো।

বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন রমণবাবু ; মঞ্জুর তখনও খাওয়া শেষ হয়নি। সে আর বামুনমাসী খেতে বসল একসঙ্গে, সদুঝি ঘুমের নেশায় হাই তুলছে দালানে বসে। এখান ওখান চাপড়ে মশা মারছে।

উপরে উঠে এসে রমণবাবু দেখেন বিছানা খালি, সরমা নেই। হঠাৎ পায়ের শব্দে খেয়াল হ'ল তার, বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে নীচে উঠানের দিকে চোরের মত সন্তর্পণী দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে, স্বামীকে পিছনেই দেখে সরে এল সে।

—খেতে এতো সময় লাগে ? বামুন মেয়ে কি করছিল ওখানে ?

···রমণবাবু স্ত্রীর দিকে চাইলেন কঠিন বিরক্তি ভরা চাহনিতে, জবাব দেন —কি করছিল নিজে গিয়েই দেখলে পারতে ?

সরমা উত্তর দিল না, স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে কি যেন বিচিত্র চাহনিতে।

—তা এত রাত্রে কি জরুরী কাজ পড়লো—যে এসেই ছুটতে হোল ?

—ছিল জরুরী কাজ।

কথা না বাড়িয়ে বিছানায় গিয়ে উঠলেন রমণবাবু। স্ত্রীর এইসব বাজে কথার উত্তর দেবার মত মানসিক প্রস্তুতি তার নেই। মঞ্জু এসে মায়ের ঘরে ঢুকলো। রমণবাবু চশমাটা নিয়ে পড়তে বসলেন—চৈতন্যচরিতামৃতখানা বিছানার পাশেই থাকে। সারাদিনের কাজ মিটিয়ে ওইখানা নিয়ে বসা তাঁর

রোজকার কাজের মধ্যেই পড়ে। উঠতে হয় আবার অতি প্রত্যুষে। হাত মুখ ধুয়ে আহ্নিক সেরে বের হয়ে যান মটর অফিসে।

সরমার অন্তরের গরল তাঁর মনের শুচিতাকেও মাঝে মাঝে কলুষিত করে দিয়েছে। নিজেকে অনেক সময় সামলাতে পারেন নি তিনি, তার কথার উত্তরে দুচারটে কটু কথাও শুনিয়েছেন, সরমার জিব দিয়ে গরল বের হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী; রমণবাবু নিজের ব্যবহারে নিজেই অনুতপ্ত হয়েছেন—ক্ষমা চেয়েছেন স্ত্রীর কাছে।

সরমা তাঁর এই ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে আক্রমণের উপর আক্রমণ চালিয়েছে তাঁর উপরে।

প্রায়ই হয় এমন। এই ত' সেদিনই একচোট হয়ে গেল; ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ।

বাড়ীতে আটপৌরে শাড়ী কেনার ব্যাপারে রমণবাবুর কোন পক্ষপাতিত্ব কোনকালেই নেই। খুব ইতর বিশেষ করতে তিনি চান না।

কয়েকজন আশ্রিতও রয়েছেন,—দূরসম্পর্কের দুস্থ আত্মীয়বর্গ ছেলেপুলে নিয়ে তার আশ্রয়ে উঠেছে, শক্ত-সমর্থ যারা আছে তাদের মটর কোম্পানীতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অন্যেরা সবদিক থেকেই পোষ্য।

গাড়ী থেকে তারিণী ড্রাইভার শাড়ী-কাপড়-জামার পুঁটলিটা বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যেতেই সরমা উপর থেকে নেমে এসে দালানের মধ্যে খুলে বসলো।

---এটা পুঁটির—এটা গোবিন্দের মায়ের, এটা···

···আলাদা আলাদা করে রাখছেন তিনি। সরমা মঞ্জুর কাপড়খানা দেখে মুখ বেঁকিয়ে ওঠে।

—ভেক কি কাপড় কেনার, তার চেয়ে মেয়েকে একটা ট্যানা এনে দিলেই পারতে! নিজের কাপড়খানা দেখে বলে ওঠে,

—জাল জাল, ইকি বিয়ের কনের লজ্জাবস্ত্র এনেছো। চোখ নাই।

কোন কথা বললেন না রমণবাবু, হাতের শাড়ীখানা তুলে দূরে সরিয়ে উঠে পড়লো। গজ গজ করতে থাকে।

—এর চেয়ে ঝি-চাকর-বামুন মেয়ের কাপড় এসেছে ভাল। আসবেই তো। আমরা তো তোমার চক্ষুশূল, আপদ বিদেয় হলেই বাঁচো। তোমার মনের কথা কি আর বুঝতে বাকী আছে ?

সারাদিন কেটেছে বাইরে বাইরে নানা কাজের ঝামেলায়। তেতেপুড়ে আঠারো মাইল রাস্তা এসেছেন—মেজাজ খিঁচড়ে ওঠে এই সব মন্তব্যে। চটে ওঠেন তিনি।

—যা জুটেছে তাই এনেছি। আর সকলের জুগিয়ে তবে আমাদের নিতে হবে। পছন্দ হয় পরবে—না হয় ফেলে দেবে।

ফোঁস করে ওঠে সরমা—তার চেয়ে আমাদিগকেই দূর করে দাও না; যাদের ভাল লাগে তাদের নিয়েই থাকো।

রমণবাবু কোনরকমে রাগ সামলে উঠে পড়েন, ছাতা হাতে নিয়েই বের হতে যাবেন বাধা দেয় বামুন মেয়ে।

—বাবাঠাকুর, এই সময় নাওয়া-খাওয়া নেই, চললেন কোথায় ?

সরমা গর্জে ওঠে—আহাহা, মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী যে। উথলে উঠলে একেবারে। লজ্জার মাথা খেয়েছো। সব বুঝতে পারি।

বামুন মেয়ে লজ্জায় অপমানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রমণবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলেন,

—থামবে তুমি ? যাও উপরে যাও।

পকেটে হাত পুরে দুখানা দশটাকার নোট স্ত্রীকে দিয়ে বলেন—পছন্দ মত কাপড় আনিও নিও।

নিজে নীরবে উপরে উঠে গেলেন। ভাগ্যিস মঞ্জু তখন বাড়ীতে নেই—স্কুলে গেছে। থাকলে লজ্জার অবধি থাকতো না। ঝি-চাকর-ঠাকুরের সামনে এমন করে কথাবার্তা বলা সরমার অভ্যাস। রেগে গেলে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—আর রাগতেও সময় লাগে না বেশী।

বাড়ীতে ঝি-চাকর থাকতে চায় না। রমণবাবুর ব্যবহারেই যতদিন পারে থাকে—নইলে সরমার অকারণ মেজাজেই সব পালাবার পথ খোঁজে। ভরসা একমাত্র মঞ্জু। সেই-ই চারিদিক সামলাবার চেষ্টা করে।

বামুন মেয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছে গিন্নীমায়ের স্বরূপ। দূরসম্পর্কীয়া অনাত্মীয়া মেয়েটি; কাজে পটু। এতবড় সংসার সেই মাথায় করে রেখেছে। সরমা দোতলাতেই বেশী সময় থাকে, নাইতে খেতে নামে। নইলে উপরেই থাকে বিছানায় পড়ে। মাথাঘোরা—মাথাধরা তার পোষা ব্যারাম।

পরদিনই বামুন মেয়ে কথাটা জানিয়ে দেয়—ভাইএর কাছে যাবো বাবা। কালই যাবো ভাবছি।

কারণটা কিছু অনুমান করতে পারেন রমণবাবু, গরীবের ঘরের মেয়ে সত্যি, কিন্তু আত্মসম্মান জ্ঞানটকু হারায় নি, এখানে এসে হারাতে চায় না সেটি।

—না গেলেই নয়?

বামুন মেয়ে ঘোমটা একটু বাড়িয়ে বলে—যেতে হবে। বার বার লিখছে।

সরমা ওপাশে বসেছিল, ঝাঁঝিয়ে ওঠে,

—যাবে তো যেও, সাতখানা করে এত লাগানো কেন? আর তোমারও দেখছি মাথা খসে পড়ছে। মুখে ছাই দি এমন লোকের।···

বামুন মেয়ে এর পর আর দাঁড়াল না, রমণবাবু একটু স্তব্ধ হয়ে অপমানটা নীরবে হজম করে—ভাতে হাত দেন। এ অভ্যাসটা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে আয়ত্ত করেছেন। রাগলে কথাবার্তা বলেন না বড় একটা।

পরদিন থেকে সংসারের হাল কি হবে তা তিনিই জানেন। সময়মত এসে একমুঠো ভাত জুটবে না। সরমা কোনদিকে নজর দেবার দরকার বোধ করবে না। কি যে চায় সরমা এতদিন পর্য্যন্ত বুঝতে পারলেন না তিনি। ঝি-চাকরের পিছনে লেগে তাদের তাড়ানো একটা নিত্যকর্মে দাঁড়িয়েছে সরমার। এই নিয়ে কত যে ঝি-চাকর এলো গেলো তার সংখ্যা নেই। বিরক্ত হয়ে উঠছেন রমণবাবু।

ঝড় উঠছে। কাক চিল শকুনি ঘুরপাক খাচ্ছে ঝড়ের বেগে; নজর ওদের নীচের দিকে যদি কিছু ভক্ষ্যবস্তু পাওয়া যায়। অবশ্য মিলছে না একেবারে তা নয়। হরেরামবাবুর ফৌজদারী মামলা চলছে—সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুরু করেছেন টাইটেল সুটের মামলা। মাধববাবু ঘুর ঘুর করছেন কোর্টে, ওপক্ষের উকিল হয়েছে বসন্ত। অবশ্য শচীন এর জন্য কম পরিশ্রম করেনি।

হরেরামবাবু প্রথম রাজী হন নি বসন্ত লাহিড়ীকে দিতে। শচীনকে তিনি হাঁকিয়ে দিয়েছেন।

—ওসব ছেলেছোকরা দিয়ে হবে না হে।

শচীন মন্তব্য করে—সরষের মধ্যে ভূত ঢোকান বড়বাবু, বসন্তকে মাধববাবু খুব পেয়ার করেন—হয়তো ওঁর মেয়ের সঙ্গে—

বাকীটা খানিকটা অনুমান করেন হরেরামবাবু, ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তাহলে বসন্তকে লাগানো যেতে পারে। তাই কেস দিয়েছেন ওরই হাতে। ইতিমধ্যে ফটিকবাবুকেও হাত করেছে শচীন। ওর সব খবরই রাখে শচীন; বৈঠকখানায় বাদলার দিনে বলে ওঠে,

—ওসব ন্যাডানেড়ির সন্ধানে কেন ঘুরে মরছেন ছোটবাবু, ওরা গভীর জলের মাছ। তার চেয়ে চলুন আজ সন্ধ্যে বেলায়—নিয়ে যাচ্ছি।

ফটিকের পেটে দু'এক ফোঁটা পড়লে আর রক্ষে থাকে না। আদিম বুনো রক্ত মেতে ওঠে। একটু জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—কোথায়?

—আঘাটায় নিশ্চয়ই নয়। চলুন তো। পছন্দ না হয় কানমলে দেবেন খোলামকুচি দিয়ে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে নামল ফটিক; ফিন ফিন করে বৃষ্টি নেমেছে, পথ জনহীন। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বইছে, হাড় অবধি কাঁপিয়ে তোলে। দুজনে সিগারেট টানতে টানতে চলেছে, শচীন ছাতা ধরেছে ওর মাথায়।

···পাড়াটায় রাস্তার কোন আলো নেই। ঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসছে আলো, কাদের হাসির শব্দ। কড়া নাড়তেই গঙ্গামণি দোর খুলে দিল।

—ওমা জামাই যে গো। এসো এসো।

শচীন ওপাড়ায় ওই নামেই পরিচিত।

—কাকে এনেছি দেখ? মস্তলোক।

—ওমা!

গঙ্গামণির কণ্ঠে চাপা বিস্ময়ের সুর। এরকম খদ্দের এ পাড়ায় যার ঘরে আসবে তার বরাত সুপ্রসন্ন বলতে হবে। আদরভরা কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়,

—এসো বাবা ; এসো। ওরে মটু—দেখে যা জামাই কাকে এনেছে।

ঘরের ভিতর নিয়ে গেল তাদের। ফটিক লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। পরণে শায়া আর ব্লাউজ। শাড়ীটা পরছিল বোধ হয়—হঠাৎ অপরিচিত লোক আসতে দেখে লজ্জাতেই খাটের ওপাশে সরে গেছে। হাসে গঙ্গামণি।

—মেয়ের লজ্জা দেখ না। সরে আয় না। ঘরের ছেলে তো এরা। তোমরা বস বাবা। দেখি একটু চায়ের যোগাড়।

বাধা দেয় শচীন—তোমার চায়ে শানাবে না মাসী। তার চেয়ে বাদলার দিন একটু বিলেতীর যোগাড় দেখ না ?

—বাবার আমার চলে তো ?

হেসে ফেলে শচীন—বাবা তোমার বনেদী ঘরের ছেলে, চলে কি চলে না গোঁফ দেখে চিনতে পারছো না ?

ফটিকবাবু ঘাড় নেড়ে সায় দেয়—চলে অল্প-স্বল্প।

এর পর শচীনের তুল্য বন্ধু আর কে হতে পারে তার। বসন্ত লাহিড়ীই রয়ে গেল এ পক্ষে ; শচীন মামলার সাক্ষী তদারক করে গোপনে গোপনে। সরকারের কাজ আপনিই চলে যাবে, হরেরামবাবু সহর থেকে ক'দিন ধরেই নিয়ে আসছেন অসময়ের ফল—বড় বড় মর্তমান কলা, আনারস—লাল কাগজমোড়া আপেল—আরও অনেক কিছু। ভেট যাচ্ছে সাহেবের বাংলোতে।

মুরারী মনে মনে বেশ চটে উঠেছে শচীনের উপর। তার লাভের আশা ভরসা নির্মূল করেছে সেইই, শচীন এখন ফটিকবাবুর বন্ধু, হরেরামবাবুর ডান হাত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরের ভিতর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হরেরামবাবু বলছেন,

—সাহেব আর কি বললেন ?

শচীন জবাব দেয়—মুখ ফুটে হাঁ কি করে বলেন ? তবে পাকে-প্রকারে কথাটা জানিয়ে দিলেন। সাক্ষীদিকে কোন রকমে সরিয়ে ফেলতে হবে। তাছাড়া জায়গা আমাদের, কোন স্বত্ব ওদের নেই সুতরাং ট্রেসপাস যাবে কোথায় ? তবে ওই তিনজন সাক্ষীকে কিছু দিয়ে-থুয়ে কোথাও পাঠিয়ে দেন। এই ধরুন ওদের নাম উঠলেই গোলমাল হবে।

হরেরামবাবুর কাছ থেকে ভূতপূর্ব মেলা কমিটির সেক্রেটারী হাত পেতে মামলার সাক্ষী পাচার করবার জন্য টাকাগুলো গুণে নিয়ে বের হয়ে আসে ঘর থেকে।

ঘরের বাইরে পা দিয়েই চমকে ওঠে শচীন। দরজার পাশে ওৎ পেতে দাঁড়িয়েছিল মুরারী। ওকে দেখেই সাঁ করে সরে গেল না, কি ভেবে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, শচীনের হাতে নোটগুলো তখন ধরা রয়েছে। একটু অপ্রস্তুতের ভাব তার চোখে-মুখে। মুরারী এগিয়ে এসে বলে ওঠে,

···শচীনবাবু যে! কাল অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা, তিনি আপনার খুব সুখ্যাত করলেন—মামলার খুব তদ্বির তদারক করছেন? হরেরামবাবুকে হারতে হবে এ কোর্টে আপনার তদ্বিরেই।······তা এখানে হঠাৎ কি মনে করে?

শচীন সামলে নিয়ে বলে ওঠে—একটু কাজে এসেছিলাম। হাসপাতাল খোলা হচ্ছে কিনা তারই চাঁদার জন্যে। অন্য কেউ আসতে ভরসা পেল না, আমি হচ্ছি ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো—এলাম আমিই। তা হরেরামবাবু মহৎ ব্যক্তি, বললেন হোক না স্বত্ব নিয়ে মামলা, সাধারণের কাজে কেন যথাসাধ্য সাহায্য করবো না? আমি কি সাধারণের বাইরে?

টাকাগুলো পকেটস্থ করে বের হয়ে গেল শচীন, মুরারী কোন কথাই বলতে পারলো না আর, হবেও বা।

অনিমেষ সেদিন সকালের রোদে ডেকচেয়ারটা টেনে নিয়ে রোদ পিঠ করে বসে কাগজ পড়ছে; চোখের সামনে ভেসে ওঠে কলকাতার রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলো; কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রা—কোলাহলমুখর জনতা। সেই চলমান জীবনের কক্ষ থেকে সে আজ ছিটকে পড়া নীহারিকা।

এখানের দিনগুলো যেন কর্মব্যস্ত জীবনের ভগ্নাংশ। সকালে রোদ ওঠে; পূর্বদিগন্তের ধানক্ষেত আঁধারের মাঝ থেকে জেগে ওঠে—সবুজের ঘেরাটোপ পরে দাঁড়ায় নিবিড় প্রশান্তির বুকে; কানা ময়ূরাক্ষীর বুকে ঠাঁই ঠাঁই জমে আছে জলের ইসারা; দুচারজন স্নান করতে নেমেছে, কোথায় বিষকরমচা গাছের বেগুনি

রংএর গুঁড়ি গুঁড়ি ফুলগুলো ঝরে পড়েছে সবুজে ঘাসের গালচের উপর, দূর নামাল অঞ্চল থেকে গরুর গাড়ী বোঝাই করে ব্যাপারী এনেছে রাঙ্গা আলু—মুগ মুসুরি ডাল কলাই, বিনিময়ে ধান নিয়ে যাবে সে। নদীর ধারে বৃদ্ধ বটের নীচে দলবেঁধে তারা আট নিয়েছে রাত্রিতে; রাঢ় দেশের ধুলোতে ছিটিয়ে পড়া খড়—চাকার দাগ আর পরিত্যক্ত উনুনের কালিমাখা ইটের গায়ে ফুটে উঠেছে এদের যাযাবর বাণিজ্যের কাহিনী।···ওপারে কারা এখনও গাড়ীর শিদেনে কাঁথা চাপা দিয়ে ঘুমুচ্ছে, এত তাড়া কিছুই নেই। দু একজন চাষী গরু লাঙল নিয়ে মাঠে নেমেছে, বাঁশবনে সোনালী রোদ কি যেন মায়ার স্পর্শ আনে; সহরের ঘুম ভাঙ্গছে।

বাজারের দিকে দু-একটা তরকারি বোঝাই গাড়ী চলেছে, তৈলহীন চাকার আর্তনাদে ভরে ওঠে চারিদিক।

আম কাঁঠাল বনের সবুজের অন্তরালে কোথায় ডাকছে দু একটা পাখী।

কোথায় চাঞ্চল্য নেই, হুমড়ে পড়েনি জীবনের ছন্দ চলতে চলতে। নদীর জলধারার মত স্বচ্ছ সাবলীল গতিতে চলেছে জীবন; বাতাসে ভেসে আসছে সুরেলা কণ্ঠে কীর্তনের সুর—এই পরিবেশে এই সুরই যেন একমাত্র মানায়।

—সোহই বৃন্দাবন . আর নাহি যাওব
না গাওব রাধা গুণগান।
সোহই রাসলীলা শ্রবণে না আনব
সকলই ভেল অবসান॥

খঞ্জনী বাজছে তালে তালে, নীরব নির্জনতার মাঝে—পাখী ডাকা সকাল সুরে সুরময় হয়ে ওঠে। বাগানের গেটের কাছে সুরটা শুনে উঠে দাঁড়াল অনিমেষ।

—নিতাই!

যমুনার কাঁধে গেরুয়া রংএর হাতে সেলাই করা ঝুলি, কয়েকটা রং-বেরংএর তালি পড়েছে তাতে। পরনে ছোপান শাড়ী, সারা শরীরের শীর্ণতা ভেদ করে ফুটে উঠেছে—দু চোখের কমনীয় চাহনি, টিকলো নাকে একটু রসকলির দাগ।

—এরই মধ্যে বের হয়েছো, এইতো সবে উঠলে অসুখ থেকে।

হাসে যমুনা – ননীর শরীল লয় দেবতা, রোদে গলে যাবে না।

নিতাই এগিয়ে আসে—শোনেন কথা। কতবার বললাম তা কথা কি কানে তুলতে চায়।

যমুনা বলে ওঠে—নেহাত অসুখ হইছিল বলেই পায়ের ধুলো পড়েছিল আপনার, অসুখ সেরেছে আর ওদিক পানে যাননি। দেখছিলাম চেষ্টা-চরিত্তির করে আবার অসুখ বাধানো যায় কি না।

অনিমেষ কথা বলে না – চেয়ে থাকে ও'দের দিকে। বয়সের বহু পার্থক্য তবু কোথায় নিতাই যমুনা যেন একাত্ম হয়ে গেছে। নিতাই এর অন্তরের গভীর ভালবাসার পরিচয় ওর দুর্বলতম মুহূর্তে আর কেউ না দেখুক—অনিমেষ দেখেছে।

—ঘরে মা-ঠান্‌রা কেউ নাই লাগছে।

হাসে অনিমেষ—ওসব পাট নেই আমার।

যমুনা পট করে জবাব দেয়—তা বুঝতে পেরেছি। ঘরে বোষ্টম ফকীর এলে একমুঠো চাল দিতে হয়—সে আক্কেল কি আপনার আছে গো ?

চটে ওঠে নিতাই—যমুনা। থাম কেনে।

অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে অনিমেষ—পকেট হাতড়ে একটা দুয়ানি বের করে দিতে যাবে, বাধা দেয় যমুনা।

—উহুঁ, পয়সা লয় গো, চাল—মা-লক্ষ্মীর ছোঁয়া এক মুঠো চাল লোব। আপনার হাত থেকে লয়। আংগা চরণ ফেলে ঘরের লক্ষ্মী যিদিন আসবে সেই দিন—বুঝলেন ?

…হাসিতে ফেটে পড়ে যমুনা। নিতাইএর যেন বিশেষ ভাল লাগে ওর ব্যবহার। এতবড় একটা লোকের সংগে এমনি মশকরা—ঠিক সহ্য করতে পারে না সে।

—চল। বেলা ঢের হয়েছে।

অনিমেষের বেরুবার সময় হয়ে গেছে। উঠতে যাবে—যমুনা বাধা দেয়।

—দাঁড়ান, একটা গড় করি গো।

সকালের গিণিগলা রোদ অভ্র-রং ধরেছে। পাখীগুলো উড়ে গেছে গাছ থেকে। ওপরের নবাংকুর আখের ক্ষেতে চিরলপাতাগুলো বাতাসে মাথা নাড়ে। বাজারের দিকে লোক চলেছে।

…ধুলো উড়ছে গরুর গাড়ীর চাকায় চাকায়। হিমকণা মুছে গেছে সূর্য্যের তাপে, ধুলো ঢাকা পথের ঘুম ভেঙেগেছে।

মঞ্জু একা সামলাতে পারে না কোনদিক। ঝি সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। উপর থেকে সরমা হাঁক পাড়ে,

—চা হ'ল রে? বেলা যে দুপুর হতে চললো।

বামুন মেয়ে চলে গেছে বাড়ী থেকে। যাবার আগে সরমা নিজে তার পুঁটুলি খুলে দেখে তদন্ত করে তবে ছেড়েছে। সরমার দূর করে দিয়েই দায়িত্ব চুকে গেছে।

মঞ্জুর স্কুল নেই, সেই-ই নেমে এসেছে হেঁসেলে, অনভ্যস্ত হাতে এটা ওটা টানাটানি করছে। সামাল দেয় খুকির মা,

—ওগো বাছা, ডালটা উথলে উঠছে, এট্টু তেল দিয়ে দাও। এতো নয়, দুপলা দিলেই হবে। ব্যস। নামাতে হবে যে! দেখ দিকিন্ বাবু, হাত-পা কামড়ে মরি, তুমি ওই হাঁদল কড়াই নামাবে কি করে! ডাকবো মা-ঠানকে?

বাধা দেয় মঞ্জু—না-না! মায়ের শরীর খারাপ।

খুকির মা ইতিমধ্যে শিলনোড়া টেনে বসেছে। কথাটা কানে যেতে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারে না, গজ গজ করে আপন মনে,

—কে জানে বাছা। দুধের বাছাকে অগ্নিকুণ্ডতে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে কি করে পড়ে থাকে।…উহুঁ—ভাল করে ন্যাতা দিয়ে ধরে কড়াইটা দুহাতে নামাও। আস্তে!

মঞ্জু কোনরকমে কাজগুলো করবার চেষ্টা করে। খুকির মা বারান্দায় এসে হাঁক পাড়ে—কই রে বাজার কি আনলি? এটুকু টুকু মাছ! তোরা সব পেয়েছিস কি বলদিকি? বাড়ীর মাথা ছাতা কি কেউ নাই, আসুক আজ বাবাঠাকুর তোদের তেল মারছি। করেছ কি বাছা—সরে এস—সরে এস। পেল্লয় কাণ্ড বাধাবে দেখছি।

ছুটে গিয়ে খুকির মা রান্নাঘরে ঢুকে জ্বলন্ত কড়াইএ একগাদা কাটা তরকারি ছিটিয়ে দিয়ে সামনের বগি থালাখানা চাপা দিয়ে দিল। তেল জ্বলে উঠেছে দপ্ করে, মঞ্জু দাপাদাপি করে তাতে আবার খানিকটা জল ঢেলে দিতেই লাফ দিয়ে উঠেছে লাল শিখা; খুকীর মা রেগে-মেগে হেঁকে ওঠে,

—ওমা গিন্নীমা, গিন্নীমা !

রমণবাবু রোজকার মত সদর থেকে ফিরে কাজলগাঁ অপিসে বসে—দৈনন্দিন হিসাব, রোড সাইড দেখে, কাজকর্ম মিটিয়ে বাড়ী ফিরছেন। দুপুর হয়ে গেছে, ধুলোঢাকা পথ রোদের তাপে তেতে উঠেছে, ছাতাটা ফুঁড়ে যেন রোদের শিষ-গুলো গায়ে বিঁধছে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ীতে পা দিয়েই কেমন একটা স্তব্ধতা দেখতে পান। সকাল থেকে মাত্র গঙ্গাস্নান সেরে আহ্নিকাদির পর প্রসাদী পেঁড়া দুটো দিয়ে জল খেয়েছেন, দুপুরে আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বেশ একটা প্রয়োজন বোধ করছেন খেতে হবে।

···অন্যদিন বামুন মেয়ে হেঁসেল আগলে বসে থাকতো, তাঁর খেতে দেরী হয় বলে তাঁর আতপান্ন শেষে আলাদা করে ফুটোতো, পাথরের থালায় শুদ্ধচিত্তে এনে হাজির করতো আহার্য্য—কেমন একটা শুচিতা ঘিরে থাকতো তার কাজকর্মে।

আজ সেখানে কেউ নেই, বামুন মেয়েকে তাড়াবার কর্মটি সরমা নিজের হাতেই নিয়েছে কিন্তু তার কাজগুলোর দিকে নজর দেবার কোন প্রয়োজনই বোধ করে নি। খুকির মা বের হয়ে এসে আসন এগিয়ে দিল, জলের গাড়ু গামছা নামিয়ে দিল কুয়োর ধারে ; পাখাটা এগিয়ে দিল। একটু শান্ত হয়ে বসেছেন রমণবাবু, হঠাৎ কানে আসে মঞ্জুর অস্ফুট আর্তনাদ। চমকে ওঠেন তিনি—খুকির মায়ের দিকে চাইলেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। খবরটা দেয় সে,

মঞ্জু রান্নাঘরে এসেছিল কাজ করতে, গরম কড়াই উল্টে পড়ে—ওকে কথাটা শেষ হবার অবকাশ না দিয়েই উঠে পড়লেন ঠাকুরমশাই। মেয়ের ঘরের দিকে ছুটলেন।

পা—হাঁটুর নীচে—কনুই-এ গরম তেল ছিটকে পড়েছে, বেশী পুড়েছে হাঁটুর কাছে। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে ওঠে, সরমা উপরে তখনও দিবানিদ্রায় মগ্ন, পুড়ে যাবার সময় নেমে এসে উল্টে হাঁক-ডাক-তম্বি সুরু করে কর্তব্য শেষ করেছে।

—কে তোকে সাততাড়াতাড়ি এসে পিণ্ডির যোগাড় করতে বলেছিল ?

অথচ তার একটু আগে সরমাই খাবার তৈরীর জন্য গজরেছে।

—নে এখন পড়ে থাক বিছানায়! একটু আলু থেঁতো করে লাগিয়ে দাও খুকীর মা। নামিয়ে দাও কড়াইটা। দেখি। বাবারে বাবা। অসুখ শরীর নিয়ে একদিনও যদি স্বস্তি পাই, হাড়মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেল পোড়া সংসারে এসে।

নিজে বহু কষ্টে তরকারি নামিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ওপরে উঠেছে। ওপাশে থালায় চাপা দিয়ে রেখে গেছে রমণবাবুর জন্য খাবার। ঝি-ঠাকুরের হেঁসেল আজ আলাদা হয়েছে। ওদের তিনজনের জন্য রাঁধতে গিয়েই সরমা আজ মহাভারত সুরু করেছে।

রমণবাবুর হাঁকডাকে বিছানায় উঠে বসলো সরমা, শরীর মেদাধিক্যের জন্য চোখ দুটো স্বভাবতঃই একটু ছোট হয়েছে; কণ্ঠস্বরে ঘুমের আমেজ তখনও লেগে রয়েছে। ঘুম চোখে বসে, ফুটে ওঠে একটা বিরক্তির চিহ্ন।

—কি হয়েছে? বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে নাকি? এত হাঁকাহাঁকি করছো? রান্নাঘরে খাবার ঢাকা রয়েছে, খুকীর মা জায়গা করে দিচ্ছে···

—চুলোয় যাক তোমার খাওয়া, মেয়েটা পুড়ে গেছে ডাক্তার ডাকতে পাঠাওনি, এমনই ফেলে রেখেছো?

দপ করে জ্বলে ওঠে সরমা—ও মেয়ের পোড়াই ভাল। সবতাতেই বাড়াবাড়ি। ভারিতো একটু পুড়েছে—কি করতে হবে শুনি?

চটে ওঠেন রমেণবাবু, তেতে এসেছেন এতটা পথ, পেটে তখনও দানাপানি যায় নি, মেজাজ এমনিতেই গরম হয়ে রয়েছে।

—তুমি মা—না সৎমা। মেয়েটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, তুমি খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছো। লোকে কি বলবে?

উঠে দাঁড়াল সরমা,—লোকে কি বলবে? লোকের খাই না পরি। বড় যে ট্যাঁক ট্যাঁক কথা শোনাচ্ছ। উঠে গিয়ে মুখের সামনে চাট্টি ধরে দিতে পারিনি কিনা তাই এতো রাগ।

কি যেন কড়া কথা বলতে গিয়ে সামলে নিলেন রমণবাবু, স্তব্ধ হয়ে স্ত্রীর ঘর থেকে বের হয়ে এলেন!···নীচে এসে কি ভেবে ছাতা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাবেন বাধা দিল খুকীর মা; সংকুচিত কণ্ঠে বৃদ্ধা ডাক দেয়,

—বাবাঠাকুর !

—কিছু বলবে ?

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে তা ওর সন্ধানী দৃষ্টি কোনদিনই এড়ায়নি। নীরবে দেখে এসেছে একটি মহৎপ্রাণ মানুষ দিন দিন কি করে তুঁষের আগুনে জ্বলছে ধিকি ধিকি। বাইরের প্রশান্তি ও'র কোনদিনই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু অন্তরের নীরব জ্বালা মাঝে মাঝে ওই স্তব্ধ গম্ভীর মুখে কি এক অপরিসীম বেদনার ছায়া আনে।

—চাট্টি সেবা না করে এই রোদে বার হচ্ছেন ?

—একবার ডাক্তার ডেকে আনি মা, মেয়েটা বড্ড ছটফট করছে যন্ত্রণায়।

···অবশ্য এ কাজের জন্য তাঁর না গেলেও চলে, একটা চিরকুট লিখে অপিসে রেণুপদর কাছে পাঠালেই যথেষ্ট। কিন্তু তবুও বের হয়ে গেলেন তিনি নিজে। খাওয়া-দাওয়া রইল মাথায় ; আজই যেমন করে হোক রান্নার জন্য বামুন যোগাড় করতেই হবে।

অনিমেষ খেয়ে-দেয়ে ঘণ্টা কয়েক বিশ্রাম করেই আবার বের হয় চেম্বারে। এই দুপুর বেলা সাধারণতঃ কারোও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে না। হাসপাতালের কাজ সেরে বাড়ী ফিরতে আজ দেরী হয়ে গেছে, ক্রমশ হাসপাতাল জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত হচ্ছে। হরেরামবাবু দাঙ্গায় আর কিছু হোক বা নাহোক, ভাল কাজের মধ্যে এই হাসপাতাল সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ-জনসাধারণ সচেতন হয়েছে—অনিমেষও উঠে পড়ে লেগেছে একে গড়ে তুলতে।

···দুপুরের অভ্ররোদ ঘনকালো কাঁঠাল গাছের পাতায় পিছলে পড়েছে—নিস্তব্ধ ছায়াঘন নদীতীরে দাঁড়িয়ে আছে পালছাড়া গরু-বাছুরগুলো—কোথাও সামান্য জলে ওরা ভিড় করেছে। মাঝে মাঝে কানে আসে মৌচন্দনা পাখীর ডাক। ঘুম আসে চোখের পাতায় পাতায়, নিবিড় আলস্য তাকে তার দুচোখে জড়িয়ে আসছে। এমন সময় হাজির হ'ল রামহরি।

—বাবু !

···আলস্যের মন্থর যবনিকা ভেদ করে ওর ডাকটা আসছে। অন্ধকারের মাঝে প্রবেশ পথ খুঁজে নিয়েছে এক ঝিলিক আলো।

—কি? সাড়া দিল অনিমেষ।

—মটর কোম্পানীর ঠাকুরমশাই দুপুর রোদে নিজে এসে হাজির হয়েছেন। বাড়ীতে মেয়ের কি হয়েছে।

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল অনিমেষ। একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে যায়; একজন কর্মচারীর জন্য তার কাছে এসেছিলেন তিনি ক্ষমা চাইতে। এতদিন সহরে এসেছে অনিমেষ—এমন বিচিত্র লোক তার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে নি।

—বসতে বল। আমি যাচ্ছি।

তাড়াতাড়িই বের হয়ে এল অনিমেষ। দুপুরের রোদের তাপে রমণবাবুর সুগৌর মুখ সিন্দুরের মত টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে। হাঁফাচ্ছেন তিনি, গায়ের ঘাম তখনও মুছে যায় নি।

—আপনি নিজে কেন এলেন কষ্ট করে—এই দুপুরের রোদে। লোক পাঠালেই পারতেন। কি হয়েছে?

—চলুন দেখবেন গিয়ে, পা পুড়ে গেছে অনেকখানি।

···অনিমেষ সাইকেল ছেড়ে ছাতা হাতেই বের হল ওর সঙ্গে।

রমণবাবু যেন একটু শশব্যস্ত হয়ে পড়েন—আপনি আবার কেন রোদে হেঁটে আসবেন? সাইকেল আনুন।

বয়োবৃদ্ধ মানুষটি যদি এই রোদে যেতে পারেন, অনিমেষ ভাবে তারও কোন কষ্ট হবে না। জবাব দেয়—না, ঠিক আছে।

কানাই কবরেজ অথর্ব হয়ে পড়েছে; চোখের দৃষ্টি মনের জোর কমে গেছে। হাতে নাড়ি ধরে তার স্পন্দনগুলো কেমন সব জড়িয়ে যায়। অথচ অতীতে এই নাড়ী-জ্ঞান ছিল তার অপরিসীম। এর স্পন্দনে ভেসে আসত মহাকালের পদধ্বনি···অন্ধকারের জগৎ থেকে আহ্বান আসছে মুক্তির।···রোগমুক্তি না

বন্ধনমুক্তির তা তিনি শুনতে পেতেন। সেদিন সেই ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। আজ পংগু-স্থবির বৃদ্ধ। কুল করণ ভুলতে বসেছেন।

জগবন্ধুই এখন মাত্র কয়েকটা ওষুধ তৈরী করে—আর তৈরী করে গোপনে গোপনে চোলাই-করা সঞ্জীবনী সুরা। কাজল গাঁয়ের ধ্বসে পড়া জমিদারনন্দনরা তাই জগবন্ধুর হাতে। পাড়ায় পাড়ায় একঘর জমিদার ভেংগে বত্রিশ ঘর হয়েছে, তাদের হিস্যা আনা গণ্ডা ছাড়িয়ে কড়াক্রান্তি তক্ পেঁছেছে। ধ্বসে-পড়া জমিদার-বংশধরদের বাহন ওই জগবন্ধু আর শচীন। কানাই কবরেজ এটা জানে না; তবে মাঝে মাঝে সন্দেহ করে কবরেজীর আয় নেই অথচ এসব চলে কোথেকে? সেদিন কথাটা কবরেজমশাই জিজ্ঞাসা না করে পারেন না।

—ওহে কাল যেন বাড়ীর ভিতর একটা গন্ধ নাকে লাগছিল?

জগবন্ধু জবাব দেয়—আজ্ঞে হ্যাঁ কাকা, সারিবাদি সালসা চাপিয়েছিলাম খানিকটা কেমন করে হাঁড়ি ফুটে গিয়ে উনুনেই অনেকখানি পড়ে গিয়েছিল।

সাবধান করে দেয় কবরেজ—ওসব জিনিষ হুঁসিয়ারী করো হে, একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই ব্যস্—অগ্নিকাণ্ড বেধে যাবে।

জগবন্ধু আমতা আমতা করে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে সহরের বুকে। দিনের আলোয় সহর কোলাহল-মুখর হয়ে কোনরকমে সজীব হয়ে ওঠে; সূর্যাস্তের সংগে সংগেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরে নিবিড় অন্ধকার; হিজলের সীমাহীন বিলের বুক থেকে জলো বাতাস আঁধারের সংগে হাতমিলিয়ে হানা দেয় সহরের বুকে, গাছগুলো থমথমে অন্ধকারে দৈত্যের মত আকাশজোড়া মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর-পূব-পশ্চিমে যতদূর যাই কেবল রাঢ় অঞ্চলের ধান ক্ষেতের মুক্ত অংগন—প্রান্তরের শূন্যতার মাঝে থমকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সহরসীমা; অন্ধকারে কেমন ও নিঃসংগ একা পড়ে থাকে।

বাজারের খোয়াঢালা রাস্তায় কোথায় জ্বলে টিমটিম করে মিউনিসিপ্যালিটির তেলের বাতি, দোকানে দোকানে জ্বলে ওঠে চৌদ্দবাতির কেরোসিন আলো—অনিমেষের চেম্বারে, অবনী হাটির গদীতে জ্বলে হেসাক।

কালিমাখা ঝুলভরা ঘরে নড়বড়ে কয়েকটা আলমারিতে খালি বোতল এদিক ওদিকে পড়ে আছে ; লেবেল গেছে ছিঁড়ে—গণেশের সিন্দুরের দাগ বিবর্ণ হয়ে গেছে, ধোঁয়া ওঠা একটা লণ্ঠনের আবছা আলোয় ঘরখানা কেমন বিজাতীয় থমথমে হয়ে উঠেছে ; তক্তপোষের উপর বসে বৃদ্ধ কানাই কবরেজ, গায়ে সেই পুরানো বালাপোষ ; ঠাঁই ঠাঁই ছিঁড়ে গেছে—বের হয়ে পড়েছে তুলো। একাই বসে আছে বৃদ্ধবটের মত। মাঝে মাঝে কাসছে—হাঁপানির টানও রয়েছে এক আধটু। নিজে আর ওষুধপত্র তৈরী করতে পারে না, জগবন্ধুকে বলে বলেও পারেনি।

…জগবন্ধু বাড়ীর ভিতর গোয়ালঘরে হ্যারিকেন জেবলে কি করছে ; পাশে নামান কয়েকটা হাঁড়ি! কালীপুজা আসছে…এই সময় মালের খুব কাটতি। প্রবাদ আছে কাজল গাঁয়ের মাটি অবধি মদ খায়।

বড় হাতায় করে চিড়ে গুড়—পচা পাকাকলা দিয়ে চটকে মেখে তার সংগে বাখর দিয়ে হাঁড়িতে পুরে ময়দার আটা দিয়ে উলুপ বন্ধ করে গোয়ালঘরের মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হয়। হাঁড়ি তোলা হবে সাত-দশদিন পর। ইতিমধ্যে বেশ পচে ফুট কাটতে থাকে ভিতরে।

তারপরের কাজটাই একটু সাবধানে করতে হয়। পুলিশের নজরে পড়ার ভয় আছে ; সন্তর্পণে গোয়ালঘরের ভিতর উনুনের আঁচে চোলাই করা হয় বোতলে বোতলে।

…জগবন্ধু খুব ব্যস্ত। ওপাশে আগুনের উত্তাপে ফুটন্ত হাঁড়ির মুখ থেকে বাঁশের নল বয়ে বিন্দু বিন্দু বাষ্প জলকণায় পরিণত হচ্ছে বোতলের ভিতর। একটু অসাবধান হলে বা বেশী আঁচ হয়ে গেলেই সশব্দে ফেটে যাবে ওই হাঁড়ি। গন্ধে আকাশ বাতাস ভরে উঠবে। শূন্য গোয়ালের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসল সে। একটা শব্দ উঠছে হাঁড়ি থেকে গুড় গুড় গুড়।

নাড়ি টিপে ছাই হবে ; তার চেয়ে এতেই কাঁচা পয়সা আসে। কাঁহাতক লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে ভিখিরীর মত টাকাটা সিকিটার জন্য হাত পাতা যায় !

…মাঝে মাঝে জগবন্ধুও সুরু করেছে চালাতে। টাট্‌কা নামলেই একটু দেখে নেয় চেখে ; সম্ভব হলে পরিমাণমত জল মিশিয়েও দেয়। তাছাড়াও দু'একটা ওষুধ তৈরী করে, সেটা নিছক লোকদেখানি ব্যাপার।

বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঢল নেমে আসে কানা ময়ূরাক্ষী আর দ্বারকা নদী বয়ে, হিজলের বিল !···যতদূর চোখ যায় রূপালী জলরাশি ঢেউ এর উপর ঢেউ মাথিয়ে ছুটে আসে সহরসীমার দিকে, ছোট খালগুলো উপছে ওঠে ওরই সংক্রমণে, সড়কখালির দহের কাছে গভীর গেরুয়াজল ঘূর্ণিপাক খেয়ে খলখল করে বয়ে চলে অন্তহীন সুদূরের দিকে।

নদীর ঘাটে এসে জোটে কয়েকখানা নৌকা ; মালপত্রও সদর থেকে আসে নৌকায়, ওদিকে সাঁইথিয়া থেকে আসে কয়লা অন্যান্য জিনিষপত্র ; ঘাটে ভিড় জমিয়েছে কয়েকখানা বেদের নৌকা ; ছইএর চাল থেকে ঝোলে রকমারি ছিটের সালোয়ার পাঞ্জাবী ; পুরুষ্ঠ যৌবন ওদের বর্ষার নদীর মতই দুকূল উপছে পড়ছে হাসির আবেগে।

—বাত ভাল, বেদনা ভালো—কানপাকা ভালো—হেঁকে যায় সহরের পথে পথে বাঁক কাঁধে যাযাবরের দল। মেয়েরা বাড়ী বাড়ী যায় বিকিকিনি করতে।

—স্বোয়ামী ভালোবাসবে দিদিমণি—বৌরাণী, কত্তা ঘুর ঘুর করবে পিছন পিছন। যাদুটিপ আছে।

কাঁচপোকার টিপ—শিলাজুত—বংশলোচন আরও কত টুকিটাকী মাদুলি তাবিজ বের করে রকমারি রোগের।

—কবরেজ মোশাই !

উইঢিপির স্তব্ধতা ভঙ্গ হয় ; গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন ছিল কবরেজ বালাপোষের আবরণের ভিতর। পরিচিত কণ্ঠে ডাক শুনে চমকে ওঠে। অতীতের কৃতিত্বের আনন্দমুখর দিনের স্বপ্ন ভেসে ওঠে চোখের উপর। পাল্কী হাঁকাতো তখন, সদরে রোগীর ভিড় ধরতো না। তখন থেকেই আসছে গির্রি বেদে। বহুদিনের পরিচিত সে। কানাই কবরেজের তখন রম্ রম্ পশার। মুখে বসন্তের দাগ, একটা চোখ ট্যারা ; বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহটার ভাঁজে ভাঁজে কি এক দুর্বার শক্তি লুকোন রয়েছে। বয়স বেড়েছে ওর-ও।

···অতীতের দিনগুলো ফিরে এসেছে ওর সামনে।

···গিরি বেদে ফিরছে কয়েক বৎসর পর। এই ক'বৎসর কাজল গাঁয়ের বাজার যেন বদলে গেছে। কবরেজমশাই বুড়ো হয়ে গেছেন—চিনতে সময় লাগে তার।

—কে! ও গিরি।

—হাঁ হুজোর, এবার আসল এনেছি। একেবারে জাত কাল কেউটে। ভর যোয়ান। দেখবেন নাকি?

—এ্যাঁ!

কবরেজমশাই ভাবছে অতীতের দিনগুলো। সাপের বিষ থেকে তৈরী করতো কুলগৌরব তাদের এই সূচিকাভরণ। যে সে সাপ হলে চলবে না—চাই খাঁটি জাতের কালকেউটে। মিশকালো-মসৃণ সাপ; কোথাও সাদার তিলও থাকবে না, কেবল চক্রের উপর বাঁকানো তিলকটুকু ছাড়া।···তার কাছে ভেজাল খাটবে না, সাপ ফণা ধরলেই বলে দিতে পারতো কবরেজ আসল না বর্ণশংকর।

—বাঁয়ে হেলেছে যে রে—সোজা পিছুচ্ছে না কেন? এতো তিনি নন।

সেদিন মাথা চুলকোতো গিরি—তাই লাগছে কত্তা। দুসরাটা দেখেন।

ঝাঁপি খুলতেই বিদ্যুতের মত শিউরে ওঠে তির্যক গতিতে···কালো মৃত্যুদূত।

—সাবাস!

—ধর! কামা একে।

নিপুণ হাতে গিরি তখনই ধরে ফেলেছে মাথাটা। সংগে ছোট্ট নাতনি সরবতিয়া একটা ঝিনুক তুলে দেয় ওর হাঁয়ের ভিতর—কচি তালপাতার দোমড়ান শিষের গা বয়ে ঝিনুকের খোলে গড়িয়ে পড়ে দুতিনটে বিন্দু যেন রক্তমুখী নীলার দানা। টল টল করছে। তীব্র বিষ - সমস্ত জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করে দিতে পারে কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে।

অতীতে কানাই কবরেজের সূচিকাভরণ মৃত্যুরোধ করতে পারতো। আজ!

—বয়স হয়ে গেছে কবরেজমশাই, এ সাচ্চা চিজ আর কাকেই বা দোব, লিয়ে এলাম আপনার জন্যে।

কাঁধ থেকে বাঁক নামিয়েছে মেয়েটা। রোদে হাঁপিয়ে উঠেছে। রাংগা আপেলের মত গাল দুটো যেন ফেটে পড়ছে কি এক মদির পূর্ণতায়।

উড়নির আঁচল দিয়ে ঘাম মুছছে। পাঞ্জাবীর বুকটা আদুড়—কনুই অবধি জামার হাতাটা গোটানো। ক্লান্ত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে,

—কি হবে ও নিয়ে গিরি। আর চোখে দেখি না—ওসব মরণবিষ নিয়ে কারবার করতে ভরসা পাই না।

ক্ষুণ্ণ হয় গিরি—বড় আশা লিয়ে এসেছিলাম ; কাজে লাগতো—জীয়ন পেতো কতো মানুষ।

নীরবে চেয়ে থাকে কবরেজ তার দিকে, তার দিন ফুরিয়েছে। সঞ্জীবনী মন্ত্র আজ হারাতে বসেছে সে বার্দ্ধক্য আর জরার আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে।

বার হয়ে এসেছে জগবন্ধু ; থমকে দাঁড়াল। গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। পেটে নাকে তখনও তাজা মদের ঝাঁঝ। মাথাটা ঘুরছিল—হঠাৎ চমকে উঠলো সামনে সরবতিয়াকে দেখে ; সরবতিয়া ইতিমধ্যে ডালা খুলে বের করছে মিশকালো সাপটাকে ; দুলছে সাপটা···ঝড়ে কাঁপা লতার মত হেলছে—শব্দ উঠছে হিস্ হিস্।

সরবতিয়ার সুন্দর সুঠাম হাতখানা ক্ষিপ্রগতিতে নড়ছে এদিকে ওদিকে—দুলছে ওর সারা দেহ—ডাগর চোখের দৃষ্টি সাপটার দিকে নিবদ্ধ। পিঠের বিনুনীটা দুলছে। কানাই কবরেজ বলে ওঠে—নাতনিকে ঢাকতে বল ওটাকে, আকামা কালসাপ !

সরবতিয়া হাসে—ওই লিয়েই হামি ঘর করি বাবু। বড় পিয়ারা।

হাঁটুটা সরিয়ে নিল—চকিতের মধ্যে ঝাঁপির ডালায় একটা শব্দ করে ছোবল মেরে পিছিয়ে এল সাপটা।

মুক্তার মত দাঁত বের করে হাসছে সরবতিয়া—রাঙ্গা গালে টোল পড়েছে।

—ইস্—গোসা দেখছো কি জবর !

···গিরি বেদে সাপ নিয়ে নেমে গেল—যাবার সময় চোখাচোখি হয় সরবতিয়ার জগবন্ধুর সঙ্গে, বেণীটা হেলে পড়ে বুকের উপর—মাথা নীচু করে সরবতিয়া আদাব জানায়।

—সেলাম বাবু।

—জগবন্ধু বলে ওঠে—বিষ বিচবি ?

হাসে সরবতিয়া—কড়া জহর বাবু ; নইতালিমীর কাছে বিচতে মানা যে। কানাই কবরেজ কোন কথাই বললো না ; ফতুয়ার পকেট হাতড়ে একটা সিকি গিরিকে বকশিস দিয়ে আবার চোখ বোজে…তন্দ্রা আসছে। বিস্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে অতীত আনন্দকে অনুভব করতে চায় সে। বর্তমান তার কাছে মৃত—ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন ; হাঁপানির টানটা বাড়ছে—সংগে সংগে সেই বুককাঁপানো কাসি। বুকের কাছে বালিশটা চেপে ধরে কাশির বেগ সামলাচ্ছে কবরেজ। কি ভেবে জগবন্ধু বের হয়ে গেল রাস্তায়। সারা শরীরের অণুপরমাণুতে কি যেন তপ্ত রক্ত-প্রবাহ বয়ে চলেছে। কাঁপছে সে। তরল সজীব পদার্থটা তার দেহের রোমে রোমে স্পন্দন তুলেছে।

নদীর ধারে ছায়া নেমেছে ; ছায়া নেমেছে গেরুয়াযৌবনা নদীর জলে ; নৌকা দুটো দুলছে তালে তালে। স্নান করছে কারা ওদিকে ; লজ্জার বালাই নেই—সম্বলমাত্র অধঃবাসটুকু ; পাঞ্জাবীগুলো দড়িতে ঝুলছে ; এক ঝলক ভেসে ওঠে চোখের সামনে সরবতিয়ার নগ্ন দেহ।

কি যেন টের পেয়েছে মেয়েটি, বিড়ালের মত চতুর সন্ধানী ওর দৃষ্টি। জল থেকেই হাত বাড়িয়ে জামাটি তুলে নিল গায়ে। সহজভাবেই বলে ওঠে,

—সেলাম বাবুজী।

হাসছে মেয়েটি। সদ্যস্নান সেরে উঠেছে। সারা দেহ ঘিরে একটা শ্যামসজীবতা ; দুচোখ যেন আটকে গেছে জগবন্ধুর।

—কি চাই বাবুজী। বিষ—বিষ লেবেন ?

হাসিতে কেঁপে উঠছে ওর সারা দেহ। থর থর কাঁপন লেগেছে ওর বুকে—নিটোল নিতম্বে।

—এই নে!

বের করে দিল জগবন্ধু দুটো বোতল। আজকের তোলা তাজা মাল—রক্তচন্দনের ছিটে দিয়েছে তাতে ; টলটলে রক্তবিন্দুর মত মদির। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সরবতিয়া।

—খাসা মাল। বাকী পয়সা কোথা পাব ?

—দাম লাগবে না ; তোকে এমনিই দিলাম।

হেসে ফেলে সরবতিয়া।

...জগবন্ধু পাকা শিকারী ; চারে মাছ এসেছে জেনেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। আজ না হোক কালও টোপ ধরবে। কি ভেবে নদীর বাঁক থেকে নেমে এল সহরের পথে। ছাদ থেকে অনিমেষ দেখে জগবন্ধু হন হন করে চলেছে সহরের দিকে।

শচীন ইতিমধ্যে সন্ধান পেয়ে গেছে জগবন্ধুর কারবারের। ফটিকবাবু, ন'তরফের সেজ ছেলে অনাদিকান্ত, ছআনির মেজবাবুর কাছে প্রায়ই এক রকম জিনিস খেয়ে আসছে।

ক্রমশঃ কথাটা বের করে শচীন।

—দেশী হলে কি হবে? খাঁটি শাস্ত্রোক্ত কবরেজী মতে তৈরী সালসা, যতটুকু পেটে যাবে ততটুকু রক্ত।

নেশার ঘোরে অনাদিকান্ত কথাটা ফাঁস করে শচীনের কাছেই। শচীন নেশা করে না—একআধটু খায় মাত্র আর সংগদান করে চাটের লোভে। মাংসের কড়াভাজি চিবুতে চিবুতে বলে,

—তা কাজল গাঁয়ের নাম আছে।

—হেঁ হেঁ, জগবন্ধু আমাদের বেঁচে থাক। চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক। বাপ বেইমানী করতে পারে কিন্তু জগবন্ধুর সালসা বেইমানী করেছে—এমন কথা তামাম চাকলার কেউ জানে না।

মনে মনে কি যেন ভাবছে শচীন।

...পরদিন সকালেই ধরেছে জগবন্ধুকে। একই বয়সী, ইস্কুলেও পিঠেপিঠি পড়তো ;...দেখা সাক্ষাৎ হবার মুখে একথা সেকথার পর বলে ওঠে শচীন,

—বেশতো কারবার চলছে জগা, একা একাই খাবি সব ?

চমকে ওঠে জগবন্ধু—মানে! কই আর চলছে কারবার। রোগীপত্তরও নেই, সবাই ছোটে ডাক্তারদের কাছে। ও জয়পাল—জরীপত্তরসের দিন পার হয়ে গেছে রে! হাতপা গুটিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছি। ভাবছি মুদীখানার দোকান দোব।

শচীন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে—কি যেন সন্ধান করছে সে।

—তবে যে মেজবাবু, অনাদিকান্ত—ফটিকবাবু ওরা কি সব ব'লছিল তোর নামে?

শচীনের চোখ দুটো লেগে রয়েছে যেন জগবন্ধুর দিকে; একটু সমবেদনার সুরে বলে ওঠে—ও'রা বড়লোকের ছেলে, ওদের কথার ধারাই আলাদা। তোর নামে যা-তা কি সব বলছিল। তুই আমার ছেলেবেলার বন্ধু, কথাটা তাই শুনিয়ে গেলাম তোকে।

অন্যপথে চলেছে শচীন; জগবন্ধুকে চেনে ও অনেকদিন থেকেই, সোজা আঙ্গুলে ঘি এখানে উঠবে না।

জগবন্ধু হাসতে থাকে—তোর কোন ভাবনাই নেই, আমার নামে যে যাই বলুক—আমি ঠিক আছি।

শচীন বের হয়ে গেল; গেল না—একটু দূরে গিয়ে বাড়ীর রাখালটাকে দেখে থমকে দাঁড়াল; পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে তার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—চাষবাস কি রকম হচ্ছে রে?

—কই আর হচ্ছে বাবু, জমি জেরেত তো ছোট মুনিব ভাগে দিয়ে দিছে। গরু বাছুর ঘরে আর রাখবে না।

—তবে তোরও তো চাকরি গেল তাহলে?

রাখাল ছোঁড়াটা মাথা চুলকোয়—সী আজ্ঞে কত্তার ইচ্ছেয় কম্মো। তবে ওষুধপত্তর তৈরী হচ্ছে সেই কাজেই আছি।

শচীন যেন কিসের আলো দেখতে পায়

—চল একটু চা খাবি না?

—চা! লোভ লাগে রাখালটার। মাঝে মাঝে দেখেছে সে বাজারে রণজিতের দোকানে টেবিল কি বেঞ্চিতে বসে বাবুরা গরম চা ফুঁ দিয়ে খায়। কে জানে খেতে কেমন তার! ভয়ে ভয়ে বলে,

—আজ্ঞে খেলে লিশা-টিশা হবে না তো?

শচীন বলে ওঠে—ব্যাটা আমার ধম্মোপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে? মদ মেরে ফাঁক করে দিলি—তোর হবে চায়ে নেশা?

লালচে দাঁত বের করে হাসে রাখালটা—তা আজ্ঞে কবরেজবাড়ীর দৌলতে মাঝে মাঝে খাঁটি টুকচেন প্যাটে পড়ে; মিছে কথা বলবো নাই—তা এক আধটু পাই।

শচীন আনন্দ চেপে বলে—নে চল—চা খাবি।

ওকে সংগে করে রণজিতের দোকানের দিকে চললো। শচীন মনে মনে হিসাব কষে; এদিকে চাপ দিলে বিশেষ কোন লাভ হবে কিনা অন্যদিকে খরচ দিলে বেশী হবে। ব্যবসাদার সে; মূলধন বলতে টাকাকড়ি কিছুই নেই—আছে খানিকটা পাটোয়ারী বুদ্ধি; তাই সম্বল করে যা কিছু পাওয়া যায়। জগবন্ধু এক পয়সাও দেবে না—এটা সে ভাল করেই বুঝতে পেরেছে।

সেদিন নদীর ধার থেকে ফিরছে জগবন্ধু; মনে মনে গুন গুন করছে একটা সুর। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সরবতিয়ার সদ্যস্নাত দেহটা; আদুড় গায়ে চাপা দিয়েছে আলতোভাবে একটা পাঞ্জাবী; বাহুমূল বগলের কাছটা অনাবৃত… মাখনের মত হলদে আভা বের হয়ে আসে—মসৃণ কমনীয়তা মাখানো আভা; দুচোখে হাসির ঝিলিক।

—দাম কুথা থেকে দোব?

—দাম!…দাম তার কাছে চায় নি জগবন্ধু।

…মনে মনে ভীরু লালসা সরীসৃপের মত পাকিয়ে উঠছে;… ঢাকনির ভিতর থেকে গুমরে উঠছে সাপ—বিষাক্ত হিংসা মাখানো তার সর্বাংগে। মাঝে মাঝে যেন বাইরে আসতে চায়। জগবন্ধু চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

—আরে জগা যে, হন হন করে যাচ্ছিস্ কোথায়?

সাইকেল থেকে নেমেছে শচীন, এগিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে; এসময়ে শচীনকে দেখে একটু বিব্রত হয় জগবন্ধু। মনের মধ্যে সরবতিয়ার ডাগর চোখ দুটো তখনও স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তার দিকে; এখানে শচীনের মত লোকের কোন ঠাঁই-ই নেই।

—কোথায় গিয়েছিলি, দেখলাম নদীর ঘাটে তোকে।

জবাব দেয় জগবন্ধু—বেদেদের কাছে কিছু বক্কেলের দরকারে।

—শুধু বক্কেলের খোঁজে না মক্কেলের খোঁজে ?

চটে ওঠে জগবন্ধু—কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

শচীন বলে চলেছে—রাস্তাঘাটে চলেছিস কি করে এই অবস্থায় ?

জগবন্ধুর পা দুটো টলছে ঈষৎ, চোখে গোলাপী আমেজ ; সকালের সদ্য চোঁয়ান তরল পদার্থ—বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে ভিতরে ভিতরে ; শিরায় শিরায় চলছে তারই চঞ্চল উষ্ণ গতিবেগ। চট্ করে মাথাটা যেন ঘুরে যায় ; গেঁজিয়ে উঠেছে বিষাক্ত পানীয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে জগবন্ধু,

—তোর বাপের তাতে কি ? তোর মত পরের পয়সায় নেশা করি আমি ? সে বাঁদীর বাচ্চা আমি নই।

রুখে দাঁড়াল শচীন—মুখ সামলে কথা বল।

কাজল গাঁয়ের দৈনন্দিন জীবনে এমনি বহু খণ্ড নাট্যের আবির্ভাব হয় রোজই ; মদ সেখানে আভিজাত্য ; ধ্বংসপ্রায় নীলরক্তের আনুষঙ্গিক পাপ এখানে নিত্যসহচর—স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গুলোর একটা বলেই গণ্য হয়। হিতাকাঙ্ক্ষীর দলও তৈরী থাকে। মাটি ফুঁড়ে তারা উদয় হয়ে দুজনকে দুদিকে করে দিল। শচীন গজরাতে গজরাতে সাইকেলে উঠলো—জগবন্ধু যেন ক্ষেপে উঠেছে।

—ছেড়ে দে আমাকে, ওই চুকলিখোরকে আমি শেষ করে দোব।

বলাই বাহুল্য, কেউ তাকে ধরে নেই—ধরবার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না ; জগবন্ধু টলছে—শূন্যের মধ্যে কি যেন ধরবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে বার বার।

ভুলতে পারে না জগবন্ধু সরবতিয়ার সেই পেলব দেহ—নদীর ঘোলা জলে অর্দ্ধেকটা দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। স্বল্প আবরণের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে তার উদগ্র যৌবন। আলেয়ার মত হাতছানি দেয় তাকে বার বার। স্বপ্ন দেখছে সে, হাতের মধ্যে অনুভব করে কার নরমস্পর্শ—সারাদেহ ওর মিলিয়ে গেছে ওই মানসীর সঙ্গে। এ স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে না যায়

বিছানায় কাৎ হয়ে পড়ে আছে জগবন্ধু। স্ত্রী বার কয়েক ডাকতে এসে দাবড়ানি খেয়ে ফিরে গেছে। গর্জন করে ওঠে সে,

—ফের আসবি তো কেটে ফেলবো দু'আধখান করে।

ওর স্বপ্নজগতে কালো হাড়গিলের মত মেয়েটার কোন ঠাঁই নেই; বছর বছর আঁতুড় ঘরে ঢোকে আর এক একটা করে পেত্নীর জন্ম দেয়; নিজেও সেই পেত্নীর মা শাকচুন্নী হয়ে উঠেছে। ওর কাছে সরবতিয়া! দুচোখের দৃষ্টি মরুভূমির উষর রুক্ষতার বদলে শ্যামসজীবতায় ভরে ওঠে।

হাতের কাছে বোতলটা তুলে ঢক ঢক করে গলায় খানিকটা ঢেলে দেয়।··· বুক জ্বলছে—জ্বলুক। মনের সজীবতা সে জ্বালার তুলনায় অনেক বেশী, উটের কাঁটাগাছ খাওয়া—ক্ষুধার শান্তি মুখের রক্তপাত থেকে অনেক আনন্দ দেয় বেশী।

রাত্রি নেমে এসেছে; নদীতীরের শ্যামল বনচ্ছায়া রহস্যময়ী রাত্রির বুকে এলোমেলো দাগ টেনে কি এক মায়াবীরূপের ইসারা গড়েছে—জমাট অন্ধকারের বুকে জ্বলছে জোনাকীর টিপ—ঝিঁঝিঁর সুর ভেসে ওঠে; মাঝে মাঝে আসে দমকাবাতাস—সমাধিমগ্ন আকাশবনানীর ঝুঁটি ধরে যেন একটা দৈত্য মরণঝাঁকানি দিচ্ছে।

এসে দাঁড়াল জগবন্ধু নদীর ধারে, ঘোলা জল তারার আলোয় অন্ধকারের বুকে রুপোলী পাতের মত পড়ে রয়েছে, দুপারের ঘন অন্ধকারের বুক চিরে চলে গেছে সেটা। কাছিটা ডাঙগায় বাধা একটা গাছের সঙ্গে স্রোতের বেগে কাঁপছে তরতর করে—একটু দূরেই রয়েছে নৌকাখানা। রুপোলী পাতের উপর একবিন্দু কালো দাগ। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে টেমির লাল এক চিলতে আলো ছিটকে পড়েছে নদীর জলে—স্রোতের বেগে কাঁপছে তার প্রতিবিম্ব।

জগবন্ধুর দুচোখ জ্বলছে একটা শ্বাপদ লালসায়। দিনের আলোয় যে পশুটা বের হয়ে আসবার পথ পায়নি—রাত্রির অন্ধকারে সে জেগে উঠেছে, সভ্যতা-ভব্যতার সব মুখোস খুলে ফেলে সে এসে দাঁড়িয়েছে নদীর তীরে রাত্রির তমসায়।

কাঠবিড়ালের মত কাছি ধরে ঝুলতে ঝুলতে গিয়ে জগবন্ধু উঠল নৌকায়। একটা ভারি পায়ের শব্দ, কেঁপে উঠল নৌকা।

—কে?

ছইএর ভিতর থেকে বের হয়ে এল সরবতিয়া। গিরি বেদে জগবন্ধুর দেওয়া সেই বোতল দুটো একাই শেষ করে বেহুঁস হয়ে পড়ে রয়েছে

চ্যাটাইএর উপর। মুখের পাশ দিয়ে গেঁজলা বের হচ্ছে, বার কয়েক ডাকতেও সাড়া নেই তার—একটা অস্পষ্ট শব্দ করে পাশ ফিরে শুলো মাত্র। একলা সরবতিয়া একটু ঘাবড়ে গেছে।

—এত রাত্রে?

জগবন্ধু টলছে, কথাগুলো জড়িয়ে আসছে তার, মুখে চোখে বীভৎস হাসির আভা। সামনে কুপিটা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সরবতিয়া। ওই দৃষ্টির অর্থ সে জানে—চোখের সামনে যেন ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বিষাক্ত সাপ, ক্ষুরধার জিবে ওর মৃত্যুনীল বিষ—দুর্বলতম মুহূর্তের জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তেও হানবে চরম আঘাত।

এগিয়ে আসে জগবন্ধু, কাঁপছে সে—শিরায় শিরায় বইছে কামনার জ্বালামাখা উষ্ণ রক্তস্রোত, মুহূর্তের মধ্যে জড়িয়ে ধরল সরবতিয়াকে প্রবল আবেগে—শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে। ওর হাত থেকে কুপিটা পড়ল ছিটকে নদীর জলে।

প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে সরবতিয়া—জগবন্ধু মরীয়া হয়ে উঠেছে। হাতে প্রবল বেদনা অনুভব করতেই ছেড়ে দেয়; সরবতিয়া কামড়ে ধরেছে ওর হাতে, জিভে বোধ হয় নোনতা আস্বাদ। রক্ত ঝরে পড়ছে!

হাত থেকে ফসকে যেতেই লাফ দিয়ে গিয়ে জগবন্ধু ওকে ধরবার চেষ্টা করে। কাঁপছে নৌকাটা দুজনের দাপাদাপিতে, অন্ধকারের মধ্যেই যেন খণ্ড প্রলয় বেঁধে গেছে। বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে গিরি—এতবড় কাণ্ডটাতেও তার কোন হুঁস হয়নি। ধরে ফেলেছে জগবন্ধু সরবতিয়াকে, নিবিড় নিষ্পেষণে পিষে ফেলতে চায়; সরবতিয়ার একটা হাত এদিক ওদিকে কি যেন খুঁজছে। হঠাৎ হাতে ঠেকে একটা বাঁশকাটা হেঁসো। বেদে রক্ত···ক্ষেপে উঠেছে। ঝাঁপির ভিতর গজরাচ্ছে কয়েকটা সাপ।

রাতের অন্ধকার খান খান হয়ে ফেটে পড়ে কার আর্তনাদে; জলধারা-বনছায়া ভেদ করে চীৎকারটা মিলিয়া যায় দূর দিগন্তে। আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে জগবন্ধু —বাঁ হাত দিয়ে অনুভব করে তাজা গরম রক্ত বের হচ্ছে—ভিজে গেছে জামাটা।

নৌকা থেকে ছিটকে পড়ল হাঁটু জলে—কোনরকমে উঠে দৌড়াবার চেষ্টা করে; গলুই এর কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে সরবতিয়া; কি ভেবে নোঙ্গরটা

নিজেই তুলে ফেলল—স্রোতের টানে নৌকাটা পাক দিচ্ছে ; গিয়ে হালে বসল ; ভেসে চলেছে নৌকা রাতের নির্জন অন্ধকারে। কোথায় শিয়াল ডাকছে—স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে সরবতিয়া। বুনো বেদের রক্তে লেগেছে মাতন—রাতের আঁধারে গুম হয়ে কি যেন ভাবছে সে। পালালো লোকটা, জানোয়ারকে শেষ করে দিয়ে এলো না কেন ?

ভোরেই কানাই কবরেজ কার ডাকে উঠে বসলো বিছানায়, বের হয়ে আসতেই সামনে দেখে দারোগা···সংগে আরও কয়েকজন রয়েছে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কবরেজ তাদের পানে। কথা বলে দারোগাই।

—আপনার বাড়ী সার্চ করবো আমরা, এই ওয়ারেণ্ট। এঁরা সাক্ষী এসেছেন।

বুড়োর বাক্যবন্ধ হয়ে আসে, থতমত খেয়ে যায় সে। তারই সামনে কেউ যেন মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা শোনাচ্ছে তাকে।

—আমার বাড়ী সার্চ হবে ?

এ চাকলার মধ্যে কানাই কবরেজ একটা গুণতির লোক, বিশ পঁচিশ গাঁয়ের লোক তাকে চেনে জানে,···একি অপমান। খবর আর একটাও আছে। জগবন্ধু কালরাত্রে আহত অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছে। পথে তাকে অচেতন হয়ে পড়ে থাকতে দেখে কে যেন থানায় খবর দেয়—উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

খাটের উপরেই বসে পড়ে কবরেজ। সব ব্যাপারগুলোই তার কাছে রহস্য বলে ঠেকে, কিছুদিন থেকে জগবন্ধুর হাবভাব যেন অন্য রকম ঠেকছিল, কে জানে কোথায় কি গোলমাল পাকিয়েছে।

···বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে, জগবন্ধুর বৌ—গণ্ডাখানেক ছেলেমেয়ে হাউমাউ সুরু করেছে। কানাই কবরেজ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এত অসহায়—অপমানিত নিঃস্ব কোনদিনই নিজেকে সে ভাবেনি।

সঠিক খবরই পেয়েছিল ওরা ; পুলিশের খাতায় ইনফরমারের জন্য বকশিসের অঙ্কটা দেখেশুনে শচীন সংবাদটা ভেঙে ছিল। বেশীক্ষণ অনুসন্ধান করতে

হয়নি। গোয়ালঘরের মেঝেতেই বের হল চারটে বড় বড় হাঁড়ি—মাল মসলা আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিশুদ্ধ।

কানাই কবরেজ যেন স্বপ্ন দেখছে। তারই বাড়ীতে এতদিন ধরে এইসব জঘন্য কাণ্ড ঘটছিল অথচ সে কিছুই জানে না। লজ্জায় অপমানে তার উঁচু মাথা নীচু হয়ে আসে।

—হাতে নাতে ধরা পড়েছে, তখন আর বলার কিছুই নেই। সে হতভাগা জীবনের শেষ বয়সে আমার মুখে এমনি করে চুনকালি মাখাবে ভাবতেই পারি নি। সবই আমার বরাত দারোগাবাবু, এছাড়া আর বলবো কি?

বাজারের শ'কয়েক লোক কানাই কবরেজের ওখানে জমেছে—যেন গাজনের শিব উঠেছে। ভিড়ের মধ্যে সাধারণ দর্শকের ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসে শচীন।

—কি হয়েছে রে? সামলাতে পারলি না তোরা?

...এ ব্যাপারের যেন বিন্দু বিসর্গও জানেনা সে। হাসপাতালে পড়ে রয়েছে জগবন্ধু...সব কথাই কানে যায় তার। লক্ষ্য করে দরজায় একজন করে কনেস্টবল ও পাহারা বসেছে। অর্থাৎ এখান থেকে সেরে উঠলে অন্য ব্যবস্থা তার হবে—তারই নমুনা আর কি।

গঙ্গামণির ব্যবসা বেশ চলেছে চুটিয়ে; সহরের মাঝখানে ওদের পাড়াটা—নিজেদের আবেষ্টনীর মধ্যে ওরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। শান্তিরক্ষার ভার ওদের নিজেদের পোষা গুণ্ডার উপরেই—মাসকাবারি তার বরাদ্দ। ভজু আর বিশে রাস্তার দুইমোড়ে পান বিড়ির দোকান দিয়ে বসে আছে—আসলে ওরাই ওদের দুটি ঘাঁটিরক্ষক। সবরকম খোঁজ-খপর রাখে—তারই অবসরে পান বিড়ী বিক্রী করে ঘরের পিছনের কামরায় চোরা মদের কারবারও চালায়। সহরের অন্ধকার জগতের এরাই বাসিন্দা; এখানের বাজার ইদানীং বেশ চালু হয়েছে। ফটিক-বাবুর পিছু পিছু এসে জুটেছে ন'তরফের মেজবাবু, গোবিন্দ সিং—অনাদিকান্ত আরও বহু লোক। নজর রাখলে দেখা যাবে এ মহল্লায়, রাত্রির অন্ধকারে

কাজল গাঁয়ের অনেকেই আসে—দিনের আলোয় যারা অন্যরূপে বাস করে। মদের সঙ্গে সঙ্গেই এ ব্যবসার চাহিদাও বাড়ে।

সহরের প্রবীণ উকিল মাধববাবুও আসেন এখানে অন্য বেশে, শীতের দিনে নাক পর্যন্ত চাদরমুড়ে ছড়ি হাতে পিছনের দরজায় এসে টোকা মারেন, গঙ্গামণি-বাতাসী অনেকেরই তিনি রক্ষক এবং ভক্ষক দুইই।

ও টোকার শব্দ গঙ্গামণির চেনা, বাড়ীর ভিতরের রকে বসেছিল, বয়স হওয়ার দরুন দেহে মেদের বাহুল্য বেড়ে চলেছে; কোনরকমে উঠে এসে গলা ছেড়ে চীৎকার পাড়ে।

—তোরা সব ঘরে যা লো, বাইরে কি হৈ-হল্লা করছিস্।

অপেক্ষাকৃত কমবয়সীরা জানে ওই সাবধান বাণীর অর্থ কি। কে যেন হেসে ওঠে—মাসীর নোক এয়েছে নাকি রে?

···গঙ্গামণি আসন পেতে বসিয়েছে মাধববাবুকে ঘরের মধ্যে। ওপাশে নিজেই গঙ্গামণি পানের ডিবে নিয়ে বসেছে।

মাধববাবু হিসাবী লোক, প্রথম যৌবনে এ মহল্লায় আসাটা ছিল তাঁদের একটা আভিজাত্যের পরিচয়; এখানে আসতে আসতে আজ তিনি এইটাকেই ব্যবসার ক্ষেত্র বলেই ধরে নিয়েছেন, অবশ্য এ খবর কাকপক্ষীতেও জানে না।

এ যেন এক অন্ধকার জগৎ, সবকিছুই এখানে জীবন্ত হয়ে ওঠে রাত্রির তমসায়। অন্ধকারের জীব এরা।

—কিছু টাকা চাই মাধববাবু?

—কেন রে?

গঙ্গামণি বিগত যৌবনের অভ্যাস-সুলভ একটু চাহনিতে চেয়ে রইল মাধববাবুর দিকে, ফরাসের উপর বসে আছেন তিনি—মাঝে মাঝে ফুরসিতে টান দিচ্ছেন—গঙ্গামণি উঠে এসে কাছে গা ঘেঁষে বসলো।

—এ নাইনের রীতকানুন কি লোতুন শিখছো বাবু? টাকার লোভ না দেখালে ভালো মেয়ে আসবে কেন?

অর্থাৎ ব্যবসায় টাকা দাদন দিতে হবে।

রাতের যার যা রোজকার সবই আসবে গঙ্গামণির হাতে—তার মোটা অংক চলে যায় অদৃশ্য কালো ওই মাধববাবুর হাতে। তিনিই আসলে বাড়ীর মালিক, কিন্তু বেনামী করা হয়েছে অন্য নামে। গঙ্গামণি উপরেই মালিক সর্বময়ী কর্ত্রী সেজে আছে মাত্র।

—এমাসে জমা যে অনেক কম গঙ্গা।

গঙ্গামণি বলে ওঠে—গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা জানো? লোকের মতিগতিও তাই বাবু, কখনও উজোয় কখনও পিছায়। তাইতো বলছি নোতুন মেয়ে আছে সন্ধানে—

ওপাশেই বাতাসীর বাড়ী. অর্থাৎ তার পিছনে রয়েছে পাঁড়েবাবুরা। বেহাত হয়ে যাবার ভয় আছে। মাধববাবু আমতা আমতা করেন।

—আচ্ছা কাল দেখা যাক কি হয়।

…রাত্রি নিঝ্‌ঝুম হয়ে আসে, মাধববাবু ফিরছেন—বিশের পানের দোকানে হেসাক জ্বলছে। দুচার জন লোক এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে কিসের সন্ধানে। উকিলবাবু গাঢাকা দিয়ে সরে পড়লেন নীরবে। সহরের চারদিকে নেমেছে প্রগাঢ় সুপ্তির ছোঁয়া—এইখানেই এখনও জেগে আছে মানুষ—রাত্রি দ্বিপ্রহরে। তুলসীদাসের দোঁহা মনে পড়ে—

— প্রথম প্রহরমে সবকোই জাগে,
দুসরা প্রহরমে ভোগী।

জগবন্ধুর ঘটনা সারা সহরে তুমুল আলোড়ন এনেছে। চোরাই কারবারীর দল একযোগে সতর্ক হয়ে পড়েছে—কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। কে জানে কবে কে ফাঁস করে দেবে কথা। বেদের হাতে আহত হয়ে পড়ে রয়েছে জগবন্ধু। কানাই কবরেজ বৃদ্ধ বয়সে আজ মুখোমুখি হয়েছে নিদারুণ দারিদ্র্যের। সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল—তাও নিঃশেষ হয়ে এসেছে। বাইরে থেকে এক পয়সাও রোজকার নেই।

জগববন্ধু যেমন করে হোক কাকাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচিয়েছিল। আজ জগবন্ধু আহত অবস্থায় পড়ে আছে, তাকে দুটো ফল কিনে দেবার সামর্থ্যও নেই। সেরে ওঠার পর তার অদৃষ্টে কি আছে ভগবানই জানেন।

থানার দারোগাবাবু ব্যাপারটা এখনও তদন্ত সাপেক্ষে রেখেছেন—কয়েকদিন পরই শচীন এসে হাজির হয় কানাই কবরেজের কাছে।

—কে?

বালাপোষ জড়িয়ে প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে আছে কানাই কবরেজ। দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা পুরোনো বার্ণিশচটা আলমারী, তাক। একদিন থরে থরে ওখানে ওষুধ থাকতো। আজ সব শূন্য। সারা ঘরখানায় ফুটে রয়েছে বিগত গৌরবের চিহ্ন।

চশমাটা হাতড়ান কবরেজমশাই, এগিয়ে এল শচীন।

—আমি কবরেজমশাই।

—ওঃ! চেয়ে থাকে কানাই কবরেজ, চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের দিনগুলো। বিসূচিকায় ভুগছিল ওই শচীন। সহরের কোন ডাক্তার কবরেজই এগোয় নি ওদের বাড়ীতে, পয়সা দেবার সামর্থ্যও ছিল না, বিধবা মায়ের কান্নায় থাকতে পারেনি কানাই, নিজেই তুলে নিয়েছিল তার চিকিৎসাভার।

নাড়ীতে বিকার এসে গেছে, উত্তেজিত নাড়ী কাঁপছে, যেকোন মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে যাবে। মায়ের কান্নার সুর শোনা যায়। কানাই কবরেজ বিরক্ত হয়ে ওঠে,

—চুপ কর বাছা, এসময় কেঁদোনা।

সূচিকাভরণ দিয়েছিল কানাই কবরেজ। সব থেকে মূল্যবান্ বিশ্বাসী ওষুধ। বহু চেষ্টা করেই বাঁচিয়েছিল তাকে; নিজের পকেট থেকে বের করে দিয়েছিল ক'টা টাকা।

—এই দিয়ে পথ্যি কিনে দিও ছেলেকে।

শচীনকে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল সে, সে-সব অতীতের কাহিনী, স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। সেই ছেলেবেলার শচীনের সঙ্গে আজকের এই যুবকের কোন মিলও যেন কোথাও নেই। স্তব্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে কানাই কবরেজ—অতীতের স্বপ্নে সে মগ্ন।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে শচীন ওর দৃষ্টির সামনে,

—একটু কাজে এসেছিলাম।

নীরবে ওর দিকে মুখ তুলে চাইল কবরেজ—চারিদিকে শুদ্ধ নীরবতা। শচীনের কণ্ঠস্বর যেন বেমানান ঠেকে ওই পরিবেশে।

—জগবন্ধুর জন্যে এসেছিলাম। দারোগাবাবুর সংগে কথাবার্তা কয়েছি। জানেন তো থানাপুলিশের ব্যাপার, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

কথা কইল না কবরেজ। একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে,

—ও কথা বলে কোন লাভ নেই বাবা। অন্যায় করেছে শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে। শচীন ওর দিকে চেয়ে থাকে। বৃদ্ধের শেষ সঞ্চয় কিছু আছে। তার থেকে কিছু অংশ বের করে আনতে পারলে হাতে আসতো কিছু। তারপর আইনের বিচারে যা হবার হতোই।

…এই সময় লোকের কাছ থেকে কিছু বের করা খুবই সোজা, বেহিসেবী হয়েই খরচ করে লোকে এই সব বিপদ থেকে রক্ষা পাবার বিন্দুমাত্র আশার সন্ধান পেলে। শচীন তাই সুযোগ বুঝেই এসেছিল, কিন্তু ওর কাছে সে এমনি পরিষ্কার জবাব পাবে ভাবতেই পারেনি। বলবার চেষ্টা করে শচীন।

– কেস এখনও হাতের বাইরে যায় নি। জানেন তো কলমের এদিক আর ওদিক। রিপোর্ট যাবার আগে একটু তদ্বির তদারক করলে হয়তো কম সাজাই হবে।

বুড়ো জবাব দেয়– দেবার মত টাকা পয়সা কিছু তেমন নেই বাবা।—থাকলেও ওর জন্যে সে কাজও করতে যেতাম না।

শচীন বুঝতে পারে—বড় শক্ত মাটি, এখানে আঁচড়ে নখ ভেংগে ফেললেও কোন দাগ ফুটবে না। নীরবে বের হয়ে এল প্রায়ান্ধকার ভাপসা গন্ধভরা ঘরখানা থেকে।

অনিমেষ রোজই যায় হাসপাতালে। জগবন্ধুর কেসটা তার হাতেই। পিঠের ক্ষত ক্রমশঃ মিলিয়ে আসছে। কিন্তু জগবন্ধুর মনের গভীর সে ক্ষত কোথায় স্পর্শ করেছে। উত্তেজনার বশে একটা কাজ হঠাৎ করে বসেছিল, সে

কাজটা যখন করে তখন প্রকৃতিস্থও ছিল না। জোয়ারের আবেগে সীমানার চরম ঊর্দ্ধে উঠেছিল তার মন, উচ্ছ্বাস কমে গেছে, ভাঁটার টানে টানে শূন্যপ্রায় নদীগর্ভে জেগে উঠেছে পাঁক আর আবর্জনা। কি এক নিদারুণ অনুশোচনায় ভরে উঠেছে তার সারা মন। অনিমেষের দিকে চেয়ে বলে ওঠে,

—আর বাঁচিয়ে কি করবেন ডাক্তারবাবু, এর পর আমার পক্ষে বেঁচে থাকা দায় হবে। কবরেজী বন্ধ করে দিতে হবে, আমার বদনাম তো সারাতে পারবেন না, তবে আর বাঁচিয়ে তুলে লাভ কি?

জবাব দেয় অনিমেষ—'টাইম ইজ দি বেল্ট হিলার' জগবন্ধু, কালে কালে মানুষ সব ভুলে যায়। সত্যিই যদি ভাল কাজ কর—দুচার বছরে সব বদনাম ঢেকে যাবে।

কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারে না জগবন্ধু—নীরবে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে অনিমেষের ওই ছেলেটির উপর। করিতকর্মা ছেলে বংশমর্যাদা—সুনাম সবই ছিল। কেমন একটা বদ সঙ্গে মিশে হঠাৎ অন্যদিকে চলে গেল। ওর সমস্ত বুদ্ধি প্রতিভার অপব্যয়ই হয়ে এসেছে ক'টা বছর, মূর্তিমান জীবনের একটা ব্যর্থ অপচয়।

—ডাক্তারবাবু।

অনিমেষ চাইল ওর দিকে—আমার এ সর্বনাশ কে করেছে তা আমি বুঝতে পেরেছি—এর শোধ নেবার জন্যই আমাকে বাঁচতে হবে।

ওর কথায় একটা দৃঢ়তার সুর ফুটে ওঠে। জগবন্ধু অনুমান করতে পারে কে তার এই সর্বনাশের মূল। শচীনের সঙ্গে সেই কথা কাটাকাটির পরই এই কাণ্ড হয়েছে—শচীনই তার এই সর্বনাশ করেছে। অনিমেষ গম্ভীরভাবে বলে ওঠে,

—উত্তেজিত হয়ো না জগবন্ধু, এ সময় এ উত্তেজনা ভালো নয়। একটা অসহায় সমবেদনায় অনিমেষের মন ভরে ওঠে।

বৈকাল বেলায় দেখেছে জগবন্ধুর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসে হাসপাতালে স্বামীকে দেখতে। শীর্ণকায় নিরাভরণা মহিলা, ডাগর দুচোখের চাহনিতে ফুটে ওঠে অসহায় ব্যাকুলতা। দূর থেকে দেখেছে সে—স্বামীর পাশে বসে নীরবে ওর মাথায় হাত বুলোয়—চোখ বয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু।

—ভাল হয়ে উঠবে তো ডাক্তারবাবু ?

হাসপাতালের মাঠে দেখা হয়ে যেতেই অনিমেষকে প্রশ্ন করে মেয়েটি।

—নিশ্চয়ই। তেমন কিছু নয়।

...মেয়েটি চেয়ে থাকে ওর দিকে, অনুমান করতে পারে কত অসহায় ও।

...হাসপাতালে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়ে গেছে। ফাঁকা মাঠগুলোয় উঠছে দোতালা বাড়ী। নোতুন সিট—যন্ত্রপাতি, অপারেশন থিয়েটার হবে। অনিমেষের অধিকাংশ সময় কাটছে হাসপাতালে। প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্যই কথাটা পাড়ে এস-ডি-ওর কাছে।

—সাধারণের কাছ থেকেও সাহায্য আমরা নেব। সহরের ধনী সমাজ সাধারণ লোক সকলের কাছেই আবেদন করবো।

কথাটা কেউই অগ্রাহ্য করতে পারে না। এ ব্যাপারে যত টাকাই ঢালা হোক না কেন অপূর্ণ থাকবেই। তাই—আপত্তির কোন কিছুই উঠতে পারে না। অনিমেষ নিজেই বের হলো—হরেরামবাবু, হাটীমশায়—রামরাম ত্রিবেদী—আরও সকলের কাছে। একেবারে নিষ্ফল হবার কোন আশাই দেখলো না অনিমেষ।

একটি লোককে এগিয়ে আসতে দেখলো অনিমেষ, সে শচীন।

আপনি কাজের লোক, সময়ের দাম আপনার অনেক বেশী। ছুটোছুটি করতে হয় আমরাই করি। আপনি কাজ নিয়েই থাকুন।

অনিমেষ ঠিক যেন ওই শচীনকে বরদাস্ত করতে পারে না, তবুও সহরের মধ্যে যাতায়াত সর্বত্রই—হাতের কাজ তুলে নিয়ে করবার ভাবখানাই বিরক্তিকর হলেও একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারলো না তাকে।

সারাদিনের কাজ যেন হুমড়ি খেয়ে তার ঘাড়ে চেপেছে। সহরের ঢিলে-ঢালা জীবনের সংগে অনিমেষের জীবনযাত্রার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সকালে চেম্বার—হাসপাতাল—বাড়ী ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করেই আবার বেরিয়ে পড়ে, রোগীপত্তরের ডাক—চেম্বার সেরে ফেরে সেই রাত্রিতে।

শত কাজের মধ্যেও অনিমেষ একটি রোগীকে দেখতে যেতে ভোলে না। মটর কোম্পানীর ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ী। মঞ্জুর পোড়া ঘা শুকিয়ে আসছে; ফুলের মত সুন্দর মেয়েটিকে প্রথম দিন দেখার পর থেকেই কেমন যেন একটা মায়া পড়ে যায়।

বিছানা থেকেই হাঁক পাড়ে মঞ্জু।

—খুকীর মা, ডাক্তারবাবুর জন্য চা আনো।

ছোট মেয়েটির সবদিকে নজর—যেন পাকাগিন্নী। সরমাও মেয়ের কাছে যেন কেঁচো, সে আছে নিজের অসুখ নিয়েই। অনিমেষকে পেয়ে বসেছে!

—বাবা, মাথা ধরা কিছুতেই সারছে না। কোন কিছুতেই কমছে না। গায়ে বলও পাই না।

অনিমেষ ওর দিকে চেয়ে থাকে, মঞ্জুই পরিচয় করিয়ে দেয়।

—আমার মা।

এ ধরনের দু'একটি রোগী দেখেছে অনিমেষ; ওদের রোগটা দেহে নয়, মনে। ওদের চিকিৎসা করার পদ্ধতিও তার কাছে স্বতন্ত্র।

—ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করুন, শুয়ে থাকবেন না সারাদিন। মনে করুন—আপনার কিছুই হয় নি। কাজকর্ম করে যান।

একটু নয় রীতিমতই অবাক হয়ে যায় সরমা, এ বলে কি! সারা শরীর রোগে শেষ করে দিয়েছে আর এ কিনা একবার দেখেই স্রেফ কিছুই নয় বলে উড়িয়ে দিল ব্যাপারটাকে। বেশ খুসী হতে পারে না সরমা। অনিমেষ একটা ওষুধ লিখে দিল।

—এইটা খাবেন, রোজ দুবার করে।

ওকে এড়াবার জন্যই জামার আস্তিন গুটিয়ে যন্ত্রপাতি বের করে বলে ওঠে। —দেখি পায়ের ঘা-টা কেমন আছে।

—ভালো হবো তো? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে সরমা।

ঘাড় নাড়ে অনিমেষ—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।

রোগী তবু নাছোড়বান্দা—আচ্ছা খই ঢেঁকুর ওঠে কেন?

অনিমেষ মঞ্জুর ঘা পরীক্ষা করে চলেছে। শুকিয়ে গেছে অনেকখানি, তবে এমন সুন্দর দেহের একজায়গায় রয়ে গেল বিশ্রী একটা দাগ, মিলোবে না হয়তো।

—চিরজীবনের মত রয়ে গেল চিহ্নটা।

সরমা কথার জবাব না পেয়ে বলে ওঠে,

—খইঢেকুর ওঠা বন্ধ হবে তো?

একটু বিরক্তিভরে চাইল অনিমেষ, মঞ্জু ওর দিকে চেয়েই বুঝতে পেরেছে ভাবখানা। মাকে বলে ওঠে,

—হ্যাঁ—হ্যাঁ সারবে। খেয়েই দেখনা।

—খুব জানিস তুই।

...বের হয়ে গেল সরমা, অনিমেষ বিস্মিত হয়ে ওঠে। কয়েকমিনিট পরিচয় ওর সঙ্গে। মেয়ের রোগের খবর জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক—শিষ্টাচার—ভদ্রতা-বোধ সব কিছুরই অভাবটা চোখে পড়ে। সারাসময় নিজের নিয়েই ব্যস্ত। মঞ্জু বলে ওঠে—মা অমনিই।

—হুঁ! অনিমেষ বুঝতে পারে মঞ্জুর সহজাত এই কর্তৃত্ববোধের জন্ম-বৃত্তান্ত। শিশুমন যেখানে যে জিনিষটার অভাব লক্ষ্য করেছে সেইটাকে পূর্ণ করে তোলবার চেষ্টাই করেছে। সমস্ত সংসারে আর সবই রয়েছে—নেই ওই দৃঢ় হাতের শাসন। মঞ্জু তাই এগিয়ে এসেছে—ধীরে ধীরে তার কৈশোর মনে বদ্ধমূল হয়েছে প্রবৃত্তিটা।

—চা খাবার নিয়ে এসেছে খুকীর মা, মঞ্জু বিছানায় উঠে বসেছে।

—হাত ধোবার জল সাবান দাও খুকীর মা, যান হাত ধুয়ে আসুন।

অনিমেষ ওর হুকুমে বিব্রত হয়ে পড়ে।

'না' করবার সাহসও যেন তার নেই। হাত ধুয়ে এসে চা-টা তুলে নিল।

—এ সময় খাবার অভ্যেস নেই, চা-ই নিলাম।

মঞ্জু কথা কইল না। অযথা চাপ দিয়ে বিব্রত করবার বৃথা চেষ্টাও করলো না। অনিমেষ ওর সংযত ব্যবহারে বিস্মিত না হয়ে পারে না।

—আজ আসি।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে মঞ্জু, বাধা দিয়ে ওঠে অনিমেষ—থাক, থাক উঠো না, পায়ে লাগবে। আরও দু'চারদিন পর উঠবে।

মঞ্জু অপ্রস্তুতের মত বিছানাতেই বসে রইল, মুখে ফুটে ওঠে একঝিলিক মিষ্টি হাসির আভা। বের হয়ে এল অনিমেষ।

…কেমন যেন একটা শান্তির স্পর্শ মনে আসে। সারাদিনের কর্মক্লান্তির মাঝে একটু বিশ্রামের অবকাশ।

শীতের মাঝামাঝি সময়। রাঢ়দেশের বিস্তৃত মাঠে এসেছে পাকাধানের নিমন্ত্রণ। রাঁধুনীপাগল—কামিনীভোগ ধান পেকে উঠেছে, ভোরের শিশির সোনারংএর ধানের গায়ে জমাট মুক্তোর আভা আনে, আলের মাথায় ফিঙে-মৌচন্দনা পাখীর দল নেমেছে। দূরের মাঠে নেমেছে চাষীর দল…গুড়ি মেরে বসে কাস্তে চালাচ্ছে পাকাধানে, হাতে—কাস্তের ফলায় লেগেছে শিশিরকণা—রোদ পড়েছে তাতে, ঝিকমিক করছে।

…উত্তুরে হাওয়ায় উড়ছে ধুলো, ধূলিধূসর মেঠো সড়ক বয়ে গাড়ী গাড়ী ধান আসছে। নির্জন মাঠ ভরে উঠেছে কাদের গানের শব্দে। সারা বৎসরের বাকী কয়েকটি মাস ধরে চলে এই মধুমাসের প্রস্তুতি।

মহকুমা সহর কাজল গাঁ এই ধানের রাজ্যে অবস্থিত। এর প্রধান বাণিজ্য-সম্ভার এই ধান—আর সামান্য কিছু রবি খন্দ। সহরের মধ্যেও এর সংক্রমণ সুরু হয়েছে। পাড়াগাঁ থেকে গরুরগাড়ী বোঝাই ধান এসে জমা হচ্ছে বাজারে, তার চেয়েও হিসেবী চাষীরা বস্তা বস্তা চাল তৈরী করে এনেছে। সারা বৎসরের কেনাকাটা—কাপড়-চোপড় সমস্ত কিছু এই ধান থেকেই। কাজল গাঁ এই সময় জমজমাট হয়ে পড়ে।

ফণী চক্রবর্তী মশায়ের বড় ছেলে ননীবাবুর সময় এখন নেই। নদীর ধারে বিস্তৃত উঁচু ডাঙাটা ভরে গেছে গাড়ীর ভিড়ে, গাড়োয়ানেরা গরু ছেড়ে দিয়ে রোদ পিঠ করে বসে রয়েছে—গরুগুলো বাঁধা অবস্থাতেই গাড়ীর থেকে মুখ বাড়িয়ে খড় টানবার চেষ্টা করছে। ওপাশে কয়েকটা বড় বড় কাঁটাপাল্লা টাঙানো। হাঁক-ডাক সোরগোলে ভরে উঠেছে মাঠটা।

—এক মন ছত্রিশ সের সিংগল বোরা বাদ।

একজন কয়াল হেঁকে চলেছে, অন্যজন জাবেদাখাতায় লিখছে।

নিরক্ষর চাষীর দল, বাবুদের আড়তে এসেছে, ব্যস এতেই নিশ্চিন্ত। এদিকে ননীবাবু মাঝে মাঝে বাটখারা বদল করে বসে—অন্যদিকে হাঁক শুনে এক লিখতে অন্য কিছু লেখে, এটা অনেক সময়ই ওদের বুদ্ধির অগোচর থাকে। তবু দু'একজন প্রতিবাদ করে,

—পাল্লার পাষাণ দেখে লুব বাবু।

—বেশ তো, দেখবে বই কি। ধান কি জলে ভিজান ছিল মিঞা। এ যে পাথর পারা।

মিঞা বলে ওঠে—না বাপজান, ভিতরে সোনাপুরা আছে কিনা। টিপে দেখে লাও।

…ননী দুহাতে ধান কিনে চলেছে। ঢলতা, কয়ালি, আড়তদারি বাবদ মুনাফাতো আছেই, মনকরা দুসের ওজন বাঁচবেই—কাঁচা ধানের নজির আর শুকতো বাদ দেখিয়ে। তার পর লাভ তো পরে আছে। অন্য কোন আড়তদার এত পয়সার মালিক নয়। যত ধান হোক ননী সবই কিনে বসে। তাছাড়া ওপাশে রয়েছে তার কাপড়—তেলনুন মশলার দোকান।

ধান আড়তে দিয়ে রসিদ নিয়ে বাজারে গেলেই কাপড়-চোপড়—মশলা সবই মিলবে তাঁর দোকান থেকে। বড়মিঞা হাসতে হাসতে বলে—'বাজান্' ঢেক দরগা করে রেখেছে। এক মুর্গী তিনদরগায় জবহ করে দিবা নাকি?

কথাটা মিথ্যা নয়, ধানের আড়তে যা মারবার সেতো হলোই, বাকীটুকু সাফ করা হবে ওই দোকানে।

…কর্মচারীরা সাবধানে থাকে—ননীর দৃষ্টি সবদিকে, কেউ যে ভুল করেও একছটাক ধান চাল সরাবে তার উপায় নেই। কর্মচারীদিকে কড়া নজরে রাখে।

—নোটনা কোথা গেল রে? সে হতচ্ছাড়া এলে ডেকে দিবি আমার কাছে। ধানগুলো গুদামে তুলতে হবে না? ব্যাটারা মাইনে খাস, কাজের বেলায় ইতরামি। লাথি মেরে দূর করে দোব—

কুলি মজুর থেকে—কয়ালরা পর্যন্ত ওর মুখকে ভয় করে। পয়সার নেশা ওকে এই বয়সেই পিশাচ করে তুলেছে। দিনরাত পড়ে আছে আড়তে—না হয় দোকানে। বাড়ীঘরের সংগে সম্বন্ধ ওর একরকম নেই।

আশেপাশে আর দু'একটা ছোট আড়ত গড়ে উঠেছে—তবে তারা ছোট কারবারী। খুচরা দশ বিশ মন কেনাবেচা করে—আর ননীকে মনে মনে শাপ-শাপান্ত করে। সব চাষীকেই সে ডেকে নেয় তার আড়তে, কাউকে ওই ব্যবসা থেকে দুপয়সা রোজকার সে করতে দেবে না, এ যেন তার জেদ।

ফণীবাবুও বেশ মেতে উঠেছে বৃদ্ধ বয়সে। চারিদিক থেকে আসছে টাকা। গাড়ী একখানার জায়গায় তিনখানা করেছে; ছোট ছেলে মণি এদের গোত্র ছাড়া। ওই পড়াশোনা করছে কলেজে। দাদার কথায় সাফ জবাব দিয়েছে।

—ধানের ধুলো মাখতে আমি পারবো না।

সে একটু বাবু গোচের, পোশাক-আশাকে চালচলনে সে একটু মার্জিত, কিন্তু ননী ধানের ধুলোমেখে অর্থের স্বপ্নই দেখে।

চালচলনে ফুটে ওঠে তার কাঠিন্য রুক্ষতা। সদাসন্দিগ্ধ মন নিয়ে চারিদিকে চেয়ে থাকে—পৃথিবী তার কাছে লুণ্ঠনের সামগ্রী; রক্তে তার লুণ্ঠনকারীদের উষ্ণতা।

রাঢ় সংস্কৃতির সংগে জড়িয়ে আছে মেলা পর্ব। পাকাধান ঘরে উঠে এসেছে, ঘরে ঘরে এসেছে ক্ষণিকের প্রাচুর্য। দেনা মিটিয়ে—এ ধান তাদের চৈত্রমাসেই শেষ হয়ে যাবে,

প্রবাদ আছে—

শিমুলের ফুল ফুটলো।
চাষীর ভাত উঠলো॥

অর্থাৎ বসন্তের প্রারম্ভেই তার সঞ্চিত সমস্তনাধই নিঃশেষ হয়ে যাবে, তার পরেই সুরু হবে তাদের সাংবৎসরিক দুঃখের পর্ব। এ দুঃখ, সংগ্রাম তাদের চিরন্তন। এর ছেদ নেই, যতি নেই। পুরুষানুক্রমে চলে আসছে এই রীতিতে, এই সময় থেকেই ধনী পড়শীর কাছ থেকে ধান ধার নেবে—বৎসরান্তে শোধ দেবে দেড়াধান দিয়ে।

তবুও খামারে সোনাধানের স্তূপ তাদের সব দুঃখ দৈন্য ভুলিয়ে দেয়। মন বেহিসেবী হয়ে ওঠে; এইসময়ই গ্রামপ্রান্তরের মরা শিব—না হয় কোন সমাধিস্থ বৈষ্ণব মহাজন হঠাৎ চাগাড় দিয়া ওঠেন। সারা বৎসর দূরে মাঠের মধ্যে আমবাগানের অন্ধকারে পড়েছিল অনাদৃত হয়ে—সেই অনাদর শতসহস্র মনের আকুতিতে শতগুণ হয়ে প্রকাশ পায় এই সময়ে।

দূর দূরান্ত থেকে আসে দোকান পশার, ভ্রাম্যমাণ বাজির দল—তাঁবু খাটিয়ে ময়লাসালুর গায়ে ফেস্টুন টাংগায় "গ্রেট রয়্যাল সার্কাস"। খাঁচার মধ্যে জীর্ণ

চিতেবাঘ হাঁপাচ্ছে, দুটো শোতেই তাকে পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় খোঁচা মেরে লোককে ওর গর্জন শোনানো হয়।

সবচেয়ে মেলার আকর্ষণীয় স্থানটা একটু দূরে। মেলা কর্তৃপক্ষ নিজেদের খরচায় বাঁশ-সর-তালপাতা দিয়ে ছোট ছোট খুপরি গড়ে দেয়, সেখানে এসে আশ্রয় নেয় বাতাসী—গঙ্গামণি বাড়ীওলীদের বাতিলকরা দেহোপজীবিনীরা; রাতের অন্ধকারে গ্রামবাসীরা ভিড় জমায় সেখানেই, সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে ওরা ঘরে নিয়ে যায় কুৎসিত রোগ—বংশানুক্রমিক ভাবে তা পুষে রাখে রক্তে। তবু কি এক দুর্বার নেশায় ওইখানেই তারা যায়, সামান্য গানের সুর আর দেহ নিবেদনের ভঙ্গিমায় আকৃষ্ট হয়ে শিখামুগ্ধ পতঙ্গের মতই।

সেদিন প্রথম দেখে অনিমেষ মদনবাবুকে মিঃ পালিতের বাংলোয়। বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, মাথার চুলগুলো প্রায় সব সাদা হয়ে গেছে; রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো চশমার আড়ালে ওর চাহনি যেন অন্তরস্পর্শী। কথা বলেন কম; মনে মনে ওর অফুরান কর্মক্ষমতা। মিঃ পালিতকে জানাতে এসেছেন আবেদন।

—এসময় স্কুলের পরীক্ষা, ম্যাট্রিকও এগিয়ে আসছে। যদি পনেরোদিন মেলার অনুমতি দেন ছেলেদের ক্ষতি হবে।

অনিমেষ একটু বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে; মদনবাবুর নাম শুনেছিল; সংসারে আপন বলতে বিশেষ কেউ নেই।···কাজল গাঁয়ে এসেছিলেন আজ থেকে তিরিশ বছর আগে স্কুলের মাষ্টারি নিয়ে। ক্রমশঃ তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহ এবং চেষ্টায় কাজল গাঁ স্কুল আজ জেলার মধ্যে সুনাম করেছে। সহরের স্কুল ছাড়াও তিনি আরও একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন হরেরামবাবুদের পল্লীতে; গার্লস্ স্কুলের প্রতিষ্ঠার মূলে তিনিই। জীবনের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য আশা—শিক্ষা বিস্তারের দিকেই নিয়োজিত করেছেন।

···মিঃ পালিত হাসতে থাকেন ওঁর কথা শুনে।

—মেলায় হরেরামবাবুর বেশ কিছু খাজনা আদায় হয়; বেশীদিন অনুমতি না দিলে তাঁদের অসুবিধা হবে যে।

অনিমেষ বলে ওঠে,

—ওঁর কথাটাও ভেবে দেখবার মত।

—আচ্ছা দেখছি। যা হয় পরে জানাবো। চা খাবেন একটু?

হাতজোড় করেন মদনবাবু—আজ্ঞে ওটার অভ্যেস আমার নেই। নমস্কার।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি; অনিমেষও বের হয়ে এল ওর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায়।

—আপনার সঙ্গে আগে পরিচয় হয়নি, আজ হোল।

হাসেন মদনবাবু—ঠিকই হোত। আপনার নামও যথেষ্ট শুনেছি। কাজের মধ্যেই আপনার পরিচয়।

নিজের প্রশংসা শুনে একটু কুণ্ঠিত হয় অনিমেষ—কি আর করেছি?

—যথেষ্ট, এখানে হাসপাতাল হোতো কিনা সন্দেহ। আপনার কথা সহরের লোকের মুখে মুখে।

নিজের প্রসঙ্গটা চেপে যান মদনবাবু; সহরের জীবনইতিহাসে ওর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে; শিক্ষার আলো বিস্তার করেছেন যাবা তিনি তাঁদের অগ্রণী।

…বেলা বেড়ে উঠেছে; বাজারের দিকে চলেছে যত চাষীর দল শাকসব্জী নিয়ে।

—পেন্নাম মাষ্টার মশাই।

একজন চাষী তরকারীর বোঝা নামিয়ে প্রণাম করে মদনবাবুকে।

—ভাল আছেন?

—হ্যাঁ। ছেলে কোথায়?

—আজ্ঞে কলেজে পড়ছে বহরমপুরে।

বোঝা মাথায় নিয়ে আবার চলে গেল সে। অনিমেষকে বলে মদনবাবু—ওর ছেলে গতবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে। বড় ভালো ছেলে।

অনিমেষ বুঝতে পারে মদনবাবু শিক্ষকজীবনে কতখানি সার্থক হয়েছেন। ওদের জন্যই মদনবাবু প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন এতদিন ধরে।

হাসেন মদনবাবু—ওরা অকৃতজ্ঞ নয় অনিমেষবাবু; উপকার ওরা ভোলে না। কিন্তু সহরের অনেকেই আছেন—যাঁরা অনেক সুযোগ-সুবিধা নেন, আবার

সুযোগ পেলেই অপবাদ দিতে ছাড়েন না। দিন যাক—ক্রমশঃ আপনিও চিনবেন তাদের।

অনিমেষের মন ঠিক এতে যেন সায় দিতে পারে না; উপকার করে সে নিঃস্বার্থভাবেই, কারো কাছে কোন প্রতিদানের আশা না রেখেই, সুতরাং এ নিয়ে কোন অভিযোগও করতে চায় না সে। বলে ওঠে—তবুও তো কাজ বন্ধ করা যায় না। ভালোমন্দ দুই নিয়েই মানুষ।

হাসতে থাকেন মদনবাবু—সারাজীবন মনকে সেই কথাই শুনিয়েছি। কিন্তু বয়স হয়ে গেছে, জীবনের শেষ দিন আসতে দেরী নাই। কি সঞ্চয় রেখে গেলাম বলতে পারেন? আজ মানুষের কাছে—যাদের জন্য জীবনপাত করলাম তাদের কাছে দাবী কি কিছুই আমার থাকতে পারে না? আশা করা কি অন্যায়?

অনিমেষ চেয়ে থাকে ওর দিকে; গাছের ঘন পত্রাবরণের ফাঁক দিয়ে ওর মুখে এসে পড়েছে একঝলক সোনালী আলো, ধূলিধূসর পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি অসহায় বৃদ্ধ, যে সমাজের কাছে—মানুষের কাছে এতটুকু প্রীতি ভালবাসার জন্য হাত বাড়িয়েছে—প্রকম্প শীর্ণ ভিখারীর রিক্ত হাত।

একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুকচিরে বের হয়।

বেলা অনেক হয়ে গেল—আবার স্কুল আছে। চলি।

নীরবে এগিয়ে চলে অনিমেষ হাসপাতালের দিকে; মনের সামনে ফুটে ওঠে অসহায় একক ওই বৃদ্ধের পাণ্ডুর চাহনি। কিছুতেই যেন ভুলতে পারে না ছবিটা। কি তিনি চান ওদের কাছে? অর্থ—প্রতিদান? কে জানে?

কোর্টে জগবন্ধুর মামলা উঠেছে। উকিল দেবার সামর্থ্য নেই। কানাই কবরেজ নীরবে বসে আছে এককোণে দর্শকের মত। আজ তার দৈনন্দিন সংসার চলাই দায়। কোনরকমে দুবেলা জুটছে; তার উপর আবার এই খরচা কোত্থেকে করবেন তিনি। বৃদ্ধ স্থবির অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন হাকিমের দিকে; সংগে জগবন্ধুর বড় ছেলে মেয়েটা এসেছে। বাবাকে দেখছে তারা; শীর্ণ চেহারা, চোখমুখে পাণ্ডুর বিষণ্ণতার ছায়া, মাথা নীচু করে বসে আছে কাঠগড়ায়। এপাশে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অন্য কে একজন লোক, খানাতল্লাসীর সময় পুলিশ

মাটির তল থেকে তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে।…জগবন্ধুর কপালে গভীর ক্ষতের লাল দাগ; মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। ছেলেমেয়েরাও যেন তাদের বাবাকে ঠিক আপন বলে ভাবতে পারছে না। জগবন্ধু দু'একবার ব্যাকুল চাহনিতে চাইবার বৃথা চেষ্টা করে তাদের দিকে; বৃদ্ধ কাকার নীলাভ আঁখিতারায় আজ বেদনার ছায়া; জগবন্ধু জানে বিচারে তার সাজা হবেই, এবং জেল। সমাজে লোকসমক্ষে সে পরিচিত হবে জেল-ফেরত আসামী বলে। উঁচু মাথা আপনা হতেই নীচু হয়ে আসে।

অনিমেষ এসেছে কোর্টে, সেও চেষ্টা করছে জগবন্ধুর হয়ে, উকিল ঠিক করে দিয়েছে নিজেই।

হঠাৎ ও-পাশ থেকে বসন্ত লাহিড়ীকে উঠতে দেখে বিস্মিত হয় সকলেই।

মাধববাবু লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়ে প্রতিপন্ন করেছেন প্রায়—যে জগবন্ধু পাকা ক্রিমিন্যাল, সমাজে তার থাকা মানেই এইসব অপকর্ম বৃদ্ধি পাওয়া।

—মি লর্ড।

বসন্ত লাহিড়ী তরুণ ভরাটি গলায় কি যেন বলতে থাকে। দর্শকদের অনেকেই অবাক হয়ে যায়; টানা পাখাওলা—পাখা টানছিল, সেও অবাক হয়ে নোতুন উকিলবাবুর দিকে চেয়ে থাকে।

—মি লর্ড, আসামীর কাঠগড়ায় যাঁকে হাজির করা হয়েছে, তিনি সহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক; এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কবিরাজের নিকট আত্মীয়। কবিরাজী মতে 'আসব' 'অরিষ্ট' তৈরী করবার অনুমতি এবং অধিকার তাঁর আছে, এবং সে অধিকার সরকার থেকেই তাঁকে দেওয়া হয়েছে লিখিত ভাবে।

কথাটা শুনে চমকে ওঠে কানাই কবরেজ, এটা সে একবারও ভাবেনি। যা পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে তাতে অন্যকিছু নেই—একমাত্র 'অরিষ্ট' তৈরীর উপাদান এবং কিছু 'অরিষ্ট' ছাড়া। কবিরাজী মতে শোধন করে নিলেই তা ওষুধে পরিণত হবে।

বসন্ত লাহিড়ী নিপুণ কবিরাজের মত বলে চলেছে,

—শোধন করবার আগেই পুলিশ তাকে অন্যায় ভাবে ধরে এনে হাজির করেছে, এবং আপত্তি দিতে যাওয়ার ফলে—তাঁকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত হতে হয়।

লাফ দিয়ে ওঠেন সরকারী উকিল—ইওর অনার। সম্পূর্ণ মিথ্যা এ অভিযোগ। উল্টে চার্জ। পুলিশও ঘাবড়ে যায়; এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ একটু জুটিয়ে ফেললে ফ্যাসাদও ঘাড়ে পড়তে পারে। কানাই কবরেজ সোজা হয়ে উঠে বসেছে চেয়ারে—উত্তেজনায় কাঁপছে বুড়ো। বসন্ত লাহিড়ী গলা চড়িয়ে বলে চলেছে,

—আমি আমার মক্কেলের তরফ থেকে অভিযোগ করছি অযথা এই পুলিশী জুলুমের প্রতিকার করা হোক—মাননীয় বিচারক এর বিহিত করুন।

পুলিশ কাউকে হাতে-নাতে ধরে আনেনি। ওর বাড়ী থেকে শিকড়-বাকড় যন্ত্রপাতি আর কিছু অরিষ্টের মিশ্রণ পেয়েছে মাত্র।···কোর্টে হাজির করা হয়েছে সেগুলো—হাকিম দেখেশুনে গম্ভীর হয়ে ফিরে এসে এজলাসে বসেছেন।

মাধববাবু কেমন বেকুব বনে গেছেন, মামলায় প্রতিপক্ষ যে এই অভিযোগগুলো করবে তার কথা ভাবেন নি, আটঘাট বাঁধা তো দূরের কথা। অতর্কিত আক্রমণে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বুঝতে পারেন কোথায় একটা ষড়যন্ত্র চলেছে একে কেন্দ্র করে।

দারোগাবাবুকে বলে ওঠেন তিনি—ডায়েরী করবার সময় একটু উল্টে চাপ দেননি কেন? এখন মারের চার্জে আপনি না পড়ে যান!

মিঃ পালিতের মনে অনিমেষের কথাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনুমান করতে পারেন অপরাধ সামান্য করেছে জগবন্ধু, কিন্তু কোন অদৃশ্য হাতের চাপে এসে এইখানে ঠেকেছে। ওর সেই রাত্রে আহত হওয়াটাও কেমন রহস্যজনক বলেই মনে হয়। অন্তরালে একটা চক্রান্ত ছিল এই ধারণা ওঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। কোর্টে ওই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়েও মিঃ পালিতের মন গলে যায়। নীরব—বেদনাভরা চাহনিতে তারা চেয়ে রয়েছে দূরে—ওদের বাবার দিকে।

বসন্ত লাহিড়ী এক মামলাতেই আজ কোর্ট কাঁপিয়ে তুলেছে।

—ইওর অনার, আইনের রক্ষক যাঁরা—তাঁরাই যদি এমনি নির্মম পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের আয়োজন করতে পারেন, নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর ব্যবসা—সামাজিক সম্মান বিপন্ন করেন—তাঁদেরও যথাযথ শাস্তি হওয়া দরকার।

আসামীর নয়—ফরিয়াদীর পক্ষ থেকেই পাল্টা অভিযোগ তুলে চলেছে বসন্ত লাহিড়ী নিপুণভাবে।

প্রতিপক্ষ এই আক্রমণে পরাজিত—বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মিঃ পালিত খস খস করে রায় লিখে চলেছেন; জগবন্ধুর মুখে চোখে আশার আলো ফুটে ওঠে; কানাই কবরেজ সোজা হয়ে বসবার সামর্থ্য পেয়েছে; ওপাশে ভিড়ের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল শচীন; দারোগাবাবু হ্যাট খুলে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। কথাগুলো তীরের ফলার মত তার কানে বিঁধছে। উলটো হাওয়া বইছে—কে যে কোনদিকে উড়ে যাবে নিশানা নেই। অনিমেষের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আনন্দের আভায়। এ যেন তারই জিত।

হাকিমের এই হুকুমে সকলেই অবাক হয়ে যায়—এবার সুবর্ষা না হওয়ার জন্য দেশের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, সামনেই পরীক্ষা—তাছাড়া পানীয় জলেরও অত্যন্ত অভাব, নানাদিক ভেবে মহকুমা হাকিম অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে, কালীতলার মেলা বসবার অনুমতি তিনি দিতে অক্ষম।

সেই দিনই দুপুরে জগবন্ধু কবরেজের মামলার রায় বের হয়েছে—যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে তাঁহাকে আবগারী আইনে অভিযুক্ত করা গেল না, অতএব তাহাকে বেকসুর খালাস দেওয়া যাইতেছে।

...ছোট্ট সহর। অন্য কোন আকর্ষণ নেই। সিনেমা থিয়েটারের চলও তত হয় নি; সন্ধ্যা-সকাল একই তালে—মন্দাক্রান্তা গতিতে চলে ওর জীবনপ্রবাহ; ঢেউ জাগে না কোথাও; পরপর দুটো আদেশ কাজল গাঁয়ের শান্ত অলস জীবন যাত্রায় আলোড়ন তোলে। স্তিমিত ভাব কেটে যায়। বাজারে- অবনীহাটীর

দোকানে—রণজিতের চায়ের দোকানে, মটর আপিসে সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে এই একই কথার আলোচনা। দুটো পরিষ্কার দল গড়ে উঠেছে। একদল বলে,

—এ সাংঘাতিক অন্যায়, হাকিম হয়েছে বলে কি মাথা কেটে নেবে; এতদিনের মেলা বন্ধ! হাতে-নাতে ধরা পড়া আসামী বলে কিনা প্রমাণ কই? দিলাম খালাস।

অন্যদল বলে—বেশ করেছেন তিনি। একটা দুঁধে হাকিম। হরেরামবাবুর মেলা বসতো—তারপরই সুরু হতো সহরে কলেরা; তার চেয়ে বন্ধ করে ভালোই করেছেন। আর আসামী করে যাকে তাকে চালান দিলেই হলো? কবরেজী ওষুধ তৈরী করবার জন্য ট্যাক্স দিচ্ছে—তবু ধরে নিয়ে যাবে থানায়? হাকিম একেই বলে, আচ্ছাসে দারোগাবাবুকেই কড়কে দিয়েছে।

...শান্ত পুকুরের জলের দু'কোণে কে যেন ঢিল ছুঁড়েছে--দুটো তরঙ্গ উঠেছে, একটা গিয়ে পড়ছে অন্যটার উপর। মিঃ পালিতের দৃঢ়তার প্রশংসা না করে পারে না একদল। সহরের তারাই নিষ্কর্মা।

মদনবাবু ক্লাশে পড়াচ্ছিলেন, মহকুমা হাকিমের সংবাদটা পেঁীছে সেখানে। শুনে একটু খুসীই হন তিনি।...ক্লাস শেষ হতে মাষ্টারদেরঘরে ঢুকবার মুখে এসে থমকে দাঁড়ালেন; হেডপণ্ডিত গলা একটু তুলে বলে চলেছেন সামনের কয়েকজন ছেলেকে,

—তোরা এর প্রতিবাদ জানাবি বই কি। মায়ের পূজা বন্ধ করবে ওর মূলে তোমাদেরই হেডমাষ্টারমশায় আছেন—দরকার হয় এটাও প্রকাশ করতে ভুলোনা।

—আপনি বলবেন তো স্যার মিটিং এ?—ছেলেদের কে যেন বলে ওঠে।

হেডপণ্ডিত ঘাবড়ে যান—নারে বাপু, আমাকে আবার কেন। ছেলেছোকরারা করছিস্ সেই ভালো, পিছনে আমি আছি।

দু'একজন মাষ্টারও সায় দেয়—তা ঠিক কথা; এইতো বয়েস তোমাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে বই কি।

স্তম্ভিত হয়ে গেছেন মদনবাবু, তাঁরই স্কুলে তারই বুকের উপর বসে এমনি হীন ষড়যন্ত্র করতে পারবে এটা যেন কল্পনাই করতে পারেন না তিনি। আজ মনে পড়ে—বেশ কয়েক বৎসর আগেকার কথা ; নিজে অর্থ জমি ভিক্ষা করে খোসবাগ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। বড় স্কুল থেকে ছাত্র এসেছে—ছাত্র ভিড় জমিয়েছে তাঁর সুনামে। ওই হেডপণ্ডিত মশায়কে ডেকে এনে চাকরী দিয়েছিলেন ওঁর দুরবস্থা দেখে।

হঠাৎ হেডমাস্টার মশায়কে ঢুকতে দেখে ওরা সরে গেল ; অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে পণ্ডিতমশায়।

—কি হচ্ছিল কথাবার্তা ?

হেডপণ্ডিত বলে ওঠেন—আর বলেন কেন, পরীক্ষার ইমপর্টেণ্ট দাগ দিয়ে দিতে হবে। যতই পড়াই না কেন, পরীক্ষার আগে এ জুলুম করবেই।

অবাক হয়ে মদনবাবু ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন ; শিখাধারী ব্রাহ্মণ উত্তরী গায়ে দেন উত্তমাঙ্গে। কিন্তু তার মুখ থেকে এত সহজে এই নির্জলা মিথ্যা শুনে অবাক হয়ে যান। সারা মন ঘৃণায় ভরে ওঠে তাঁর। মানুষের উপর সমাজের উপর অপরিসীম ঘৃণা জমে উঠছে।

বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়ম বলে—ক্রমশঃ সমস্ত কিছুই জীবকোষ নিখুঁত ভাবে শোধরাতে থাকে, তাদের চরম লক্ষ্য 'পারফেকশান্' কিন্তু মানুষের সমাজ তার নৈতিক মানসিক প্রকৃতি ধীরে ধীরে যেন বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মকেও অগ্রাহ্য করতে বসেছে। নিখুঁত হবার দিকে গতি তার স্তব্ধ হয়ে গেছে। দিনে দিনে অন্ধ অতলেই তলিয়ে যাচ্ছে যে। এ সারা জাতির যেন মানসিক মৃত্যু। তার যৌবনে ও সমাজকে এমনি পঙ্গু হয়ে যেতে দেখেন নি।

—স্যার ?

ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন মদনবাবু, মণি ডাকছে। ফুটফুটে চেহারা দেহ-মনে অফুরান সম্পদ ওর। তাঁর প্রিয় ছাত্র। বাবা দাদা অগাধ পয়সার মালিক, কিন্তু নিজে সে অন্য ধাতুতে গড়া। জীবনে বিলাস ব্যসন নিয়ে মেতে নেই। অত্যন্ত মেধাবী।

…কবে এলে ?

সহরের কলেজে পড়ে, প্রণাম করে পায়ে হাত দিয়ে, সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে বলে,

—বড্ড গোলমাল শুনলাম, শুনেই আপনার খোঁজে বেরিয়েছি।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকেন মদনবাবু—গোলমাল? কোথায়?

মণি বলে ওঠে—চলুন বাড়ীতে গিয়ে বলবো। অনেক কথা আছে।

নীরবে পথ চলতে থাকেন মদনবাবু; সোনারোদমাখা পৃথিবী যেন আজ ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে উঠেছে তাঁর চোখে।

মদনবাবুর বাসায় মণির যাতায়াত অনেক দিন হতেই। স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে মণি। একদিন এমনি হঠাৎ ওঁর চোখে পড়ে যায়; তীক্ষ্ণধী ওই ছাত্রটি পরিষ্কার ভাবে তার প্রশ্নের জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, মনের অদম্য কৌতূহল প্রকাশ পায় ওর প্রশ্নে।

—ভলটেয়ার কে ছিলেন? বড় দার্শনিক না বিপ্লবী?

—ক্লাসের পর আমার অপিসে এসো তুমি।

সেই দিন থেকেই অপিস নয়, বাসায় তার অবারিত দ্বার। ম্যাসিনী, গ্যারিবল্ডী রুশো—ভলটেয়ার সবই পড়িয়েছিলেন ওকে। মার্কাস এরিলাসের কথাগুলো মণির মনে গেঁথে বসেছিল।

—I, a humble philosopher, have cherished the ambition never to give pain to another.

মণির তরুণ মনে কোথায় একটি স্বপ্নজগৎ গড়ে উঠেছে, সেই জগতের মধ্যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন ওই মদনবাবু; স্তিমিত সন্ধ্যার তারকালোকিত আকাশতলে—মধুগন্ধ বাতাসে বাতাসে ভেসে ওঠে কত স্মৃতি ওই একটি মানুষকে ঘিরে। ভলটেয়ারকে সেদিন বোঝে নি, আজ দর্শনশাস্ত্রে ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়ে এসেছে মণি; নিজেও অনুভব করেছে যুগ-যুগান্তের সত্যানুসন্ধি জ্ঞানীদের মহাজ্ঞানের কণামাত্র আলোকে ওই মানুষটির মন উজ্জ্বলভাস্বর।

ভলটেয়ারের কথাটা আজ আবার মনে পড়ে মণির।

—Let us detest these creatures who are eating away the heart of their mother, and let us honour those who are fighting against them.

মণির চোখে মাস্টারমশাই সেই তাঁদেরই একজন।

ছোট বাড়ীখানা, খড়ের ছাউনি ; সামনে একফালি জমিতে ফুটেছে রক্তকরবীর দল, রাস্তার ওপারেই প্রশস্ত পুকুরের বুক থেকে ভিজে বাতাস জায়গাটাকে স্নিগ্ধ মনোরম করে তুলেছে। বাখারির ছাউনি করা গেট একটু, তার উপর মাধবীলতার গাছটা ফুলভারে ঢেকে গেছে। ছবির মত মনোরম একটু আশ্রয়-কলকোলাহল নেই, একলা মানুষ, একটা চাকর রয়েছে, স্কুলেও সেই কাজ করে, ছুটির পর এসে ঘরকন্নার কাজ দেখে। একাধারে সেই সব।

—বস, হাতমুখ ধুয়ে আসি।

উঠোনে একটা শিশু বকুলের গাছ, নীচেটা চমৎকার বেদীমত করে নিকানো। ঝরঝরে তকতকে। এখানে ওখানে পড়ে আছে ঝরা বকুল দল। বাতাস তাদের সুবাসে আমন্থর।

হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলেন তিনি। চাকর এনে হাজির করেছে হুঁকো কলকে ; নিবিষ্টমনে তামাক টানতে থাকেন তিনি। মণি বলে ওঠে,

—স্কুলে কাল থেকে ধর্ম্মঘট হবে বোধ হয় ? ফটিকবাবুও নিজে উঠে পড়ে লেগেছেন। দু'একজন মাস্টারমশায়কেও দেখলাম তাঁদের ওদিকে, ছেলেদিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দল পাকাতে হবে তো ?

—হুঁ ! মদনবাবু নির্বিকার।

মণি বলে চলেছে—ওদের অভিযোগ আপনি নাকি ওদের বিশ্বাসে ধর্মে আঘাত দিয়েছেন পুজোর প্রতিবাদ করে।

—পুজোর প্রতিবাদ আমি করিনি। এ সময় মেলা বন্ধ থাক ব'লেছি আমি। ছুটিও হবে না স্কুলের। তা তারা যদি চায় স্কুল বন্ধ থাক—থাকবে।

মণি কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না—অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন ?

হাসেন মদনবাবু—দুঃখ হয় কি জানো, মাস্টাররা আজ দল বেঁধে ছাত্রের সংগে ধর্মঘট করতে বের হয়েছেন। দেখা যাক—যা হবার হবে। একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করেন,

—পরীক্ষা কেমন দিলে?

কথাটা বদলাতে চান তিনি। মণি ওঁর বিকারলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে থাকে। আরও অনেক হীন মন্তব্য সে শুনেছে মদনবাবুর সম্বন্ধে ওদের মুখে। সেগুলো বলতে নিজেরই লজ্জা আসে। ঘৃণা বোধ হয় তাদের জন্য, এমন একটি মানুষকে তারা চিনতে পারলো না।

সন্ধ্যা নেমে আসছে; বাঁশবনে নেমেছে রাত্রির তমসা; টিমটিমে মিউনিসি-প্যালিটির বাতিটা ওর দৈন্যদুরাবস্থার সাক্ষ্যই দিচ্ছে। চোংগা মেপে তেল দেওয়া হয়, রাত্রি ন'টার মধ্যেই অতল অন্ধকার গ্রাস করবে সবকিছু।

—আজ উঠি মাস্টারমশাই।

নীরবে বের হয়ে এল মণি, স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন মদনবাবু, শ্বেত শুভ্র দাড়ি গোঁফে জমেছে রাতের অন্ধকার। আপন মনে বসে কি ভাবছেন তিনি। সারা জীবন কাজ করে আজ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। ওদের উন্মাদ কলকোলাহল তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছে। আজ মন স্তব্ধ নির্জনতার গহনে ডুব দিতে চায়। এ যেন আপনাকে ফিরে পাওয়া; জীবনের প্রথম দিকে মানুষ কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়, মুক্ত করে দেয় তার সমস্ত মন—সব কর্মক্ষমতা। কিন্তু দিন আসে যখন মন আবার ফিরে পেতে চায় হারানো পথে প্রান্তরে বিলিয়ে দেওয়া নিজেকে। জীবনের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব খতিয়ে পৃথিবী থেকে চলে যাবার দিন গোণে। আজ তিনি যেন কোন এক অন্য জগতের যাত্রী, এখানের কোলাহল তাকে বেদনাই দেয়, জীবনে আর আশার মিথ্যা স্বপ্ন তিনি দেখেন না; আশাহত হবার বেদনাও তাঁর নেই। সোপেনহাওয়ারের কথাগুলো মনে পড়ে,

—The expression of completest knowledge, which is not directed to particular things, but has become quiter of all will.

আজ মন কামনামুক্ত। বড় হবার—দেশ-সমাজকে সেবা করবার কামনাও নিঃশেষ হয়ে গেছে তাঁর মনে। অমারাত্রির গহনে ধ্যানাবিষ্ট হয়ে বসে আছেন তিনি।

হরেরামবাবুর বাড়ীতে পরামর্শ সভা বসেছে। ভাগাড়ে গরু পড়লে শকুনি বহুদূর হতেই সন্ধান পায়; বাতাসে মিশে আছে তার ঘ্রাণশক্তি। শচীনও টের পেয়েছে আগামী গোলমালের কথা। সবে কোর্ট থেকে নাজেহাল হয়ে ফিরেছে। মামলা ফেঁসে যাবার পরই দারোগাবাবু তাকেই উলটে চাপ দেন।

—দেখুন দিকি মশাই, আপনার জন্য তো আমার এই গেরো। নইলে কে যেতো ও-সব ফ্যাসাদে ?

শচীন মুখে কিছু বলে না, মনে মনে ভাবে; টাকা কিছু পাওয়া যায় নাই, তাই এই আক্রোশ। কিছু মোটামুটি হাতে এলে তখন কি তিনি ছেড়ে দিতেন ?

নীরবেই দারোগাবাবুর খোঁচাটা হজম করেছিল, মনে মনে গজরান—এর শোধ নিতেই হবে। অন্তরালে কলকাঠি ঘুরিয়েছে অনিমেষ ডাক্তার আর সহরের নব্যপন্থী কয়েকজন। জগবন্ধুকে তারাই বাঁচিয়েছে। তার মুখেই এই ঘটনা; স্কুলের ধর্মঘট করানো দরকার। দুটো স্কুলেই ধর্মঘট করাবে, এ যেন হাকিমের হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

হরেরামবাবু খাজনার আয় বন্ধ হওয়াতে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তবু শচীনকে কেমন যেন বিশ্বাস করতে পারেন না; মনের ভাব চেপে রেখে বলেন—বেশ তো, লোকে যদি চায়, ছেলেরা যদি চায়—তবে তারা যা খুসী করতে পারে। আমি বাধা দেবার কে ?

শচীন রাতারাতি ছাত্রনেতা হয়ে উঠেছে। জনমতকে সমর্থন করবার জন্য সেই এগিয়ে এসেছে সহরের মধ্যে। ফটিকবাবু বলে,

—এর বিহিত হওয়ার প্রয়োজন, দরকার হলে আমরা মদনবাবুকেও কৈফিয়ৎ চাইবো। স্কুলের কমিটির অমতে তিনি কেন হাকিমের কাছে গেছেন এর জবাব চাই আমরা।

…ঘুমন্ত সহর জেগে উঠেছে। শচীন সকাল থেকেই বের হয়েছে, স্কুল বোর্ডিং, ছাত্রসভায় বক্তৃতা দিতে। পরনে তার খদ্দরের পাঞ্জাবী, মাথায় একটা গান্ধী-টুপি। মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো। বাজারে আসছে হাটুরের দল; তরকারির ঝুড়ি নামিয়ে মাথার গামছা দিয়ে হাওয়া করতে করতে দেখে ছেলেদের কাণ্ড। গেটের বাইরে ধ্বনি উঠছে—হেডমাষ্টারের জুলুম চলবে না।

কাছারীর ঘণ্টাধ্বনি ঠিকমতই হচ্ছে; মক্কেলের দল এসে ভিড় জমিয়েছে বট অশ্বথ গাছের ছায়ায়। চা-পান বিড়ির দোকানে বসেছে ওরা। ধান বেচা পয়সায় সাক্ষীর দল বেদম খাচ্চে রসগোল্লা পানতুয়া।

মদন মাষ্টার এসে অবাক হয়ে যান। ছাতা মাথায় দিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে আসছেন তিনি, স্কুলের গেটের কাছে আসতেই ছেলেদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়; ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তারা। মদনবাবুকে আসতে দেখে সরে দাঁড়ালো। শচীন, ফটিকবাবু দূরে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল, হঠাৎ ছেলেদের কলরব থেমে যেতেই বিস্মিত হয় তারা।

…মদনবাবু ফিরে দাঁড়িয়েছেন। সৌম্য শান্ত মুখে চোখে বিরক্তির চিহ্ন, রাগে ফুলে উঠেছেন তিনি।

—কি চাও তোমরা? কেন স্কুলে আসবে না?

ছেলের দল থমকে দাঁড়ালো। জবাব দেবার কিছুই নেই। পিছনে চেয়ে দেখে অসহায়ের মত। সেকেণ্ড মাষ্টার—হেডপণ্ডিত—শচীনবাবু কেউ নেই; ফটিকবাবু সকাল থেকে তাদের চা খাওয়াবে বলেছিল, সে পর্যন্ত উধাও। অথৈ জলে যেন পড়েছে তারা। এদিক ওদিক, এ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে নির্বাক নিস্পন্দ দৃষ্টিতে। তাড়া দেন হেডমাষ্টারমশাই।

—যদি বলবার কিছু থাকে ভিতরে এসে বলো। ওখানে হৈ হৈ করবে না, এসো।

বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ছেন মদনবাবু। ছেলের দল মাথা নীচু করে যে যার ক্লাসে ঢুকে গেল।

মদনবাবুও নীরবে নিজের অপিসে গিয়ে ঢুকলেন যেন কোথাও কিছু হয় নি। মাষ্টারদের অনেকেই এসেছেন—দেখা যায় হেডপণ্ডিত এবং থার্ডমাষ্টার

আসেন নি। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস স্কুল আজ হবে না, সুতরাং সকাল সকাল আহার সেরে দিবানিদ্রার আশ্রয় নিয়েছেন। মদনবাবুর কুঞ্চিত মুখ মুহূর্ত কয়েকের জন্য দৃঢ় হয়ে ওঠে, একখানা কাগজ টেনে নিয়ে কি লিখতে গিয়ে থেমে গেলেন।

ঘণ্টা বাজছে স্কুলে ; নীরবতার মাঝে উঠছে বহু কণ্ঠে গুন গুন শব্দ।

শচীন ফটিকবাবু চা পান সেরে ফিরে এসেই অবাক হয়ে যায়, কোথায় বা ছেলের দল, কোথায় বা তাদের সেই বিজয় উল্লাস। যে যার ক্লাসে ঢুকেছে, গেটের ধারে নিমগাছের ছায়ায় শুয়েছিল একটা কুকুর, ওদের দুজনকে দেখে বিরক্তিভরা কণ্ঠে একবার প্রতিবাদ করে আবার চুপ করলো।

—ওরা সব গেল কোথায় ? ফটিক যেন বিশ্বাসই করতে পারে না ব্যাপারটা। শচীন বেশ মুষড়ে পড়েছে, ছাত্রনেতা হতে গিয়েও পারলো না। তার একরাত্রির আয়োজন—পরিশ্রম মায় খদ্দরের পাঞ্জাবী খরচা করে নেতা সাজা—সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

হঠাৎ দেখা যায় স্কুল থেকে বের হয়ে আসছে মণি। ব্যাপারটা—ছেলেদের বিদ্রোহ এক মুহূর্তে জল হয়ে যাওয়ার কারণ সব বুঝতে পারে। ফটিককে দেখিয়ে বলে ওঠে,

—দেখছো ওই যে ঘরের ঢেঁকি কুমীর। মদন মাষ্টারের চ্যালারাই সব ভণ্ডুল করে দিলে। দালালী আর কাকে বলে ?

মণি এসেছিল যাতে কোন গণ্ডগোল না হয় তারই জন্য, তার আসবার আগেই স্কুল বসে গেছে। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে, গেটের কাছে যেতেই শচীনের কথাটা শুনতে পায় ; একটি মুহূর্ত, সারা শরীরে প্রবাহিত হয় চঞ্চল রক্তস্রোত। দালাল !···লোকটাকে কোনদিনই দেখতে পারে না মণি।

সহরের ধূমকেতু ওর সামনে পিছনে অশান্তি। সাপের মত ক্রূর, জানোয়ারের চেয়েও নীচ। বড়লোকদের আশেপাশে ঘোরে—তাদের দুর্বলতম কোণটুকুর

সন্ধান নেয়, ওদিকে তাতিয়ে তোলে দুষ্কর্ম করবার কাজে—নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য।

সেই শচীনের মুখে ওই মন্তব্য শুনে ওর তরুণ রক্তে মাতন ধরে ওঠে।

—কি বললেন? শচীনের সামনে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। শচীনও ভাবতে পারেনি কথাটা ও শুনতে পাবে, এবং এমনি মারমুখী হয়ে তার কাছে এসে কৈফিয়ৎ চাইবে। মনে হয় কৈফিয়ৎ নয়, প্রয়োজন হলে দু'চার ঘা বসিয়েও দিতে পারবে এইখানেই। ভয়ে কাঠ হয়ে ফটিকবাবুর দিকে চাইল। ফটিকও গোলমাল দেখে ওপাশে সরে গেছে। কি যেন ভেবে বলে ওঠে শচীন,

—আরে তুমি! কি বিপদ ওকথা তোমাকে বলতে যাবো কেন? ও-কাজ কি তুমি কর? দেখ দিকি কি শুনতে কি শুনে এই কাণ্ড!

ওর জবাবে মণি ঠিক শান্ত হতে পারে না, জানে ওরা ভীরু; স্বীকার করবার সৎসাহস ওর কোনদিনই নেই। মিথ্যা কথা বলা ওর স্বভাব, আজও বলছে। শাসিয়ে দেয়,

—কি বলছিলেন কার উদ্দেশ্যে ঠিকই শুনেছি। ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে চলবেন।

আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল সে। শচীন একটু নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে গজরাতে থাকে—ভারি দেমাক হয়েছে বাপ-দাদার খুঁটির জোরে।

...মনের রাগ মনে মনেই থাকে। ফটিকবাবুর কোন পাত্তা নেই। সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে এর পর আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সহরের লোকের সামনে অপদস্থ হতে চায় না। শচীন একাই গজরাতে থাকে,

—একেই বলে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া।

...একাই সহরের দিকে এগিয়ে চলে, বেলা হয়ে গেছে অনেক। মন বিষিয়ে ওঠে শচীনের, সবদিকে যেন ফেঁসে যাচ্ছে সব কিছু। কোথাও ঠিকমত দাঁত ফোটাতে পারছে না, নিজেদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য মানুষ সদাই জাগ্রত, সেখানে বাইরে হতে গিয়ে তার চিরাচরিত গতিকে উল্টে দেওয়া অত্যন্ত শক্ত কাজ। একা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

হঠাৎ মনে কোন চিন্তা খেলে যায় ; পৃথিবী সমাজের গতি বদলাচ্ছে ; যে এই পরিবর্তনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারে—একদিন কূল তার মিলবেই। ব্যক্তিগত খেয়াল খুসীমত কাজ করে বাধা দেওয়া শক্ত, সর্বনাশ করতে গেলে, নিজের প্রতিষ্ঠা আনতে গেলে অন্যপথে চলতে হবে তাকে গতানুগতিক পথ ছেড়ে দিয়ে।

যমুনার কুঞ্জে সেরাত্রে ফটিকবাবু আবার গেছে, অন্ধকারের আবরণে কি এক রহস্যময় হয়ে উঠেছে নদীতীরের আখড়া ; ফটিকের দু'পা টলছে। চোখদুটো টকটকে লাল ; শীর্ণ প্যাকাটির মত দেহখানা—জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে পায়ে। জড়িত কণ্ঠে হাঁক পাড়ে—এ্যাই। এ্যাই রাধারাণী।

এ যেন নবকেষ্টের আগমন ;···যমুনা ফটিককে দেখেছে অনেক আগে হতেই ; এমনি করে মদ খেয়ে কুসংসর্গে মিশে একেবারে অধঃপাতে গেছে জমিদারদের অনেক বংশধর।

আজ সেই ফটিককে এমনি জড়িত কণ্ঠে—স্খলিত পদক্ষেপে রাত্রি গভীরে আসতে দেখে নিজেরই অনুকম্পা হয় ওর উপর। মা নেই—অনেকদিন আগেই মারা গেছেন—আজ তাই বোধ হয় উদ্দাম বেপরোয়া।

নীচে নেমে এল দাওয়া থেকে, ফটিক বলে ওঠে,

—কে-গো রাধারাণী নাকি ? কি রকমসকম বাওয়া ? ধূপ নেই – ধুনো নেই এ কোন্ দেশী কুঞ্জ ; নামগানও করো যা'হোক ছাই কন্নে যাক এতটুকুন।

···কি ভেবে ওকে চাতালে শুইয়ে দিয়ে মাথায় জল ঢেলে বাতাস করতে থাকে যমুনা। আপনমনেই বকে চলেছে ফটিক। শচীন তাকে কতবার ঠকিয়েছে—গঙ্গামণির ওখানে কত দিয়েছে ; সে কি রকম মান খাতির করে তারই ফিরস্তি দিতে থাকে। গঙ্গামণি ! নামটা শুনে চমকে ওঠে যমুনা ; এ সহরের মেয়েদের কাছে ও একটা স্মরণীয় নাম। কুখ্যাত গঙ্গামণি—

ফটিক এতদূর অধঃপাতে গেছে ভাবতেও পারেনি। বিরক্তিভরাকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে যমুনা—চুপ করে শুয়ে থাকবে না বের করে দিয়ে আসবো বাইরে।

—বেশ বাওয়া। ঝিরি ঝিরি খাসা হাওয়া বইছে—ঘুমাবো এবার।

...রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। নদীতীরের স্তব্ধনির্জনতায় রাতের বাতাস হু হু স্বরে আক্রমণ হেনেছে; শিউরে ওঠে রাতের জাগর তারাগুলো; চমকে ওঠে ভীত কলরবে কোথায় রাতজাগা পাখী;...আবার নেমে আসে আদি অন্তহীন স্তব্ধতা। যমুনা একা বসে আছে - ফটিক ঘুমিয়ে পড়েছে; অসাড় হয়ে পড়ে আছে সে; নিঃসঙ্গ যমুনা। জীবনের পথে পথে আজ একাই ভেসে বেড়িয়েছে; ক্রমশঃ এই যাযাবর জীবনের মানে খুঁজে পাচ্ছে আজ। শূন্য কলস ভরে নিতে যায় ঘাটে ঘাটে; শূন্যজীবনও পূর্ণ করে নিতে চলেছে সে মানুষের জগতে; পরশমণির ছোঁয়া পেলেই তবেই হৃদয় সোনা হবে, কিন্তু কোথা সেই পরশপাথর; দুনিয়ায় নুড়ি খুঁজে খুঁজেই দিন কেটে গেল তার।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চমকে উঠল। পিছু ফিরে তারার ঝিকিমিকি আলোয় দেখতে পায় নিতাই বাবাজীকে—নীরবে সে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। একটু অবাক হয় যমুনা, ও যেন আঁধারের আড়াল হতে তার প্রতিটি নড়াচড়া —চালচলন লক্ষ্য করছিল, ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়। এগিয়ে গেল যমুনা।

—কি করছো গোসাই?

...ঘুম আসছে না, ভাবলাম বাইরের হাওয়ায় যাই। নিতাই আর কথা বললো না, নীরবে চেয়ে থাকে চাতালের উপর ঘুমে অচেতন দেহটার দিকে। আবছা আলোয় চিনতে পারে—ফটিকবাবু না?

—হ্যাঁ, মদ খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিল এইখানে।

হুঁ—কথা বলে না নিতাই। চুপ করে গেল, এই ভাবান্তর নজর এড়ায় না যমুনার। একটু হাসিও আসে—দুঃখ হয়।

নেশা ছুটে গেছে ফটিকের, উঠে বসে দেখতে থাকে চারদিক। সকালের গিনিগলারোদ পড়েছে আশ্রমের বুকে; চারপাশে আম জাম কাঁঠাল গাছের প্রহরা ঘেরা; সকালের রোদে কোথায় ডাকছে নাম-না-জানা পাখীর দল। সহরের শেষপ্রান্তে ওদিকে নদীর কাককালো জলধারা বয়ে চলেছে; নদীর তীরে মাথা তুলে রয়েছে বিন্না কাশ ঘাসের বন, বাতাস বয়ে চলেছে শোঁ শোঁ শব্দে। মানুষের কোলাহল নেই; স্তব্ধ প্রশান্তি ঘেরা জগৎ; স্বয়ং সম্পূর্ণ—শান্তিময়।

শরীরের ক্লান্তি তখনও যায় নি। আড়িমুড়ি ছেড়ে উঠে বসছে, সারা দেহমনে তখনও রয়েছে জড়তা; গতরাত্রির অভিসারের কথা মনে পড়ে, গঙ্গামণির ওখানে কি এক দুর্বার কামনার জোয়ার বয়ে গেছে। এখানের বাতাসে তার স্পর্শটুকুও নেই।

—হঠাৎ যমুনাকে আসতে দেখে ফিরে চাইল। নদী থেকে সদ্য স্নান সেরে ফিরছে; ভিজে চুল লুটিয়ে পড়েছে কোমর অবধি; চুল—এতবড় চুল কখনও দেখেনি। যমুনার মা বলতো—এতবড় চুল ভালো নয় লো, জীবনে শান্তি পাবি না কোনদিন। তার উপর কাঁচা সোনার মত বন্নো।

মায়ের কথাটা সত্যি। জীবনে শান্তির সন্ধানই করে চলেছে সে; কিন্তু ভিজে কাপড়খানা গায়ে বসে গেছে, কাঁকালে একটা জলভরা কলসী, পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে কল কল করে উঠছে। ফটিক অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

—ঘুম ভাঙলো?

—হুঁ!

—বাড়ী যেতে হবে না?

ফটিক বলে ওঠে—উঁহুঁ, এইখানেই পড়ে থাকতে ইচ্ছা করছে।

হেসে ফেলে যমুনা—লক্ষণ ভালো নয় গো—ভাল মানুষের ছেলে। ওঠো।

যেন জোর করেই ওকে পাঠিয়ে দিতে চায় এখান থেকে। নিতাই ভোর-বেলায় উঠে স্নানাদি সেরে নগর কীর্তনে বের হয়েছে। একা এই আশ্রমে ওকে দেখে কেমন যেন ভয়ই লাগে যমুনার।

রাত্রির সেই অসহায় ছেলেটি ও আর নয়, দিনের আলোয় জেগে উঠেছে ওর সুপ্ত মানুষটি, যাকে দূরে দূরেই এড়িয়ে চলতে চায় যমুনা।

...জয় রাধে!...

ডাক শুনে একটু চমকে ওঠে যমুনা; মাঝে মাঝে প্রাতঃভ্রমণ করতে এইদিকে আসেন মাধববাবু; রোজই ভোরে উঠে বেড়াতে বের হন; কোনদিন বা দুইলের কালীবাড়ীর দিকে, কোনদিন বা কানা ময়ূরাক্ষীর তীর ধরে এই আশ্রমের ছায়াঘন বাগানেও আসেন। ফটিক তখনও বসে রয়েছে চাতালে ঘুমের রেশ

যায় নি, জামা-কাপড়ও আধময়লা হয়ে গেছে। কি যেন অকথ্য-অত্যাচারের ছাপ আঁকা রয়েছে ওর দেহমনে—এই পরিবেশে অত্যন্ত বেমানান।

মাধববাবু অংগনে গা দিয়েই ফটিককে ওই অবস্থায় এখানে দেখে একটু অবাক হন। ফটিকও অবাক হয়ে গেছে। একুঞ্জে কে না আসে! যমুনা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়– আসুন বাবা।

—এই এলাম।…নিতাই কোথায় রে?

কথা বলছে যমুনার উদ্দেশে, কিন্তু দুচোখ চেয়ে রয়েছে ফটিকের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে। বাতাসে মাধবীফুলের গন্ধ ছাপিয়ে ওর গায়ের জঘন্য দুর্গন্ধ ফুটে উঠেছে।

—এখানে যে?

ফটিক জবাব দেবার আগেই যমুনা বলে ওঠে,

কালরাত্রে পথ ভুল করে এসে পড়েছিল, দেখুন না শরীরের হাল। বন্ধু-বান্ধবরা সরে পড়েছে, উনি গিয়ে পড়তেন নদীর দহে।

—হুঁ। মাধববাবু কথাটা আনমনে শুনছেন। যমুনার দিকে চেয়ে থাকেন, ওর সহজ সরল হাসিমাখা কণ্ঠে কোথাও যেন জড়তার—কুণ্ঠার কোন স্পর্শ নেই। মাধববাবু ব্যাপারটাকে ঠিক ভালো চোখে দেখেন না; গংগামণির বড় খদ্দের ওই ফটিক। মাসে বেশ কিছু টাকা ওখানে দিয়ে আসে—তার মোটা অংশই গোপনরন্ধ্রপথে এসে মাধববাবুর সিন্দুকে ঢোকে,…শাঁসালো খদ্দের যদি চলে যায়—তাহলে লোকসান তাঁরও কম নয়। যমুনা দাওয়াতে একখানা আসন পেতে দিয়েছে।

—বসুন বাবা।

—না, আজ কাজ আছে চলি। মাধববাবু গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেলেন; নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে যমুনা; বেশ বুঝতে পারে এরপর কি হবে। যমুনার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে ওই ফটিকের উপরই। অকারণে উড়ে এসে সেইই এই গণ্ডগোল বাধিয়েছে। ঝাঁঝিয়ে ওঠে যমুনা,

—এখনও ওইখানেই বসে থাকবে, যেতে হবে না?

উঠে দাঁড়ালো ফটিক; যমুনা তখনও গজগজ করে চলেছে।

—দয়া করে আর মুখপোড়াতে এসো না আমার। যা করছো—বাইরে বাইরেই করো, আমার এখানে এসো না, বুঝলে?

ফটিক এখনও কিছুটা বুঝতে পারে; ফোড়ন কাটে—মাধব উকিল কি কুঞ্জে আসেন?

—বেরুবে সোজা কথায়, না আরো কিছুর দরকার হবে? যমুনা রুখে দাঁড়িয়েছে। হাসতে হাসতে ফটিক বের হয়ে এলো আশ্রম হতে।

ফণী চক্রবর্তী ছেলের ব্যাপার-স্যাপার দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছে; দিনরাত ব্যবসা নিয়ে মেতে রয়েছে। গাড়ীর পর গাড়ীর সংখ্যা বাড়ছে। রক্ত নেশায় বাঘ যেমন উন্মত্ত হয়ে ওঠে—ফণীবাবুও পয়সার নেশায় পাগল হবার উপক্রম হয়েছে। মনে মনে আরও কি যেন ফন্দী খেলে যায়, চোখের উপর দিব্যি দেখতে পায় মোটর কোম্পানীর ভবিষ্যৎ। লোভী মন সরীসৃপের মত প্যাক দিয়ে ওঠে অন্তরে অন্তরে।

বড় ছেলে ননীও যেন সেই স্বাদ থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। বাবার যোগ্যপুত্র; ধান-চাল-কলাই এ অঞ্চলের সব ফসল প্রায়ই একাই কিনতে সুরু করেছে সে।...নদীর ধারে বড় বড় টিনের শেড তুলে আড়ত তৈরী হয়েছে। ...কাজল গাঁ মহকুমার মধ্যে রাখি কারবার তার ফলাও হয়ে উঠেছে।

বাড়ীর সংসারের ভার দূরসম্পর্কের এক পিসীমার উপর; ননীর স্ত্রীর বয়স বিশেষ কিছুই নয়; তবুও সে তীক্ষ্নবুদ্ধি দিয়ে পয়সা কি করে রাখতে হয় সেইটাই জেনেছে। যে যার তালে ব্যস্ত। মণি বাড়ীতে আসে খায়-দায় আর বেশীর ভাগ সময় পড়াশোনা করে—না হয় বন্ধু-বান্ধবদের সংগে তর্ক করে লাইব্রেরীতে, রোজ সন্ধ্যায় মদনবাবুর ওখানে যাওয়াটা তার দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

সেদিন ফণীবাবুর ডাকে নীচে নেমে এল। কয়েক দিন থেকে ফণীবাবু শুনেছে কথাটা। মটর অফিসের বারান্দায় সহরের যাত্রীরা ভিড় করে—সমস্ত

হালফিল খবরের আলোচনাও হয় সেখানে। তাদের মুখেও শুনেছে—সেদিন শচীনও উপযাচক হয়ে এসে কথাটা জানায়,

—কাকাবাবু, আপনার বংশের ছেলে যার তার সংগে মিশছে, হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে, এটা কি ভালো ? পুলিশের খাতায় নামও উঠেছে বোধ হয়।

—মানে ? ফণীবাবু কথাটা শুনে চমকে ওঠে। পুলিশের খাতায় এযাবৎ নাম যাদের উঠেছে তারা দাগী চোর—না হয় ঘুঘু বদমাইস। বর্তমানে পুলিশের যে নোতুন খাতায়—নোতুন আসামীদের নাম উঠেছে গোপনে তার সন্ধান সে রাখে না। তাই ও-কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলো। ওর মুখচোখের পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে শচীন, বলে ওঠে—স্বদেশী হয়ে উঠছে যে।

ফণীবাবুর সামনে যেন ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে বিষধর এক সাপ, যে কোন মুহূর্তে তাকে ছোবল মারবে, জর্জরিত করে দেবে সারা দেহ তীব্র মৃত্যুনীল বিষে।

—কে বললে ?

—শুনেছি বলেই জানাতে এলাম আপনাকে। পুলিশের হুকুম জানেন তো ; দরকার হলে বাপ দাদার বিষয় সম্পত্তি ধরেও টানাটানি সুরু করবে।

কথাটা শুনে সারাদেহ ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নিজেকে ধরে টানাটানি করতে দিতেও রাজী ছিল ফণীবাবু, কিন্তু বিন্দু বিন্দু রক্ত জলকরা পরিশ্রমে গড়ে তোলা ওই অর্থভাণ্ডারে হাত পড়বার কল্পনাও করতে শিউরে ওঠে।

নীরবে কি যেন ভাবছে ফণীবাবু, স্ত্রী নেই। নিশ্চিন্ত হয়েছে সে, নইলে ওই ছেলের জন্য শেষ জীবনে অশেষ দুঃখ পেতে হতো। আজ মনে হয় মণি সারাদিন যেন অন্যকাজে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে—সেই কাজটা কি এখন টের পেয়েছে।

রাগে জ্বলতে থাকে দেহমন, বাড়ীতে পা দিয়েই আর এক চোট হয়ে যায় বোন-বৌমার উদ্দেশে। পুকুর থেকে মাছ ধরা হয়েছে ; হুকুম আছে বড় মাছ বা ভাল পোনামাছ সব বাজারে চলে যাবে বিক্রীর জন্য। ভালো দর পাওয়া যায়, বাড়ীতে থাকবে ছোট চারা মাছ বা কুচো পোনা। আজ তার ব্যতিক্রম ঘটেছে,

একটা সেরপাঁচেক টকটকে তাজা রুই মাছ উঠোনে ধড়্ফড়্ করছে; দেখেই আঁৎকে ওঠে ফণীবাবু।

—মাছ এখানে কেন?

বৌমাই জবাব দেয়—ঠাকুরপো দু'একজন কাকে নেমতন্ন করেছে রাত্রে, তাই রেখে দিয়েছে।

—কোথায় সে?

হাড়্পিত্তি জ্বলে ওঠে এই অপচয়ে। সবদিক থেকে জ্বালিয়ে খেলে ও। বাবার হাঁকডাকে নেমে এল মণি।

—ঘরে এসো। ছেলেকে হুকুম করে।

···সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলছে ফণীবাবুর। যাত্রীদের মুখে সেই আলোচনা, শচীনের কথাগুলো ঘুরপাক খায়। ছেলের এই বেয়াড়াপনা কোনরকমেই সহ্য করবে না।

—মাছ কি হবে?

কয়েকজন বন্ধু নেমতন্ন করেছি, ডাক্তারবাবুও আসবেন?

—ছোকরা ডাক্তার আর বুড়ো মাষ্টার এরাই তোমার বন্ধু? ব্যঙ্গ করে ওঠে ফণীবাবু।

বাবা!···কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল মণি।

—শাসাচ্ছ আমাকে? তোমার চোখরাঙ্গানিকে আমি ভয় করি না। সোজা কথা বলে দিচ্ছি, নিজে রোজকার করবে তবেই বন্ধুবান্ধবকে ডেকো, আমি ওসব সহ্য করবো না।

মণি কথাটা নীরবে শোনে, বাবার কথার কোন জবাব দিল না।

ফণীবাবু গজরাতে থাকে—বসে বসে খাওয়াতে পারবো না; লেখাপড়া শিখিয়েছি, ব্যবসাদার লোক—টাকা ঢেলেছি তার উশুল চাই।

মণি জবাব দেয়—টাকা ঢালতে আমি বলিনি।

ফণীবাবু তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে—খুব কথা শিখেছো দেখছি; যত সব অকর্মাদের সঙ্গে আড্ডা হয়েছে; শিখবেই তো।

মণি কথার জবাব না দিয়ে বের হয়ে এলো, ফণীবাবু অবাক হয়ে বসে থাকে;

মাথা নীচু করে অপরাধ স্বীকার করা দূরে থাকুক—গোঁ ধরে বের হয়ে গেল ; আপন মনেই বকতে থাকে।

খুড়তুতো বোন এসে তাগাদা দেয়—বেলা যে অনেক হোল ?

—হোক! ওই হতচ্ছাড়া খেতে এলে বলে দিবি—এ বাড়ীতে ঠাঁই হবে না।

—কে ?

—ওই মনে।

—ওঃ! বোনও ছাড়বার পাত্রী নয়, জবাব দেয়—একটা ছেলে তাকেও বসিয়ে খেতে দিতে গায়ে বাজছে। এসব কাদের জন্য করছো বলতো ? ওদের কি সাধ-আহ্লাদ নেই, বাছা কাদিকে যেন খেতে বলবে—বলছিল।

এতক্ষণে অর্থটা আরও পরিষ্কার হয় ফণীবাবুর সামনে, বলে ওঠে,

—তোমাদের আস্কারা না থাকলে, ওর এতবড় বুকের পাটা হবে কোত্থেকে ? সোজা কথা বলে দিচ্ছি—ওসব আমি বেঁচে থাকতে চলবে না।

কাদম্বরী আর কথা বাড়ালো না, যাবার সময় কথাটা মনে করিয়ে দেয়—নেয়ে খেয়ে নিয়ে আমাকে রেহাই দাও, তোমার তিনবেলা হেঁসেল ঠাংগাতে আমি পারবো না। দরকার হয়--রাঁধুনী দেখ।

অর্থাৎ খরচ বাড়াতে হবে ; এর পর আর কথা বাড়াতে রাজী নয় ফণীবাবু, নীরবে উঠে পড়লো।

রমণবাবু আজ সদরেই রয়ে গেছেন, বাড়ী ফেরেন নি। সরমা দুপুরে খেয়ে-দেয়ে ঘুম দিচ্ছে ; বামুন মেয়ে আর খুকীর মা কাজে ব্যস্ত ; এমন সময় মঞ্জু মণিকে আসতে দেখে অবাক হয় একটু। চোখমুখ উস্কোখুস্কো ; মাথার চুলগুলো বিশৃংখল ; নাওয়া-খাওয়াও হয় নি। মঞ্জু পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল বাইরের ঘরে—ওকে চিন্তিত মনে ঢুকতে দেখে চেয়ে থাকে ওর দিকে। মণি ওকে এখানে দেখবে কল্পনা করতে পারেনি। মণি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসবে—ওর ডাকে দাঁড়ালো।

—এসেই চলে যাচ্ছেন যে ?

—কাকাবাবু নেই ?

—না, তিনি সদরে গেছেন।

আরও যেন কি বলবার ছিল—কথাটা না বলেই বের হয়ে আসছে, মঞ্জু চেয়ার ছেড়ে এসে দাঁড়ালো তার কাছে।

—ব্যাপার কি বলোতো?

ওর চিন্তিত মুখে কি এক নিবিড় বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে তা মঞ্জুর নজর এড়ালো না; ওর কণ্ঠে ফুটে ওঠে বিষাদের সুরে কেমন একটা চাপা উৎকণ্ঠা।

—বাবা পথ দেখতে বলেছেন; রোজকার করো না হয় পথ দেখো, বাড়ীতে ঠাঁই হবে না!

মঞ্জু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে; সহরের মধ্যে নামকরা বড়লোক ফণীবাবু; ছেলের সঙ্গে তার এই ব্যবহার; মা নেই, মণির মা থাকলে আজ বোধ হয় এমনি ভাবে কষ্ট পেতে হতো না তাকে।

—সত্যি? মঞ্জুর কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

—সত্যি। ভাবছি অন্য কোথাও চলে যাবো,যদি চাকরী-বাকরী জোটে একটা।

দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে ওর। মঞ্জু চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

—কাকাবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার।

—বৈকালে ফিরবেন তিনি।

বের হয়ে যাবার আগেই মঞ্জু একটু ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে ওঠে,

—সাধে কি আর বাড়ীতে তোমার ঠাঁই হয় না, বেহেড একেবারে।

একটু অবাক হয়ে যায় মণি—কেন? কি করলাম আবার?

—কি আর করবে? কেন খাবার সময় এমনি করে চলে যেতে হয়? নাওয়া-খাওয়া করো; তারপর যা হয় মাথা ঠাণ্ডা করে ভাববে। হুট্ করে কোন কাজ করে বসো না।

মণি কথা বলে না, নীরবে ওর কথাগুলো শুনে চলেছে। মঞ্জু যেন বুদ্ধিমতীর মতই কথা বলছে।

দুপুরটা কাটলো ওইখানেই; সরমা এসে একবার ওর খাবার সময় দাঁড়িয়ে থাকলো মাত্র।

—দেখে-শুনে খাওয়া মঞ্জু, আমি একটু গড়িয়ে নিই, মাথাটা ধরবে বলে মনে হচ্ছে।

ক্লান্ত মধ্যাহ্ন, জনহীন হয়ে গেছে পথ, জানলা থেকে দূরে দেখা যায় শ্যামল বেণুবন সীমা ; চৈতন্যসাগরের উঁচু পাড় ছেয়ে জামগাছগুলোয় এসেছে কচি-সবুজ পাতার সাজ ; মণি নীরবে খাটের উপর বসে আছে। ওদিকে একটা টুলে বসে মঞ্জু।

—ঝগড়াটা তুমিই করেছো ? যা ঝগড়াটে তুমি।

—উঁহুঁ, বাবাই ডেকে নিয়ে গিয়ে একতরফা রায়টা শোনালেন। ভালোই হল। দেখি কোথায় গিয়ে জুটতে পারি।

…মঞ্জুর মন কেমন করে ; সুদূরে কোথায় হারিয়ে যাবে সে।

—তোমার বাবা হঠাৎ বলে ফেলেছেন।

—হঠাৎ নয় মঞ্জু। বাবা আমার কাজকর্মগুলো সহ্য করতে পারছেন না।

…মঞ্জু কেমন শিউরে ওঠে ওই ডাকে ; আজ মণিও যেন কেমন নির্ভর খুঁজে পায় মঞ্জুর মধ্যে ; নইলে এত লোক থাকতে, তাকেই বা মনে পড়লো কেন ? মঞ্জু বলে ওঠে,

—তাহলে ওসব করো কেন ? স্বদেশী করবার জন্য আলাদা লোক আছে।

কেন করি তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না মঞ্জু, মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আলাপ হোলে বুঝতে—এ আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

…মঞ্জু যেন কথাটা মেনে নিতে পারে না। যারা ওসব করে তারা অন্যধাতের মানুষ, ঘর-সংসার বাবা-মা কিছুই তাদের বাঁধতে পারে না। মণিও কি তাদেরই একজন ! ওর যাযাবর মনে কারোও ক্ষণিক প্রীতি ভালবাসার চিহ্নও কি রেখাপাত করে না ! যাকে ধরা যায় না—যে স্পর্শের বাইরে—তাকে পাবার স্বপ্নরচনা করে মন ; দুঃখ পাবার জন্যই এগিয়ে আসে—মন যেন মুগ্ধপতঙ্গ—অগ্নিশিখার দীপ্তিতে আত্মবলি দেবার জন্যই তার জন্ম।

বলে ওঠে মণি—আর যে কেউ নিষেধ করুক মঞ্জু, তুমি লেখাপড়া শিখছো ; বিদ্যাবুদ্ধি সাধারণের চেয়ে বেশী আছে—তুমি বাধা দিও না। তোমাকে বোঝাতে পারা কঠিন হবে।

অভিমান ভরে বলে ওঠে মঞ্জু—আমাকে বোঝানোর দরকারই বা কি আছে ?

—কার যে কোথায় দরকার—তাকি ছাই মানুষ জানে! মণি কথাটা বলে বসে।

মঞ্জু জবাব দিল না, চেয়ে থাকে ওর দিকে।

—এ দরকারের কানাকড়ি দামও দেবে না তুমি। মঞ্জুর অভিমান তখনও যায় নি।

…শান্তস্তিমিত আকাশ নিথর হয়ে আসে, কাজল গাঁয়ের জীবনযাত্রাও তেমনি মন্থর হয়ে এসেছিল কিছুদিন, ওরা খায়-দায় আর পরচর্চা করে। শচীন নীরবে কাজ করে চলেছে। ঈশান কোণে পুঞ্জীভূত মেঘের সাড়া সে আগে হতেই পেয়েছিল—তার জন্য প্রস্তুত হয়ে চলেছে গোপনে গোপনে।

ভোর বেলাতেই দরজার কড়ানাড়ার শব্দে চাকর দরজা খুলে দিয়েই চমকে ওঠে।…ধড়াচূড়া পরা পুলিশ বাহিনী সঙ্গে থানার দারোগা। বাক্যব্যয় না করে তারা বাড়ীর চারপাশ ঘিরে ফেলে; ওদের বুটের শব্দ—টর্চের আলোকে ধড়মড় করে উঠে পড়ে ফণীবাবু। সারা শরীরে শিহরণ খেলে যায়—ডাকাত নাকি!

…সামনে দারোগাবাবুকে দেখে চমকে ওঠে।

—মণিবাবু আছেন ?

…অজানা আতঙ্কে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে ফণীবাবুর; মণিও নেমে এসেছে নীচে।

—কাকে চান ?

দারোগাবাবু এগিয়ে এসে বলেন—আপনাকে থানায় যেতে হবে।

…মণি একটু বিস্মিত হয়ে যায়; সহরের মধ্যে তাকেই আজ প্রথম এ্যারেস্ট করা হোল দেশদ্রোহিতার অভিযোগে। ফণীবাবু কাঁপছে, কাল পর্য্যন্ত যাকে বাড়ী থেকে দূর হয়ে যেতে বলেছে—আজ বাইরের ডাক এসেছে তার কাছে, তবু

বাবার অন্তঃকরণ কেঁদে ওঠে অজানা আতংকে। মণি একদিকে চুপ করে এসে দাঁড়িয়েছে।···কথাটা বলে ফণীবাবু,

—কোন উপায় নেই ?

দারোগা মাথা নাড়েন, মণি এগিয়ে আসে, পরিষ্কার কণ্ঠে বলে ওঠে, চলুন দারোগাবাবু, আমি তৈরী।

বাবার সামনে দিয়ে বের হয়ে এল মণি পথে ওদের সংগে।

ফণীবাবু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে—মিথ্যাই ওকে চলে যেতে বলেছিল কাল—না বললেও সে যেতো।

সহরের ঘুম তখনও ভাঙ্গেনি। গ্রীষ্মের দিন। মর্ণিং স্কুল সবে বসেছে। ঘন বট অশথ গাছের মাথায় জেগেছে রক্তরৌদ্র।

···মদনবাবু অফিসে কাজ করছেন ; হঠাৎ কয়েকজন পুলিশ সমেত দারোগা-বাবুকে আসতে দেখে একটু অবাক হয়ে যান।

—স্কুলের দুজন ছাত্রকে এ্যারেস্ট করতে চাই।

কোন কথার জবাব দেবার আগেই মদনবাবু উঠে দাঁড়ালেন, তার স্কুলে তার বিনা অনুমতিতে ঢুকে এই জুলুম চালাবার অধিকার তাদের নেই ; সমস্ত মন প্রতিবাদ করে ওঠে এই অবিচারের। তিনি এ কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। ছেলেরা ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। মাষ্টাররা জটলা পাকাচ্ছে হলঘরে, দুজন কনষ্টেবল দুটি ছেলের হাতধরে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। দারোগাবাবু থমকে দাঁড়ালেন মদনবাবুর ডাকে।

—দাঁড়ান !

দারোগাবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন—আমরা সরকারের হুকুমে এসেছি।

—এটা সরকারের জায়গা নয় ; দয়া করে বের হয়ে যান। আপনার আসামী এখান হতে বের হয়ে গেলে—পথে তাকে এ্যারেস্ট করতে পারেন। কিছুই বলবার থাকবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢুকে—ওই হুকুম তামিল করতে হবে এমন কোন কথা নেই।

দারোগাবাবু বাধা পেয়ে চমকে ওঠেন। কনষ্টেবলদের সামনে তাঁকে এমনি করে অপদস্থ হতে হবে তা যেন সহ্য করতে পারেন না। বলে ওঠেন তিনি,

—এরি ফল ক তা জানেন ?

—সব দায়িত্ব নিজে নিয়েই ওকথা বলছি। যান আপনারা।

…কাজটা অন্যায় করেছেন দারোগাবাবু; কয়েকজন কনস্টেবলকে বাইরে পাহারায় বসিয়ে নিজেই এগিয়ে যান এস-ডি-ও সাহেবের বাংলোর দিকে, কথাটা তাঁকে জানানো দরকার। হাত থেকে আসামীকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে—এ অপমান দুঁধে দারোগা বিশ্বম্ভর রায় ভুলতে পারেন না।

…পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে; ক্লাসে ছেলেরা মুখ বুজে বসে আছে, ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে তাদের মুখ; মাস্টারদের দু'চারজন আড়ালে বলাবলি করে—ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতে আছে ? নে বোঝ ঠ্যালা। নিতে এসেছিল—ছেড়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যেত, তা নয় গেলেন আইন দেখাতে।

মদনবাবু অফিসঘরে পায়চারী করছেন উত্তেজিত ভাবে। আজ সামনে তার একটা পথ খোলা, হয় মাথা নীচু করে সব অন্যায়কে মেনে নিতে হবে, নয় তো প্রতিবাদ করতে হবে; ওদের সমস্ত অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে হবে। সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠবে সারা দেশে; তিরিশ বছর সাধনা করে এসেছেন—গড়ে এসেছেন নিজের আদর্শকে, সেই আদর্শের জন্য দরকার হয় আরও চরম কষ্ট তিনি মেনে নেবেন।

মিঃ পালিত নিজেই এসেছেন, খবর পেয়ে। মনে মনে মদনবাবুর দৃঢ়-তাকে শ্রদ্ধা না করে পারেন না, কিন্তু আইন বড় নিষ্ঠুর। মানুষের মনুষ্যত্ববোধ—বিদ্রোহীসত্তাকে নির্দয়ভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

—নমস্কার! আসতে পারি ?

মদনবাবু ফিরে চাইলেন—আসুন।

অফিসারসুলভ মনোবৃত্তি আপনা হতেই জেগে উঠেছে, মদনবাবুর হাতে দারোগাবাবু তুলে দেন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা; দারোগাবাবু বুক ফুলিয়ে ওঁর দিকে চেয়ে থাকেন; এবার আর প্রতিবাদ চলবে না;…আইনের কোথাও ফাঁক নেই। সঙ্গে এসেছেন এস-ডি-ও সাহেব নিজে। কনেস্টবল দুজন ক্লাস থেকে বের করে এনেছে আসামীদের;…দুটি তরুণ কিশোর। স্তব্ধতা ভেদ করে চীৎকার করে ওঠে তারা,

—বন্দে মাতরম।

তাদের নিয়ে ওরা বের হয়ে গেল স্কুল থেকে; অসহায় চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকেন মদনবাবু; আজ মনে হয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন—চোখের দৃষ্টিও কেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মিঃ পালিতের কথায় ফিরে চাইলেন।

—আই এ্যাম সরি—মদনবাবু।

—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এই সম্মানটুকু ধুলোয় মিশিয়ে না দিলেও পারতেন।.

—স্কুল যে সরকারের সাহায্যে চলে, আপনাকে ইতিপূর্বেই আমি একথার আভাস দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি তা মানেন নি।

মদনবাবু জবাব দেন,—মানতে পারিনি।

...তিরিশ বছরের গড়ে তোলা জগৎ থেকে এক মুহূর্তেই বের হয়ে আসতে চায় আজ মন। এই অবিচারের প্রতিবাদের এই হবে প্রথম পদক্ষেপ। মিঃ পালিত চেয়ে রয়েছেন বৃদ্ধের দিকে—ওর দু চোখে কি এক বহ্নিজ্বালা।

—এর পর এখানে থাকতে আমি পারি না, আমার চলে যাওয়াই উচিত। এ অন্ন আমার রুচবে না।

ছেলেরা—মাষ্টারের দল অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে মদনবাবুর দিকে, এতদিন মিথ্যা স্বপ্ন নিয়েই ছিলেন মদনবাবু, এ আমার স্কুল। কিন্তু যখনই অনুভব করেন—অপরের দয়াতে রয়েছেন তিনি, তাদের অন্যায়কেও মেনে নিতে হবে এখানে থাকতে হলে—সেই মুহূর্তেই এখানের সব সংস্রব তিনি কাটাতে চান। মুক্তি চান এই নাগপাশ থেকে।

প্রথম দল চলে যাচ্ছে সদরে, মটর অফিসে জমা হয়েছে সহরের সমস্ত লোকজন, প্রথম দেশপ্রেমিক দলকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে। একটা বাস রিজার্ভ করা হয়েছে।...ফণীবাবু এককোণে একটা টিনের চেয়ারে বসে রয়েছে; কয়েকজন সঙ্গীনধারী প্রহরী এসে দাঁড়িয়েছে চারপাশে। কলরব উঠছে জনতার—বন্দেমাতরম্।

ওপাশে ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়িয়েছেন মদনবাবু; কাঁপছে সারা শরীর উত্তেজনায়, ছেলেরা এগিয়ে এসেছে। হাসিমুখে গাড়ীতে বসে আছে মণি আর ছেলেরা; মদনবাবু একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন ওদের দিকে—মন্দ্রমুখর জনতার মূর্তিমান-পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ওরা; হয়তো দেশের শৃঙ্খল মোচন একদিন হবে, সেদিন মদনবাবু—ওই ছেলেদের নামও কেউ শুনবে না; লোকচক্ষুর অগোচরেই রয়ে যাবে তারা; তবু বনিয়াদের ইটের মত মাটির অতল থেকে ইমারতকে ধরে রাখবার দায়িত্ব তাদেরই।

...ওদের যাত্রা শুভ হোক ;...জয়ধ্বনির মধ্যে ইঞ্জিনের শব্দ ডুবে গেল—ওরা চলে গেল। ফণীবাবু আজ মণিকে চিনতে পারে না, তার বাড়ীর ছোট্ট সীমানা ছাড়িয়ে বৃহৎ বিশ্ব তাকে বরণ করে নিয়েছে; মনে হয় এত সম্পদ অর্থও তাকে এই সম্মান এনে দিতে পারেনি। সমবেদনা ছাপিয়ে একটু অহংকারই তার মনে দেখা দেয়।

বাড়ীর নীচে দিয়েই চলে গেছে রাস্তাটা; মঞ্জু সাগ্রহে চেয়ে আছে, কখন আসবে গাড়ীখানা, মণিকে দেখতে পাবে। মনে হয় কাল দুপুরে সে এসেছিল—তার নিকট সান্নিধ্যে। কি যেন বলতে গিয়েও পারেনি। আজ সারা মনে মঞ্জুর কি এক ব্যথার সুর নেমেছে—মণি কি তার কথা একবারও ভাববে!

ধুলোর রাশ উড়িয়ে চলে গেল গাড়ীখানা; ওদের জয়ধ্বনি তখন শোনা যায় গাড়ীর ভেতর থেকে—বন্দেমাতরম্।

...সহরের ঘুম ভেঙেছে। জেগে উঠেছে মন্দ্রমুখর জনতা। সারা ভারতের একোণ থেকে অন্যকোণে—হিমালয় হতে কন্যাকুমারী অবধি সাড়া জেগেছে—মণি সেই সদ্যজাগ্রত ভারত পথিকদেরই একজন উত্তর সাধক।

মদনবাবু নীরবে চলেছেন, সহরের জীবনযাত্রায় কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য জাগেনি; ঝড় যেন স্তব্ধ হয়ে আসছে; মদনবাবু পাঞ্জাবীর বুক পকেট থেকে কালো কার বাঁধা রদারহ্যাম পকেট ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে ওঠেন,

দশটা বাজে।

...পরক্ষণেই মনে হয় আর ঘড়ি দেখার দরকার নেই। স্কুলের সঙ্গে সব সম্পর্ক সেই দিনই চুকিয়ে দিয়ে এসেছেন; কর্মব্যস্ত জীবনে এসেছে

অখণ্ড শান্তি—অবসর। সমস্ত দেওয়া-নেওয়া চুকিয়ে দিয়েছে সমাজ তার কাছ থেকে, আর দেবার কিছুই নেই তার, রিক্ত শূন্য অসার্থক তিনি, তাই সমাজ নীরবেই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

সব দায় থেকে সমাজ তাকে মুক্তি দিয়েছে, অব্যাহতি দিয়েছে। নিঃশেষে ফিরে পেতে চান আপন সত্তাকে যাকে শতসহস্র কাজের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তিরিশ বছর আগে—এমনি পূর্ণ প্রাচুর্যের সন্ধানে। তবু সান্ত্বনা—তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নি। সহরের তন্ত্রীতে নোতুন প্রাণের জোয়ার এনেছেন তিনি; কাজল গাঁয়ের ইতিহাস যদি কোনদিন কেউ লিখতে বসে মদনমাষ্টারকে সে ভুলবে না; কাজল গাঁয়ের ভগীরথ···

···অন্ধকার তিমিরের বুক চিরে পাঞ্চজন্যের বজ্রনাদে সে পথ দেখিয়ে এনেছিল জ্ঞানের আলোকধারা,···গঙ্গার জলধারা ভগীরথকে উধাও করেছিল কিনা জানেনা—মদনমাষ্টারকে ভাসিয়ে দিয়েছিল উধাও সমুদ্রে তার আদর্শ অজানা নেই কারোও।

···বকুল গাছে অসংখ্য ফুল ফুটেছে। কালো পাতার বুকে সাদা ফুলের স্পর্শ—বাতাসে বাতাসে ওর ব্যাকুল বিদায়ী বসন্তের সৌরভ, মদন মাষ্টার আজ স্মৃতির অতলে কার স্বপ্ন দেখে।

—মাষ্টারমশাই!

একটু ডাক; বৃদ্ধের চমক ভাঙে! চশমার ফাঁক দিয়ে শীর্ণ গণ্ড দেশে কখন গড়িয়ে পড়েছে অশ্রুধারা ভিজে দাড়ির উপর; নোতুন মেয়ের ডাকে ফিরে চাইল,···হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের কোল মুছতে মুছতে বলে মাষ্টার।

—স্কুল যাও নি তুমি?

—আজ ছেলেমেয়েরা স্ট্রাইক করেছে। ওরা নাকি বাজারেও গেছে। সারা সহরে আজ হরতাল।

সংবাদটা শুনে চমকে ওঠে বৃদ্ধ—আগুন কি জনসাধারণের মনেও সংক্রমিত হচ্ছে? পরক্ষণেই থেমে গেল। আজ তার ওদিকে দেবার কিছুই নেই; ওদের পথ ওরা বেছে নিক, তিনি নিরুপায়।

—আমার ওখানেই খাবেন আজ। মেয়েটি আমন্ত্রণ করে।

…স্বপাক রান্না করেন মদনবাবু, আজ আর ওতে ইচ্ছা নেই। ওরা চলে গেল। মণি আর সন্ধ্যাবেলায় আসবে না; প্লুটো-সাফোক্লিস-এরিলাস-নীটশের দর্শন নিয়ে তর্কও সুরু হবে না। বৃদ্ধের নিভু নিভু অন্তর প্রদীপ ওই অটুট তারুণ্যের বুক হতে আহরণ করতো—বাঁচবার সন্ধান। আজ তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। তিনি একা—একান্ত অসহায় আজ।

—তাই হবে মা! তবে আমার জন্য সিদ্ধ ছাড়া কোন তরকারী করো না।

—আচ্ছা। আপনি দেরী করবেন না, বেলা অনেক হোল।

…মেয়েটি চলে গেল, মদনবাবু চেয়ে থাকেন ওর দিকে। মনে হয় সমাজ—মানুষ অকৃতজ্ঞই বলেন কি করে? নইলে তার জন্য অজানা মানুষ ও অন্তরের প্রীতি-শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করে কেন? সমাজকে দেবার কিছুই নেই—একথা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। কোন বিক্ষোভ, কোন অভিযোগ কারোও বিরুদ্ধে তাঁর নেই।

দমকা বাতাসে বকুল দল ঝরে পড়ছে—খসে পড়ছে অন্তহীন আয়ুর মায়াজাল। সৌরভমদির কত জীবন। তবু ফোটে তারা—তবুও আনে অদেখা জগৎ থেকে স্বর্গের সুষমা সৌরভ।

গঙ্গামণির প্রতাপ অপরিসীম। সহরের অন্ধকার জগতের সে অন্যতম কর্ত্রী। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে সহরের অনেক মহাপ্রভুই আসেন তার কাছে—নানান জনের নানা চাওয়া। গঙ্গামণি যাকে যেমন পারে মোচড় মেরে খসিয়ে নেয় কিছু।

আজ বহুদিনের পুরোনো খদ্দেরকে গা ঢাকা দিয়ে আসতে দেখে একটু অবাকই হয়। বয়সকালে গঙ্গামণির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগই ছিল—আজকাল অন্য নেশায় মেতে উঠেছে সে। অবশ্য পুরোনো দিনের স্মৃতি আজও ভুলতে পারেনি ফণীবাবু, সে যেন এক নেশা মাখানো রাত্রির তমসা।

—কি গো? আজকাল যে ঢেক পয়সার মানুষ হয়েছো পারা, ভুলেই গেলে নাকি তাই? বসবা না?

ফণীবাবু চারদিক দেখে বসলো। ওর দিকে চেয়ে থাকে। তন্বী সুন্দরী গঙ্গামণি আজ মোটা থলথলে হয়ে উঠেছে, ভাঁজে ভাঁজে জমেছে চর্বি।

—পান দিয়ে যা লো! ও মটু—

মটুরাণীই এখন মক্ষীরাণী; গঙ্গামণির নোতুন আবিষ্কার। সুন্দর গড়ন—নিটোল স্বাস্থ্য; চোখের তারায় কি এক নেশা। পানের দোনাটা সামনে রেখে দিল, ফণীবাবু ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

হাসে গঙ্গামণি ওর বুভুক্ষু চোখের দিকে চেয়ে। বাইরের পরিচয় বাইরে রেখে এখানে আদিম প্রকৃতি নিয়ে ঢোকে মানুষ। এখানে সবাই সমান—জীবনের এই কঠিন নগ্ন সত্যটা গঙ্গামণি আবিষ্কার করেছে।

—হাঁ করে দেখছো কি গো। আমাকে আর বুঝি মনে ধরে না?

—না! না! কি যে বলিস গঙ্গা।

একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে,

—তোর কাছে এসেছিলাম; ছোট ছেলেটা বকে গেল যে!

গঙ্গামণি চেয়ে থাকে তার দিকে; বকে যাওয়া ছেলেদের হিসাব সে জানে; কিন্তু মণিকে কোনদিনই দেখেনি এপাড়াতে। লেখাপড়া শিখেছে।

—পুলিশে ধরেছে, স্বদেশীর ব্যাপারে!

বাকি কথাটা বুঝে নেয় গঙ্গামণি; বলে ওঠে—ও পারবো নি বাবু; ঢেক ফ্যাসাদ। এতো টাকা লাগবে। ধর শ দুয়েক তো বটেই।

—দুশো! যেন আকাশ থেকে পড়লো ফণীবাবু।

—দুশো টাকাতে দুবিঘে ধানিজমি কেনা যায় রে?

—তাই কেনো গা। তোমার মত লোকের ছেলেপুলে কেন হয় বলো দিকি!

—তুই বললে সব হয় গঙ্গা। হাত ধরছি তোর। খপ করে ওর হাত-খানাই ধরে ফেলে।

—আমরণ, বুড়ো বয়সে রস গেল না। হাত ধরে টানাটানি কি গো? যা বল্লাম—দিতে পারো তবে দেখি চেষ্টা করে।

কি যেন ভাবছে ফণী চক্কোত্তি। বারান্দায় মটুরাণী—যাতায়াত করছে; আবছা আলোতে তার দিকেই চেয়ে আছে দুচোখ মেলে। গঙ্গামণি হাসছে মনে মনে।

—দুশো টাকা, নাঃ। ফণীবাবুর বুক ফেটে যাবে। ছেলেই যাক বরং।

পুলিশের ভ্যান আসছে সদর থেকে ; সহর ভরে উঠেছে ওদের কলরবে। ডাক-বাংলোর মাঠে তাঁবু পড়েছে ওদের। ভোরবেলায় ব্যাণ্ড বাজিয়ে সারা সহর মার্চ করে তারা ; সহরের লোকদিকে—গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, হাটুরে কাছারীর মক্কেলদিকে দেখায়—সরকারের শক্তি সামর্থ্য। যাতে ওরা বিদ্রোহী হতে সাহস না করে।

থানায় অনেক রাত্রি অবধি হেসাক জ্বলছে, প্রহরে প্রহরে শোনা যায় সজাগ ঘণ্টাধ্বনি ; ভারি বুটের শব্দ। সেণ্ট্রি মার্চ করছে—তৈরী হয়ে। থানার ভিতরে একটা ছোট্ট ঘরে বসে দারোগাবাবু, পর্দা দেওয়া দরজায়। ওদিকে বসে আছে শচীন। তার পরনে কাপড়-চোপড় আজ অন্যরকম। মিহি ধুতি র‍্যালি ব্রাদার্সের আদ্দির পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা লিষ্টি বের করে দারোগাবাবুর হাতে তুলে দেয়।

—আমার গতবারের কিছু টাকা বাকী আছে। এই যে নোতুন কিস্তীর নাম।

দারোগাবাবুর চাকরী যেন তার হাতে,···অনেক করেছে শচীন। দারোগাবাবু ইতিমধ্যে দু'ক্ষেপ আসামী চালান দিয়েছেন সদরে। সহরের কোথায় কোন আড্ডায় কি হচ্ছে—কে কি কথা বলছে তাও শচীনের কানে আসে।

—বুড়োকে সরানো যায় না? শচীন ফিস ফিস করে বলে।

শচীনের কথায় হেসে ফেলেন দারোগাবাবু—বুড়ো হাবড়া নিয়ে কি হবে?

—ওটিই নাটের গুরু, পাণ্ডা!

—ওকে নিয়ে সরকার কি বিপদে পড়বে মশাই, ঘাটের দিকে মাথা করে আছে। হুট্ করে জেলে কোন্ দিন মরে বসবে—একেবারে মেরে যাবে সরকারকে। ওসব বুড়ো হাবড়া ছাড়ান দিয়ে ছেলে-ছোকরা দেখুন শচীনবাবু।

শচীন কথাটার অর্থ বেশ বুঝতে পারে।

দারোগাবাবু চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেন—কাজ করে যান, কাজের দাম আমরা দিতে জানি। শুধু কাজল গাঁয়েই নয়, আশপাশের গ্রামেও কাজ করতে হবে। সব জায়গাতেই জাল ফেলে রাখতে হবে, নইলে এখানে তাড়া খেয়ে সরে যাবে অন্য যায়গায় নিরাপদে। সারা অঞ্চলে একটা আতঙ্ক ছেয়ে তুলতে হবে, নইলে ঠাণ্ডা থাকবে না।

শচীন মনে মনে টাকার অংক হিসাব করে।

—যা দরকার তা পাবেন, কালই সুপার সাহেব আসছেন, কথা হবে।

রাত্রি অনেক হয়েছে, শচীন বের হয়ে এল থানা হতে সন্তর্পণে চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে।

কানাই কবরেজ আশা করেছিল জগবন্ধু খালাস পেয়ে মন দিয়ে আবার কাজকর্ম সুরু করবে, ছাড়া সে পেল কিন্তু আর ফিরলো না। হাসপাতালে চাকরী দিয়েছে তাকে অনিমেষ। আর্থিক সাশ্রয় কিছু হয়েছে সত্য, কিন্তু কানাই কবরেজ বেশ বুঝেছে আর কোন আশাভরসা নেই তাদের বংশের নাম যশ টিকে থাকবার। এ আটন শূন্যই পড়ে থাকবে, কোনদিনই আর রোগীর ভিড় জমবে না; শাস্ত্রোক্ত সূচিকাভরণ তৈরীর প্রক্রিয়াও লুপ্ত হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য। জগবন্ধু পুরোপুরি এলোপ্যাথিক চিকিৎসাই [illegible] শিখছে।

প্রায়ান্ধকার ঘরখানায় বসে বসে কি যেন ভাবে। মনের মধ্যে দুর্বার প্রেরণা জেগে ওঠে, জগবন্ধুও তাকে পরিত্যাগ করে গেল। সেদিন জগবন্ধুকে বলতে শুনেছে,

—সূচিকাভরণ কি হবে? কোরামিন ইনজেকশন দিলেই হোল। কানাই কবরেজ বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল; এর চেয়ে যদি জগবন্ধুর জেল হতো, দুঃখ পেতো মনে মনে, কিন্তু এতখানি বিচলিত হতো না। নীরবে খেতে থাকে।

…জগবন্ধু তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল হাসপাতালে, অনিমেষের কাছে।

অন্তরের একটি জায়গায় মানুষ নিঃসঙ্গ-একক। শতকাজের ভিড়েও সে একা। কোথায় তার মনে জাগে নিঃস্বতা—একা সে। অনিমেষ খ্যাতি, অর্থ পাচ্ছে; জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু কোথায় যেন বড্ড একা। কাজল

গাঁয়ের স্তব্ধ সবুজ বনসীমার দিকে চেয়ে অনুভব করে তার মনের হাহাকার ; বার বার মনে পড়ে একজনকে। যৌবনের প্রথম আলোয় সেইই এসেছিল মনের নিকট সান্নিধ্যে। বহরমপুরের কয়েকটি দিন—কাশিমবাজারের ছায়াঢাকা বননির্জনে তার ব্যাকুল আহ্বানময় কণ্ঠস্বর আজও ভোলে না সে। কাজল গাঁয়ের নির্বাসন আজ যেন প্রকট হয়ে উঠেছে তার কাছে।

নিজেকে তাই নিবিড়ভাবে কাজের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে চায় সে। পথ চলার নেশায় সব দুঃখ ভুলতে চায়।

কিন্তু পথ বহু বিচিত্র। অনেকেই যাত্রার সাথী হয়, কেউ পড়ে পিছিয়ে —অচেনা আগেকার হারানো আপনজনের সঙ্গেও অকস্মাৎ পথের বাঁকে আবার নোতুন দেখা ঘটে যায়। কেউ হারায় - কেউ ফিরে পায়।

নিঃস্ব বনবাসের স্তব্ধতাঘেরা কাজল গাঁ অকস্মাৎ রূপে রংএ রসে ভরে উঠলো তার কাছে। নোতুন চোখে দেখলো অনিমেষ কাজল গাঁকে।

নোতুন হেডমিসট্রেস সবে এসেছে। সমাজের মধ্যে নবাগতকে স্বাগত জানাতে যায় অনেকেই। অনিমেষ ক'দিন পর গেছে।

অপরিচিতা মহিলা—নির্বান্ধব বনবাসে এসে পড়েছেন ; নেহাত সৌজন্যতার খাতিরেই এসেছে অনিমেষ।

…আবছা অন্ধকার বাসা বেঁধেছে গাছগাছালির মাথায়, পাখীর ডাক থেমে এসেছে। বাতাস বুনোফুলের গন্ধে আমন্থর। নির্জন হয়ে এসেছে ধুলো ঢাকা পথ। হ্যারিকেনের আভায় বারান্দাটা একটু জেগে আছে—পাশে বসে রয়েছে একটা বেতের চেয়ারে ভদ্রমহিলা।

—নমস্কার! থতমত খেয়ে নিজের পরিচয়টা নিজেই বলতে থাকে অনিমেষ।

—এখানকার ডাক্তার। এসেছেন শুনেছি—

…হঠাৎ থেমে গেল সে। আবছা আলোয় দেখতে পায় মনীষা! হ্যাঁ—তার স্বপ্নচারিণী আজ সন্ধ্যার তারাজ্বলা ম্লান আলোয় মূর্তিমতী হয়ে উঠেছে। সারা দেহে ওর সুঠাম শ্রী। হাসছে মুখ টিপে—তেমনিই আছে মনীষা। বিশেষ বদলায় নি তার মুখচোখের আদল।

—যাক এসেছেন তাহলে ! বলে ওঠে মনীষা। হাসতে হাসতে বলে সে, আপনি তো নিমন্ত্রণ করেই খালাস, আর কোন খোঁজ-খবরই পেলাম না। .

অনিমেষ বলে ওঠে—নিজেই এসেছেন তাই ?

—অগত্যা !

কোথায় পাখী ডাকছে। রাতজাগা পাখী—আবছা আলোয় রাতের তমসা কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। পাশে বসে মনীষা—অনিমেষ আজ নোতুন চোখে কাজল গাঁকে দেখতে সুরু করেছে। মনের অতলে অসীম শূন্যতা কি এক বিচিত্র রাগিণীতে ভরে উঠেছে তার। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে চলেছে আনমনে।

—আসবেন মাঝে মাঝে। শুনেছি আপনার তো এখন রোরিং প্রাকটিশ।

হাসবার চেষ্টা করে অনিমেষ। মনীষা ওকে এগিয়ে দিয়ে গেল রাস্তা অবধি ; মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলো যেন চোখ মেলে দেখছে ওদের সলজ্জ অভিসার। অনিমেষ কি যেন হারানো সম্পদ ফিরে পেয়েছে।

সকাল হতেই হাসপাতালে রোগীদের ভিড় জমে ওঠে, দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে গরুর গাড়ী, ডুলিতে করে আসে শয্যাশায়ী রোগীর দল, ডাক্তারকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবার মত সামর্থ্য তাদের নেই। সহরের ছেলে-মেয়ে—বুড়োরাও আসে। বিনিপয়সায় ওষুধ পায়, একটু গুরুতর কেস হলে হাসপাতালেই থেকে যায় ; ওষুধ—পথ্য—সব খরচাই বাঁচে।

প্রথম প্রথম অনেকেই আসতে চাইতো না, যদিবা দুচারজন আসতো, ইনডোরে থাকবার মত মনের অবস্থা কারোও ছিল না।

—কেন রে, ওষুধ পথ্য পাবি ; চিকিৎসা হবে।

অনিমেষের কথায় লোকটা মাথা নাড়ে· মরে যাবে জি গো।

হাসতে থাকে অনিমেষ—মরবি কেন ?

—কেনে, আমাদের হরে ঘোষ গপ্পো করছিল হাসপাতালে মানুষ মেরে হাড়গোড় বিক্রী করে সহরে।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অনিমেষ ; এই মূল্যবান তথ্য ওদের গাঁয়ের সর্বজন-মান্য হরি ঘোষ কোত্থেকে সংগ্রহ করলো জানে না ; কিন্তু এ তথ্য তারও অজানা ছিল।

—নারে না ; ডাক্তাররা কি মানুষ মারতে চায়—না বাঁচাতে চায় ? বাড়ী গিয়ে না খেয়ে মরবি, ওষুধ কিনতেও পারবি না ; তার চেয়ে থেকে যা।

অনেক কষ্টে রাজী হয় লোকটা—বাড়ী যেতে দেবা তো ? বিঁড়ি তামুক খেতে পয়সা দিতে হবে কিন্তু।

এমনি করে প্রথম প্রথম রোগী ভর্তি করতে হতো, এইতো বছর দুই আগেও। বর্তমানে সে ভয় কেটেছে লোকের, এখন অনেকেই আসে—আবেদন নিয়ে ; কিন্তু সিট বেশী নেই—সকলকে ঠাঁই দেবার মত ক্ষমতাও নেই তাদের। জগবন্ধু পর্যন্ত কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে। দিন গেলে প্রায় দেড়শো-দুশো রুগীকে ওষুধ দিতে হচ্ছে বর্তমানে।

মঞ্জু ক'দিন চুপচাপ থাকে, বাড়ীতে কলরব তার কমে গেছে ; নীরবে পড়াশোনা করে—স্কুলে যায় ; বাড়ীর কাজকর্ম দেখাশোনা করে না আর তেমন। সরমা যথারীতি খায়-দায় আর ঘুমোয়।

সেদিন খুকীর মায়ের রান্না সারা হতে দেরী হয়েছে, তাই নিয়েই খুটখাট বাধে ;—এত ঢিমে তেতালা কাজ করলে এ বাড়ীতে চলবে না।

খুকীর মাও বলে বসে—আপনি কাজকর্মের কি দেখেন মা ? দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করো – সেইই জানে কতদিক সামলাতে হয়।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে সরমা—দিদিমণি কি বাড়ীর কর্ত্তা নাকি ? আমি বলছি আমার মতে কাজ হবে।

রমণবাবু ঘরে বসে হিসাবপত্র দেখছিলেন ; তার মনের সেই জোর যেন কোথায় কমে আসছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। আশা করেছিলেন পুত্রসন্তান হবে, তার বংশ থাকবে, কিন্তু অবলম্বন ওই একটিমাত্র মেয়ে ; সরমা তাকে ঠিক সহ্য করতে পারে না, মনে মনেমেয়েকে নিদারুণ হিংসে করে। মটর কোম্পানীর মধ্যে কোন রন্ধ্রপথে শনি ঢুকছে ; অদৃশ্য হাতে কোথায় চুরি চলেছে—আগেকার সেই রোজকারও কমে আসছে। অন্যপথে ফণীবাবুর আজ গাড়ীর সংখ্যা বেড়েছে অনেক, নীরবে ওই শীর্ণকায় লোকটি কি প্যাঁচ কষে, মিনমিন করে

কথা বলে আর আড়ালে অন্যমূর্তি। লোকটাকে কেমন যেন সহ্য করতে পারে না।

স্ত্রীর কথায় সব চিন্তাজাল এলোমেলো হয়ে যায়। উঠে পড়েন বিরক্তিভরে।

—কি করছো সকাল থেকে, একটু শান্তিতে কাজকর্ম করতেও পাবো না?

সরমা ফোঁস করে ওঠে, কোনদিনই নীরবে কোন অভিযোগ সে স্বীকার করে নেয় নি।

—সংসারের কোন কাজই তো আমি দেখি না, আপনা হতেই সব হয়।

—সে কথাতো আমি বলিনি।

মঞ্জু স্কুলে গেছে; সে বাড়ীতে থাকলে মাকে থামাতো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, সে নেই; সুতরাং বাধা পেয়ে ফুঁসতে থাকে আরও বেশী মাত্রায়। খুঁকির মাকে ছেড়ে দিয়ে—স্বামীকেই আক্রমণ সুরু করে,

—কি করছো তুমি? আমার মরণ হয় না, তোমার হাতে পড়েছি। খেটে খেটে গেলাম—হাড়মাস কালি হয়ে গেলো।

খাতাপত্র বগলদাবা করে ঠাকুরমশাই উঠে পড়লেন; অপিসে গিয়েই কাজ-কর্ম দেখতে হবে—ওসব হিসাব পত্র সেইখানেই হবে। ঘরের কোণ থেকে ছাতাটা তুলে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। সরমা আরও জ্বলে ওঠে,

—ভীমরতি ধরেছে, একদণ্ড তিষ্ঠোবেন না। জানি না বাবা কি মধু সেখানে আছে।

রমণবাবুর মনের প্রশান্তি যেন নিঃশেষ হয়ে আসছে। কি যেন অহরহই সন্দেহ করে সরমা; দিনরাতই অশান্তি—বিশৃংখলা বাড়ীতে লেগে আছে। প্রথম প্রথম বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন ওকে শোধরানো অসম্ভব, তখনই নিরস্ত হয়ে গেছেন, হাল ছেড়ে দিয়েছেন। নিজেই সরে এসেছেন সংসার হতে। যেদিকে তরণী ভেসে যায়—যাক গোছের ভাবখানা। ধীরে ধীরে সবমায়ার বন্ধন কেটে যাচ্ছে। একমাত্র আকর্ষণ ওই মঞ্জু,—ওর জীবনীশক্তি, সাবধানী মন—সজাগ দৃষ্টি আর স্নেহ দিয়ে বাবাকে ঘিরে রেখেছে—মূর্তিমতী মায়ের মত। রোদ তেতে উঠেছে—ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছেন রমণবাবু—গোলমাল হ'তে নিষ্কৃতি পেতে চান তিনি।

অনভ্যস্ত জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছে মনীষা। মহানগরের স্বপ্ন তার মন থেকে মুছে যায়নি। বাধ্য হয়েই চাকরী নিয়ে বের হয়ে এসেছে। জীবনে তার জন্য শ্যাম সজীবতা কোথাও নেই। থাকলে এভাবে এমনি তেপান্তরে আসতে হতো না। আজ সামান্য স্মৃতিটুকুকেই সজীব করে তুলতে চায় সে অনিমেষের মধ্যে। সারা কাজল গাঁয়ে সেই যেন তার একক আত্মীয়।

অনিমেষ ক'দিন যেতে পারেনি। নানা কাজের চাপে ডুবে আছে। তাছাড়া ওখানে যেতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হয়; মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে—বার বার চেয়ে থাকে দূরে ছায়াঘেরা পল্লীর দিকে—ওরই পাশে রয়েছে মনীষা। তার স্বপ্নসঞ্চয়।

হঠাৎ বৈকালে সেদিন কার পায়ের শব্দে বের হয়ে এল; কুকুরটা ডাকছে। বিশ্বাসই করতে পারে না। ছায়াঢাকা নির্জন বাগানে কুঁড়ির বুক থেকে জাগর সৌরভের স্বপ্ন নিয়ে উঠে আসছে মনীষা। রাস্তার ধুলো থেকে বাঁচবার জন্য শাড়ীটা একটু তুলেছে—সুগঠিত গোড়ালি দেখা যায়, কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম; আরও যেন সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

—একি !

—আপনি তো আর নিমন্ত্রণ করলেন না, নিজেই এলাম যেচে। বাঃ চমৎকার পরিবেশটি

চারিদিক দেখতে থাকে। চাঁপাগাছে এসেছে অজস্র ফুল, নিজেই এগিয়ে গিয়ে ডাল ধরে নাড়া দিতে থাকে—ঝর ঝর করে ঝরছে ফুলগুলো ওর গায়ে-মাথায়—খুশিতে উপছে পড়ছে মনীষা ছোট্ট মেয়ের মত।

একরাশ ফুল ডালপালা সমেত কুড়িয়ে নিয়ে উঠে এল, হাঁপাচ্ছে তখনও।

—আপনার অনেক ফুল নষ্ট করলাম।

—সদগতি হোল ওগুলোর। এমনিই ঝরে পড়তো ওরা।

মনীষা খোঁপাতে গুঁজেছে একগাদা কনকচাঁপা।

—পিসীমা এই সময় দেখতে পেলে ?

…বহরমপুরের সেই ঘটনাটা আজও ভোলেনি ওদের কেউ। হাসিতে ফেটে পড়ে মনীষা—ওরে বাব্বাঃ !

ক্লাসের গম্ভীর দিদিমণি আজ পড়ন্ত সোনা রংএর রোদে—হারানো সত্তাটিকে যেন খুঁজে পায় ; উধাও হতে চায় সে অসীম নীলিমায়।

রামহরি ওর দিকে একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কাজল গাঁয়ের আদিম জীবন যেন ওর প্রাণচাঞ্চল্যকে সহ্য করতে পারছে না। মনীষা নিজেই চা করতে সুরু করেছে ; রামহরির কোন দরকারই নেই আপাততঃ।

—ওরা একটু অবাক হয়ে গেছে। অনিমেষ বলে ওঠে।

হাসে মনীষা—ক্রমশঃ সহ্য হয়ে যাবে।

হয়তো তাই হবে। দিন এগিয়ে চলেছে। আজকের কাজল গাঁ দশবছর-বিশবছরের মধ্যে আমূল বদলে যাবে। পড়ন্ত রোদে বাগানের পারে—দিগন্ত-প্রসারী রাঢ়দেশের প্রান্তরের দিকে চেয়ে থাকে মনীষা—মনে ওর কি এক দৃঢ়তা।

কাজল গাঁয়ে এসে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এই মনোরম পরিবেশে। নোতুন গড়ে উঠছে সহর ; ভ্রূণ থেকে পূর্ণ পরিণতির দিকে চলেছে আগামী নবজাতক।

ধূলিধূসর পথ...নদীর ওপারে বিশাল প্রান্তর—শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে দিক-দিগন্ত ; সভ্য জগতের বহুদূরে, ক্ষীণ যোগসূত্র তার ওই যাত্রীবাহী বাস ক'খানা। দুপুরের রোদে জনহীন পথ শূন্য পড়ে থাকে, এর আকাশে রাত্রির তমসা আসে তারাফুল নিয়ে, কানা ময়ূরাক্ষীর নদী তীরে শ্যামঘন ছায়ায় ডেকে ওঠে দোয়েল পাপিয়া—রাত্রির বিনিদ্র প্রহর। কলকোলাহল নেই—শান্ত নিথর মহাজীবন।

...এ যেন দূর প্রেইরী অঞ্চলের কোন সদ্য গড়ে ওঠা জনপদ, চারদিকে ওর শস্যের প্রাচুর্য্য। নিজের গতিতেই সে স্বয়ংসম্পূর্ণ।...বাইরের—বৃহত্তম সমাজের করাল মুষ্টির আঘাত এখনও এর প্রশান্তিকে ছারখার করে দেয় নি। জটিল হয়ে ওঠেনি জীবন।

...একে নূতন করে রূপ দেওয়া যায় ; ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে বসে পাতার পর পাতায় নোট নিয়েছে ; বাংলার শ্যামল গ্রামসীমাঘেরা জগৎকে এত আপন করে সে কোনদিনই পায় নি।

অকস্মাৎ অনুভব করে একা সে নয়—অনিমেষও আছে তার সঙ্গে। সেও কাজল গাঁয়ের স্তিমিত জীবনে গতিবেগ এনেছে, এনেছে নোতুন প্রাণের অঙ্কুর।

মঞ্জু ইতিমধ্যেই নোতুন দিদিমণির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে। স্কুল শেষেও খানিকক্ষণ থাকে ওঁর কাছে।

—একদিন আমাদের বাড়ী চলুন না?

—যাবো বৈকি।

মঞ্জু চেয়ে রয়েছে মনীষার দিকে: সারা দেহমনে ওর বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি। অলঙ্কারবিহীন হাতে মাত্র ঘড়িটা মানিয়েছে চমৎকার, প্লেন আকাশী রংএর শাড়ীখানা ওর মনের মাধুর্যকে যেন আরও বাড়িয়েছে।

…পড়াশোনা কেমন করছো?

মঞ্জু বলে ওঠে—কই আর হচ্ছে? আপনি যদি একটু আধটু দেখিয়ে দেন—

কথাটা বলতে গিয়ে যেন কুণ্ঠা বোধ করে থেমে গেল। ইতিপূর্বে মনীষা মঞ্জুর পরিচয় পেয়েছে, মেয়েটিকেও দেখে ভাল লেগেছে। পল্লীঅঞ্চলের মেয়েদের সম্বন্ধে কল্পিত ধারণা একটা ছিল, এখানে এসে মঞ্জুকে দেখে—সে ধারণা তার বদলে গেছে। সারা মন জুড়ে রয়েছে ওর একটা সহজ সাবলীলতা; এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মনন শক্তি যে কোন সভ্যজগতের মেয়ের মধ্যেও সহজলভ্য নয়।

মনীষা জবাব দেয়—আচ্ছা দেখি, দরকার হয় ব্যবস্থা করে নিতে হবে। মঞ্জু আশাভরে কথাটা যাচাই করে নিতে চায়—ঠিক ত?

—হ্যাঁ।

মা কি করছো?…

ওদের দুজনের কথার মধ্যে এসে পড়েছেন মদনবাবু। বৃদ্ধের এই ক'দিনেই দেহ মনে এসেছে একটা পরিবর্তন; মনের দিক থেকে কোথায় একটা ঘা খেয়েছেন তিনি। কঠিন বাস্তব জগতের সংস্পর্শে এসে তার আদর্শবাদী মন নিদারুণ আঘাতে মুষড়ে পড়েছে।

মিঃ পালিত তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।

—আপনি আবার স্কুলে আসুন।

—তা হয় না স্যার, আমার আদর্শের সঙ্গে যেখানে সংঘাত, সেখানে আমি আপোষ করতে পারি না।

একক নির্বাসন দণ্ড মেনে নিল বৃদ্ধ ; কোথায় যেন ভুলই করেছে মনে হয়। দুর্বার স্রোতের সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিতে যাওয়া বোকামি ; সেই স্রোতের আবর্তের সামনে বাধা দিতে গিয়েই হয়ত ছিটকে পড়েছে জীবনের ঘূর্ণাবর্তে। তবু মনে মনে সান্ত্বনা—আজ সব কামনার নিবৃত্তি ঘটেছে ; এই স্তব্ধতার মাঝেই শান্তির স্পর্শ পেতে চান তিনি।

—আসুন !

মনীষা উঠে চেয়ার এগিয়ে দিল বৃদ্ধকে—থাক—থাক।

—ভাল আছেন ? কুশল প্রশ্ন করে সে।

—হ্যাঁ মা।···

আজ তার মনে অখণ্ড প্রশান্তি।

সারা সহর—আশেপাশের গ্রামে নেমে এসেছে আতঙ্কের কালোছায়া ; ভোর রাত্রে কবে কার বাড়ীতে পুলিশ হানা দিয়ে সমর্থ ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

কাজল গাঁয়ের ইতিহাসে এক অন্ধ তমসাচ্ছন্ন যুগ নেমে এসেছে। রাত্রির নিথর অন্ধকারে বাবা মা—শিউরে ওঠেন ; পুলিশ তাদের শান্তির সংসারে কি এক কালো দানবের ভূমিকা নিয়েছে। এত খুঁটিনাটি কি করে পুলিশের কানে উঠছে—ধারণা করতে পারে না কেউ। রণজিতের চায়ের দোকানে আড্ডা বন্ধ হয়ে গেছে, লাইব্রেরীতেও যাতায়াত কমে গেছে ওদের ; বৈকালে নদীর ধারে—খেলার মাঠেও ছেলেদের দলবদ্ধ হৈ-চৈ থেমে গেছে। সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে অবশ্য ওই কালোহাতের ভয়ে।

···মদনবাবু নীরবে দেখে চলেছেন। তাঁর বাড়ীতেও মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিতে আসে ; সন্ধ্যার সময় দু'একজন অচেনা লোককে প্রায়ই দেখেন পথে-ঘাটে। এরা বাইরের লোক—কাজল গাঁয়ের সব মানুষই তাঁর চেনা।

—তোমার এখানে আসা ঠিক নিরাপদ নয় ; তোমাকে ওরাও সন্দেহ করতে পারে। তাই বড় একটা আসি না, ওদের চর সর্বত্র।

—কিন্তু এই নীচতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় কি করে ? এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত। মনীষা জবাব দেয়।

···কথা বলেন না মদনবাবু, মঞ্জু চেয়ে রয়েছে ওঁদের দিকে। মদনবাবুর নীলাভ স্তিম্মিত আঁখিতারায় কি এক দীপ্তি!···দমকা বাতাস জানলার পাল্লায় আছড়ে পড়ছে; বলে ওঠেন তিনি,—দর্শনের ছাত্রী মা, স্পিনোজার কথা পড়েছো তো?

—I have laboured carefully not to mock, lament ore xerate, but to understand human actions; and to this end I have looked upon passions—not as vice of human nature, but as properties just as pertinent to it as are heat, cold, storm, thunder and like to the nature of the atmosphere.

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি মনীষা, সহরের একদল লোক মেতে উঠেছে এই খেলায়—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির নেশায়। নইলে পুলিশ এতদূর সাহসী হবে কি করে? এই সহজাত প্রবৃত্তি যে দিনের আলোর মতই সত্য। একে অস্বীকার করবে কি করে?

—তবে কি এর কোন প্রতিকার নেই? মঞ্জু প্রশ্ন করে ওঠে উত্তেজনার আবেগে।

মদনবাবু ওর দিকে চেয়ে থাকেন; কেমন যেন এক তীক্ষ্নতা মাখানো আছে ওর সারা মুখ চোখে।

—তোমরা আগামীদিনের বংশধর, তোমরাই তার প্রতিবাদ করবে। এ ঢেউ বেশী দিন থাকবে না, কিন্তু অন্যায় গাঁথা রয়েছে মানুষের অন্তর বাইরে সর্বত্র। তারই প্রতিবাদ করতে হবে।

—An emotion can neither be hindered nor removed except by a contrary and stronger emotion.

···এর প্রতিরোধ করতে হলে চাই শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত বলিষ্ঠ শিল্পীমন। এই ভাঙনের সামনে দাঁড়িয়ে নোতুন করে গড়বার আহ্বান সে জানাবে সমাজকে, নির্দেশ দেবে।

···মদনবাবু বোধ করেন আজ তিনি যে সেই নোতুন দিনের আলো দেখতে পেয়েছেন; মন ভরে ওঠে ওই নবজাতকদের দেখে—আগামীদিনের মানুষ;

ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়—আশা করেন মণি,—ওই মণি মঞ্জুর মত ছেলেমেয়ে দেশের কোণে কোণে আরও ছড়ানো আছে। আবার বাঁচতে ইচ্ছে করে—আবার নোতুন আদর্শে গড়া দেশ দেখে যেতে চান তিনি।

Free man thinks of nothing less than of death; and his wisdom is a meditation not on death but on life.

তাই বোধ হয় মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তিনি মহাজীবনের ধ্যান করেন।

মঞ্জুর খেয়াল হয় বাড়ী ফিরতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। মনীষাদি-মদনবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় সময়টা যে কোন দিকে কেটে গেল খোঁজ রাখে নি। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কাজল গাঁয়ের সীমানার ঊর্ধ্বে এ কোন বিচিত্রতর এক জগৎ—মানুষের তুচ্ছ খুঁটিনাটি—চাওয়া-পাওয়ার হিসাব এখানে নেই। দুঃখের মাঝে অসীম দুঃখ জয়ের সাধনা করছে ওই মদনবাবুর মত জ্ঞানবৃদ্ধতপস্বী। মনটা কি এক অপরিসীম শান্তিতে ভরে ওঠে। কল্পনাবিলাসী তরুণ মন মেতে উঠেছে সার্থক স্বপ্নের আনন্দে।

—কোথায় ছিল এতক্ষণ? সহর টৈ টৈ করে ফিরে এলেন বাপসোহাগী মেয়ে।

বাড়ীতে পা দিতেই মায়ের কথা কানে আসে। রমণবাবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন খাতাপত্র নিয়ে—এখনও ফেরেননি।···সরমার রাগ তখনও পড়েনি, মনে মনে ফুঁসছিল—সামনে মঞ্জুকে আসতে দেখেই ফেটে পড়ে রাগে।

রোদে তেতে পুড়ে এসেছে এতখানি পথ; তেষ্টাও পেয়েছে। বাড়ীতে পা দিয়ে একটু জিরোবে—ঠাণ্ডা হবে তা নয় ঢুকতেই এই সম্ভাষণে জ্বলে ওঠে সারা দেহ। সেও বলে ওঠে—ঝগড়া করবার জন্যই কি বসেছিলে?

—ঝগড়া! আমি তো সারাদিন তোমাদের সঙ্গে ঝগড়াই করি। একজন ডুবে থাকবেন মটর আফিস আর ধম্মো পুজো নিয়ে; মেয়ে মেতে রইলেন স্কুল আর সহর বেড়ানোয়। ছিঃ ছিঃ লোকে কি বলে শুনতে পাস না?

কি এক সুন্দর জগৎ থেকে ছিটকে যেন নরকে এসে পড়েছে মঞ্জু, কঠিন কণ্ঠে বাধা দিয়ে ওঠে—মা !

সরমা আরও কি বলতে গিয়ে থেমে গেল মেয়ের দিকে চেয়ে ; রোদের আভায়—রাগে টকটকে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে ওর মুখ চোখ—উত্তেজনায় কাঁপছে সে।

—ভালমন্দ জ্ঞান আমার হয়েছে, এ সম্বন্ধে তোমার কথা না বললেও চলবে।

আপাততঃ থামলো সরমা ; মঞ্জু বইগুলো রাখতে রাখতে বলে,

—বাবার খাওয়া হয়েছে ?

সরমা পান দোক্তা নিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে উঠে যাবার মুখে জবাব দিয়ে যায়, —জানিনা বাবা তোমাদের মেজাজ ; এত খিদমৎ আমি করতে পারবো না।

বুঝতে পারে মঞ্জু বাবার সঙ্গে কিছু বচসা ঘটার পর বাবা অপিস বের হয়ে গেছেন নীরবে। ফিরতে দেরী হবে।

চুলগুলো খুলতে খুলতে চাকরটাকে পাঠালো অপিসে,

—গিয়ে বলবি বাবাকে আমি ডেকেছি।

বাবা না এলে তারও খাওয়া হবে না।

…সারামন বিষিয়ে উঠেছে মঞ্জুর মায়ের এই হীন ব্যবহারে ; বাবার মত নীরব সহিষ্ণু লোকেরও অসীম ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় মায়ের এই ব্যবহারে। শান্তির স্পর্শ এখানে নেই—একটি মানুষের রুক্ষ মন সমস্ত কিছু প্রশান্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

সরমা চুপ করে বসে আছে বিছানায় ; বাবা মেয়ে একযোগে তার বিরুদ্ধে যেন চক্রান্ত করছে। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে যত শীগ্‌গির পারে সরাবে সে। এখানে ওকে রাখতে চায় না।

…নারীমনের ব্যর্থতা—ওর অবচেতনমনের অতৃপ্ত বাসনা—জ্বলে ওঠে মঞ্জুর প্রাণপ্রাচুর্যময় সাবলীল ব্যবহারে। সরমা ওকে তাই যেন সহ্য করতে পারে না। এ এক বিচিত্র অনুভূতি—এর সমাধান করতে পারে নি।

ওপাড়ার বৃন্দাবন সাঁপুই ঘটকগিরি করে, সেইই নাকি পাত্রের সন্ধান এনেছে। ওদের গোপনে গোপনেই সরমা কথাবার্তা পাকা করে তুলতে চায়। তারও মেয়ে—একা রমণবাবু বাধা দিলে সরমা শুনবে না।

···নীচে মঞ্জুর গলা শোনা যায়—

—এত দেরী হ'ল ফিরতে তোমার ?

রমণবাবুর হাত থেকে ছাতা, জামাগুলো নিয়ে পাখা করছে তাঁকে। সরমার সারা মন জ্বলে ওঠে। মঞ্জুকে বিদেয় করবার ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলতেই হবে তাকে।···

যমুনা পথেই দাঁড়িয়ে আছে। মাধুকরী সেরে ফিরছিল তারা দুজনে ; চালের ঝুলিটা নিয়ে কোথায় গেছে নিতাই—এখনও ফেরবার নাম নেই। কিছুদিন থেকে ওটা লক্ষ্য করছে যমুনা নিতাই বদলে যাচ্ছে। সারা গা রোদে পুড়ে যাচ্ছে—কাঁঠাল গাছের অপসৃয়মান ছায়ার সংগে খানিকটা ঠাঁই বদল করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। রাগে অভিমানে সারাদেহ জ্বলছে।

রাস্তা দিয়ে চলেছে দু'চারজন লোক—ওকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু বিস্মিত হয়। জলতেষ্টাও পেয়েছে। সামনের মিষ্টির দোকানে গিয়ে বলে ওঠে—একটু জল দেবে খাবার ?

দোকানদার মুখ ফিরিয়ে ওঠে—সামনেই তো নদী বাছা, খাবার মত, ডুবে মরবার মতও জল পাবে সড়কখালির দহে।

ফিরে এল যমুনা—একাই আশ্রমের দিকে পা বাড়ালো।

রোদে তাপে তেতে উঠেছে পথটা ; আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। ধূসর তামাটে আকাশ জ্বলে পুড়ে উঠেছে। নদীর ধারে বিষকরমচা গাছের কালো পাতা ঢাকা ডাল নুইয়ে পড়েছে জলের বুকে—নিবিড় শান্তির ইসারা আনে।

সাইকেলের ঘণ্টার শব্দে ফিরে চাইল, ঝকঝকে নোতুন সাইকেল। নীল রং তার মুছে যায় নি। ফটিকবাবু নামছে।

···এত দেরী—কোথায় গিয়েছিলে ?

হাতের খঞ্জনীটাই রেখে গেছে ওর হাতে নিতাই—কাঁধের চালের ঝুলির ভার লাঘব করে গেছে। মুখ তুলে চাইল যমুনা ওর দিকে। সেই ভোরবেলার

পর আর যায়নি আশ্রমে। কথার জবাব না দিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে।
—আর যাও নি তো ?

হাসে ফটিক—যাই কোন মুখে—তুমিই তো তাড়িয়ে দিয়ে ছিলে কুকুরের মত।

লজ্জা পায় যমুনা, মুখে ফুটে ওঠে সলজ্জ আভা ; বলে ওঠে,

—যে অবস্থায় গিইছিলে দেখে যে ভয় লাগে।

—সত্যি ?

ফটিকের কণ্ঠে যেন অনুতাপ ফুটে ওঠে।

—নেশা করলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, সত্যি।

…কথাটা শোনে যমুনা, নিতাইএর প্রকৃতিতে ওই বিষ ঢুকেছে। কোথা থেকে পেলো ওই সংক্রমণ নিতাইও তা জানে না। যমুনা কি ভাবছে, কোথায় নির্জন বনভূমিতে পাতার আড়ালে বসে উদাস কণ্ঠে ডাকছে ঘুঘু পাখী। নিথর মধ্যাহ্ন উদাস করে তোলে।

বাগানের পরেই ছোট মাটির দেওয়ালতোলা চালাটা ; উঠোন-দাওয়া গোবর দিয়ে নিকোন তকতকে। একপাশে নামান জলকচুর ডাঁটা, নদীর ধার থেকে তুলে এনে রেখেছিল—আজ তরকারী হবে। কিন্তু নিতাইএর সাক্ষাৎ নেই এখনও।

—রান্নাবান্না করবে না ?

ফটিকের কথায় হেসে ফেলে যমুনা, মলিন বিষণ্ণ হাসি।

—নাঃ, আজ হরিমটর প্রসাদ পাবো।

—মানে ?

…চাল ঘরেও নেই, যা পেয়েছিল তা সেই নিতাই নিয়ে গেছে, ও আর ফিরবে না তা বেশ বুঝতে পেরেছে যমুনা। বলে ওঠে,

—আজ ঘরে চাল বাড়ন্ত।

—উপোস দেবে ?

—ঠাকুরের ইচ্ছা।

বিরক্ত হয়ে ওঠে ফটিক, নীরবে উপোস দিয়ে থাকবে তবু কারোও কাছে মুখ ফুটে বলবে না ; জানে ফটিক—যমুনার ইসারা পেলে কাঞ্জল গাঁয়ের অনেক রথী মহারথীই ছুটে আসবেন—আর্তত্রাণ করতে।

…হেসে ফেলে যমুনা—দেখো ছোটবাবু—আবার ফস্ করে তালুক মুলুক দিয়ে বসোনা, ফকির মানুষ আমরা—ওকে বড্ড ডরাই গো।

আপন মনে কচুর শাক কুটতে থাকে, বলে ওঠে,

—মুগের ডাল আছে চাট্টি—কচুর ঘণ্ট হবে চমৎকার।

…তবু ও মুখ ফুটে কিছু বলবে না ; উলটে রসিকতাই করবে।

—আজ যাই।

উঠে পড়লো ফটিক ; যমুনা হাসছে মুখ টিপে টিপে।

—যাই নয়—বলো আসি। দুনিয়া তো যাওয়া আসা নিয়েই।

চলে গেল ফটিক ; একা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে যমুনা ; দুপুরের ঝড়ো গরম হাওয়া গাছের মাথায় মাথায় আছড়ে পড়ছে ; রোদের তাপে শুকিয়ে গেছে সন্ধ্যা-মালতীর ফুলগুলো ; যমুনা গুম হয়ে কি যেন ভাবছে। নিজের অন্তর-সত্তা আজ অজানা মুহূর্তে নিজের সামনেই কি এক কামনামদির রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল—কয়েক মুহূর্ত আগে। তার এই মাধুকরী পদাবলী গান—কৃষ্ণপ্রেমের নিবিড় আবরণ ভেদ করে একটি অজানা মানুষ নোতুনরূপে ধরা দিয়েছিল—এ কোন এক চিরন্তন নারী। ঘুম ভেঙে ওঠে—সদ্য জাগা সেই সত্তা।

…বাগানের মধ্যে জড়িত কণ্ঠে গান শোনা যায় ; নিতাই আসছে। ধূলিধূসর মূর্তি, মাথার পাগটা খুলে ঝুলছে পিঠের উপর—আলখাল্লাটা গেছে ছিঁড়ে ; ঝুলিটাও শূন্য—কাঁধে নেহাত একটা ফালতো জিনিষের মত নড় নড় করে ঝুলছে। খঞ্জনী দুটো তালে-বেতালে বাজছে—টল টল কাঁপছে দেহ—বুজে আসছে করমচার মত লাল দুটো চোখ।

—দাঁড়াও।

—কেনে? একটু নেশা করেছি তাই অভিমান হয়েছে? কাজল গাঁয়ের কোন শালা করে না, যত বাবুরা সব কাবু হয়ে গেলো এতেই। আমি ত কীটস্য কীট। ঠাকুরের দাসানুদাস।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে যমুনা লোকটার দিকে চেয়ে। মাথায় আগুন জ্বলছে তার। এমনি করে মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে মাতাল হয়ে আসবে—বৈষ্ণব সমাজের পাপ ওই নিতাই।

—কথা বলছো না সখী ?

যমুনা গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিতাই দাওয়ার উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে বাজে বকছে,

—এত ক্রোধ হয়োনা মাইরী। নিতাই হয়ে দেখলাম ঠাকুরের কেরপা হ'ল না, এবার তাই জগাই মাধাই হবো ভাবছি।

. যমুনার চোখ ফেটে হুহু করে জল আসে। ওর জন্য সমবেদনায় নয়; নিজের জন্যই আসে অপরিসীম হতাশা—দুঃখ। জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে ওই একটা ভুলেই।

তখন নোতুন মন—নোতুন চোখ দিয়ে দেখেছিল নিতাইকে; অপরূপ এক স্বপ্ন গড়া মূর্তি—তাকে যেন পথ দেখাবার ইসারা আনে।

—যাবে তুমি ?

বৈরাগীতলার মেলায় এসেছিল যমুনা—সেখান থেকে কাজল গাঁয়ের পথে পা বাড়িয়েছিল কত আশা নিয়ে, মনে সেদিন ছিল অপরিসীম আনন্দ।...ভুল করেছিল সে।

নিতাইকে চিনতে পারে নি। আজ ক্রমশঃ অনুভব করছে সে ঠকেছে। এ সেই অপমান—বেদনার অশ্রু। অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে মানুষটা, যমুনা ওকে যেন দেখতে পারে না।

হরেরাম গিন্নী জাঁদরেল মহিলা, সহরের মধ্যে অত্যন্ত সুপরিচিত, যেমন প্রকাণ্ড দেহ—তেমনি বাজখাঁই গলা। ডাক নাম 'রায়বাঘিনী'। হরেরামবাবু কাজের লোক, হাঁকডাক কম করেন, কাজে তুখড়। কি করে ন'কড়া ছ'কড়ায় তেজারতি করে ডানে বাঁয়ে শূন্য বসিয়ে পাঁচশোকে পাঁচহাজারে পরিণত করা যায় তিনি ভালোই জানেন। কিন্তু হরেরাম গিন্নী পশ্চিমী ভূঁইহারদুহিতা, কাঠখোট্টা গড়ন—তেমনি তর্জন গর্জন। জামাই রাধাকিষণ তেওয়ারী কাজল গাঁয়ের অনেকদিনের কংগ্রেসকর্মী, শুধু তাই নয় সমাজে বেশ সুপরিচিত। মান খাতিরও আছে,—টুকটাক কারবার করে—সামান্য জমিদারীও আছে।

কিন্তু জামাইএর ওই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর বাতিকটাকে শাশুড়ী-ঠাকরুণ দুচোখে দেখতে পারে না। কয়েক বৎসর মামলা চলেছে সেই পুকুর ধারের মাঠখানা নিয়ে।

…ধর্মরাজ পুজোর পরেই সহরের ছেলেরা সেখানে খেলার মাঠ করে তুলেছে; দুদিকে গোলপোষ্ট পুঁতে যথারীতি ফুটবল পিটতে সুরু করেছে। ধমক-ধামক—তর্জন-গর্জনেও ফল হয় নি। দুচারদিন পড়ে থাকে মাঠটা, শূন্য-মাঠে গোলপোষ্টগুলোও উধাও হয়ে যায়; কয়েকদিন চুপচাপ। তারপরই আবার কে কখন পুঁতে ফেলেছে গোলপোষ্ট, সহরের অকর্মা ছেলের দল গালভরা নাম দিয়ে ফুটবল ক্লাব পত্তন করে খেলা সুরু করেছে আবার। এমনিই চলেছে ক'বৎসর। কথাটা গিন্নীর কানে উঠতেই সেদিন অনর্থ বাধে।

সকালবেলায় অনিমেষ গেছে হরেরামবাবুকে ইনজেক্শন দিতে, ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন তিনি।

সহরের দোকানপাট খুলতে সুরু হয়েছে। হরেরামবাবুর কাছারীবাড়ীতে কর্মচারীরা তখনও আসেনি; দেউড়ির পাশে দারোয়ানরা কুস্তির আখড়ায় কসরৎ করতে ব্যস্ত।

অনিমেষ চলেছে হরেরামবাবুর বসবার ঘরের দিকে। ভিতরের চত্বরের সামনেই উঠে গেছে দোতালার অন্দরমহলে যাবার প্রশস্ত সিঁড়ি। হঠাৎ কার আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে এদিক ওদিকে চাইতে থাকে; আর্তনাদ আসছে সিঁড়ির উপর থেকে; দেখা যায় হরেরামবাবু মুক্ত কচ্ছ অবস্থায় ভারি শরীর নিয়ে তড়বড় করে নামছেন—কাছাকোঁচা বেসামাল হয়ে গেছে। অস্ফুট আর্তনাদ করছেন তিনি প্রাণভয়ে—আর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নামছেন—বাবারে, ওরে বাবারে।…মেরে ফেল্লরে!

জমিদারবাবু আর্তনাদ করে নামছেন অসহায় মানুষের মত। চোখমুখ কপালে উঠে গেছে; পিছনে পিছনে তাড়া করে আসছেন হরেরামগিন্নী,—বিশাল দেহ থেকে শাড়ীখানা প্রায় খুলে পড়েছে; দুহাতে ধরে আশমানে তুলেছে একটা বঁটি; নাগালের মধ্যে স্বামীকে পেলেই বসাবে আর কি—হরেরামবাবু কোনরকমে চত্বরে পড়ে—উঠি কি মরি কি ছুটছেন। পিছনে পিছনে তখনও আসছে অর্দ্ধাঙ্গিনী বঁটি উঁচিয়ে। অনিমেষ চমকে ওঠে—হ্যাঁ-হ্যাঁ করেন কি? করেন কি?

…অতর্কিত বাধা পেয়ে হরেরাম গিন্নী রণে ক্ষ্যান্ত দিয়ে শাসিয়ে যায়—আচ্ছা, পরে দেখবো। কথাটি বলেছো কি তোমার একদিন কি আমার একদিন। চুপ করে থাকবে—মেনিমুখো মিনসে কোথাকার।

…বঁটিটা তুলে নিয়ে সদর্পে ভিতরে চলে গেল, অনিমেষকে থোড়াই পরোয়া করে সে ; হরেরামবাবু তখনও কাঁপছেন বলির পাঁঠার মত।

—এসময় ব্লাডপ্রেসার দেখে কি করবো, আমি এখন যাই।

ব্লাডপ্রেসারের রোগী, এমনি শাসানি চললে কোনদিন ধমকের চোটেই হার্টফেল করে বসবে। কাছারির তক্তপোষের উপর জাবেদা খাতার স্তূপের গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছেন হরেরামবাবু।

—বুকটা যে ধড়ফড় করছে ডাক্তারবাবু!

মনে মনে ভাবে অনিমেষ—বুক কি একা ওঁরই ধড়ফড় করছে, ডাক্তারেরও ওই চামুণ্ডা মূর্তির কল্পনা করে হাত ছাড়বার উপক্রম হয়েছে।

স্ত্রীর হয়ে ওকালতি করেন হরেরামবাবু—মাঝে মাঝে ওর মাথা বিগড়ে যায়, নইলে এমনিতে বেশ ভালমানুষ।

বারকোণার মাঠ। হরেরামবাবুদের পুকুরের পরই প্রশস্ত মাঠের এককোণে একটা পুরানো ছাতিম গাছ দাঁড়িয়ে আছে—তার চারপাশেই স্তূপ…ছোট বড় ইট—পোড়ামাটির টুকরো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ; মৌনমূক অতীতের নীরব ইতিহাস ওর অতলে সমাধিস্থ রয়েছে—মানুষের দিকে চেয়ে থাকে স্তব্ধতার আবরণে আবৃত করে। ওর অতলে কোন গোপন ইতিহাস সঞ্চিত রয়েছে। মদনবাবু একাই বের হয়েছেন বেড়াতে ; স্কুলের কাজকর্মও নেই, অখণ্ড অবসর ; হাতের ছড়িটা দিয়ে নরম মাটির বুকে আঁচড় কাটছেন।

আগের রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে—প্রবল বৃষ্টি ; স্তূপ থেকে বৃষ্টির জলধারা ছোট ছোট খাত সৃষ্টি করে আপন পথ করে নিয়ে নীচে নেমেছে—শূন্যগর্ভ খাতগুলোর আশেপাশে নরম মাটি জেগে রয়েছে। মদনবাবু স্তব্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন…সামনের দিকে এগিয়ে যাবার দিন ফুরিয়েছে তার ; মনের গতিশক্তি

আজ তবুও থমকে দাঁড়ায় নি। পিছিয়ে গেছে সে ইতিহাসের অতলে অনুসন্ধান করছে···শতাব্দীর পর শতাব্দীর মৌন ইতিহাস।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরাজয়ের পর—বৌদ্ধধর্ম এগিয়ে আসছে বিহারের সীমা অতিক্রম করে বাংলার দিকে। যাযাবর বৌদ্ধ ভিক্ষুক—শ্রমণের দল কাষায় বস্ত্র পরিধান করে—মুণ্ডিত মস্তকে ভিক্ষাপত্র হাতে ফিরছে বাংলার গ্রামপ্রান্তরে।

বৌদ্ধবিদ্বেষী জনতা গ্রাম থেকে বিতাড়িত করতে সুরু করেছে তাদের পিছনে কুকুর লেলিয়ে। না হয় পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু তারাই এখন প্রবল। কর্ণসুবর্ণের পরাক্রমশালী হিন্দুরাজা শশাঙ্কের রাজধানী হতে কাঁজল গাঁয়ের দূরত্ব তার মাত্র বারোমাইল। বৌদ্ধ নরপতি হর্ষবর্ধন এগিয়ে আসছেন।

হিন্দুধর্মের কঠিন জাতিভেদ—নিষ্প্রাণ যজ্ঞানুষ্ঠান আর 'মৎস্যন্যায়' নীতি সমাজের উচ্চকোটির মধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করছে, বাকী সমাজের বৃহত্তম অংশের অবস্থা ঠিক বর্তমানের মতই।

—কবি দুঃখ করেন।

> চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম।
> গণ্ডুপদার্থিমণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥

চালের খুঁটি নড়বড় করছে, বৃষ্টির জলে গলে গলে পড়ছে ঘরের দেওয়াল—চালে খড় নেই—বাতাসে উড়ে গেছে। কেঁচোর সন্ধানে ব্যস্ত ব্যাঙের দল আমার ঘর আকীর্ণ করে তুলেছে।

বৌদ্ধ শাসনেও তাদের দুঃখ ঘোচেনি; ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ গৌড় বিহার সাংঘারাম মঠ পরিবেষ্টিত হয়ে উঠেছিল; এইসময় বৌদ্ধধর্ম মূল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে শ্রমণশাসিত সংঘাশ্রিত ধর্মের বিকৃতরূপে পরিণত হয়েছিল। বাংলার সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম হিন্দুরাজাদের মাধ্যমে গড়ে শক্তি আহরণ করছিল; ক্রমশঃ ঠাঁই ঠাঁই তার বিক্ষোভ প্রকাশ সুরু হল। তারই শেষ পরিণতি···শশাংক এবং হর্ষবর্ধনের যুদ্ধ।

বাংলায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল সেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম; উত্তেজিত বুভুক্ষু নিপীড়িত জনতা বৌদ্ধবিহার—স্তূপ—সাঙ্ঘারাম ধ্বংসপর্ব সুরু করলো; তাদের ইট পাথরে তুলল দেবদেবীর মন্দির।···বারকোণা নামটাও যেন কেমন বিচিত্রতর ঠেকে—বারোকোণবিশিষ্ট কোনোদেউল। তারই ধ্বংসস্তূপ পড়ে রয়েছে এখানে।

কাজল গাঁয়ের বর্তমান জাগ্রত দেবতা রুদ্রদেবকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন মদনবাবু। শিব মহাদেব বলে যাকে পূজা করছে এরা—তিনি ভগবান তথাগতের পদ্মাসন মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নন, সেই করুণাঘন শান্তমূর্তি, দক্ষিণ পাণিতে মংগল আশ্বাস। লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম—সহজযান-বজ্রযান মতবাদ ক্রমশঃ হিন্দুধর্মের মধ্যে মিশে গেল। কোন ধর্ম এসে আশ্রয় নিয়েছে কোন ধর্মের মধ্যে।

…হঠাৎ লাঠির ডগে কি যেন শক্তমত ঠেকতে চমকে ওঠেন মদনবাবু—চেয়ে দেখেন বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে গেছে, একটা ময়লা মত কি বের হয়ে পড়েছে—লাঠিটা সেখানে আটকাচ্ছে।

চমকে উঠলেন তিনি।……কাদামাটির উপরই উবু হয়ে বসে লাঠির চাড দিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন সেটা; থর থর কাঁপছে তার সারা দেহ—কোথায় কি মহামূল্য সম্পদ তিনি হাতে পেয়েছেন।

…সাবধানে তুললেন—একটি মূর্তি; বেশ ভারি, কাদামাটি লেগে আছে! কালো কষ্টিপাথরের তৈরী—চারদিকে চেয়ে দেখতে থাকেন—কেউ লক্ষ্য করছে কিনা।…

দূরে ছেলেরা খেলায় মত্ত। আজ ওদের বাৎসরিক স্পোর্টস। রাধাকিরণ-বাবুর নেতৃত্বে ছেলেরা এসে জুটেছে—সহরের জনসাধারণও; মদনবাবুর দিকে লক্ষ্য করার চেয়েও বহুতর আকর্ষণীয় বস্তু সেখানে আছে। মদনবাবু মূর্তিটাকে বগলে নিয়ে আসছেন কাপড়-চোপড়—দুহাতে কাদা; মুখে চোখে কি একটা চাপা উত্তেজনা।

অকস্মাৎ কাজল গাঁয়ের গোপনতম অন্তরটি তিনি যেন স্পর্শ করে ফেলেছেন। দূর মাঠ থেকে ছেলেদের কোলাহল—গোলমাল শোনা যায়। চমকে ওঠেন মদনবাবু। হঠাৎ কি যেন গণ্ডগোল সুরু হয়েছে সেখানে। যাবেন নাকি! …পরক্ষণেই থেমে যান। মূর্তিটা যেন অলক্ষ্মী; মাটির নীচে হতে দিনের আলোয় দেখা দেবার সংগে সংগেই কাজল গাঁয়ের উপর অভিশাপ এনেছে। আনুক! …মদনবাবু আরও দেখবেন। তাঁর জীবনে অভিশাপ নোতুন করে কিছু আসবে না, আসুক ওরা যত পারে। একে ভালো করে দেখবেন তিনি।

…কাজল গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেছে। বারকোণার মাঠে ছেলেরা স্পোর্টস্ নিয়ে মেতেছিল, তার আগে হতেই হরেরাম গিন্নী তৈরী হয়েছিল। সকাল বেলায় স্বামীর সংগে ওই নিয়েই মতানৈক্য ঘটেছিল—তাই বঁটি হাতে তাড়া করেছিল স্বামীকে।

হরেরামবাবু স্ত্রীকে বলেন—ও নিয়ে একবার মামলা করেছি আর নয়, ও মাঠে ঘাসও হয় না ; কিই বা ওর দাম ?

গিন্নী ফোঁস করে ওঠে মৈন্যক পর্বতের মত—মানে ? অমনি ছেড়ে দোব ওই বারোদেউলের মাঠের মালিকানা সহরের অকর্মাদের হাতে ? আমি বেঁচে থাকতে নয়।

স্বামীর কথা না শুনেই গিন্নী সেজে উঠেছে আমার বাবার বাড়ীর এক একখানা করে ইট খুলে মোকদ্দমা চালাবো হাইকোর্ট অবধি। তবুও জমি ছাড়বো না।

ফরিদপুরের মুসলমান—গোয়ালা প্রজাদিকে খবর দিয়ে আনিয়ে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল।…বারোদেউলের একপাশে নদী, নদীর ধারে দলে দলে প্রজারা —সকাল থেকে এমনি সাধারণ বেশেই রান্না-বাড়া খাওয়া-দাওয়া করছে মাঠের দিকে সন্তর্পণী দৃষ্টি রেখে। সহরের ছেলেবুড়োর দল আসছে, কেউবা স্পোর্টসে অংশ নেবে কেউবা দর্শক, উৎসাহীর দল। হরেরামবাবুর জামাই রাধাকিষণ অন্যতম কর্মকর্তা।

বৈকালের দিকে হঠাৎ সুরু হয় ওদের অতর্কিত আক্রমণ, সামান্য কোন ছুতোয় নাতায়। নদীর ধারে আকন্দ কাশ ঝোপ থেকে লাঠি নিয়ে এসে চড়াও হল তারা। বাধা দিতে গেলেন রাধাকিষণবাবু।

…তার হাতেই পড়লো লাঠি—কব্জি ভেংগে গেল, বসন্ত উকিলের পিঠে কে বেদম এক ঘা বসিয়েছে—ছেলেদের অনেকেই কমবেশী আহত হ'ল। দর্শকের দল কে কোন দিকে পালাবে পথ পায় না।

…কয়েকমিনিটের মধ্যে মাঠ শূন্য হয়ে গেল ; ওদের কোলাহল—গণ্ডগোল আর্তনাদে ভরে ওঠে চারদিক। সন্ধ্যা নেমে এসেছে বারোদেউলের মাঠে। …ছিটিয়ে পড়ে আছে তাঁবুর ডাণ্ডা ; প্রাইজের জিনিষপত্র ছত্রাকার হয়ে। যেন ঝড় বয়ে গেছে মৃত্যুপুরীতে।

…সহর নিঝুম। ঝড়ের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে আহত-কৌতূহলী জনতা এসে ভিড় করেছে হাসপাতালের মাঠে।

…জমায়েত লোকজন…যেন কিছু একটা প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। হরেরামবাবু এবার ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছেন।

সেবার গাজন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দাঙ্গা এত মর্মে মর্মে বাজেনি জনসাধারণের। নেহাত দখলের ব্যাপারই ছিল। আজ সকলের মনেই জেগেছে সম্মানের প্রশ্ন। হরেরামবাবুর এই অত্যাচারের সমুচিত জবাব দিতে হবে।

হরেরামবাবু কাছারিতে বসে সব খবরই পেয়েছেন। বাঁ চোখটা 'একটু ছোট, ছেলেবেলায় বসন্তের আক্রমণে ওই চোখটা যেতে যেতে রয়ে গেছে—তবে এখনও কম দেখেন ওটাতে। শত্রুমহলে পরোক্ষে কেউ 'কানা' আখ্যাতেও ভূষিত করে।

…জনতা সন্ধ্যার পরই নগরসংকীর্তনে বের হয়েছে। এ এক বিচিত্র ধরনের সংকীর্তন। ছেলেরা—যুবকের দল—সহরের প্রবীণ উৎসাহীদের নিয়ে বের হয়েছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ—কারোও বাঁ হাত বাঁধা গলার সঙ্গে। অল্পবিস্তর আহত অনেকেই। সহরের পল্লীতে পল্লীতে কীর্তন করে জানান দিচ্ছে আজকের অত্যাচারের কথা। রাধাকিষণবাবুও দলে আছেন। তাদের চীৎকারে নীরব সহর জেগে উঠেছে,

—মেরেছে কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দোব না ?

ধুয়ো ধরে তালে বেতালে চীৎকার করছে ওরা, সেই সঙ্গে বেধড়ক নাচ।

কীর্তনের দল বের হয় পল্লীতে পল্লীতে। আজও বেরিয়েছে তারা। হরেরামবাবুর দেউড়িতে ঢুকলো দলটা ; কর্মচারীরা চেয়ে থাকে বিচিত্রদর্শন কীর্তনীয়াদের দিকে। সহরের ছেলে-যুবা গণমান্যব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছে।

হঠাৎ পিছন থেকে ধুয়া বদলে যায়, তারস্বরে কে গান ধরে,

—মেরেছে হরে কানা তাই বলে কি গাল দোব না ?

খোলকরতাল ধ্বনি আর ওই ধুয়ো ধরে উদ্দাম নাচ। হরেরামবাবু বেগতিক দেখে ঢুকে পড়েছেন ঘরের ভিতরে ; হঠাৎ দোতালার বারান্দায় গিন্নীর আবির্ভাব। বাজখাঁই গলায় চীৎকার করে,

—দারোয়ান, বের করে দাও এদিকে।

রাধাকিষণবাবু মধ্যস্থতা করবার চেষ্টা করেন। তাঁর অবস্থাটা করুণ। কার কথা কে শোনে?—ওরা সমানে চীৎকার করছে,

—মেরেছে হরি কানা
তাই বলে কি গাল দেব না?

…উপর থেকে বৃষ্টি নেমেছে গরম জলের। হরেরামগিন্নীর হুকুমে বাড়ীর ঝি-চাকরের দল বালতি বালতি গরম জল এনে পিচকারী দিয়ে ছুঁড়তে সুরু করেছে।

…জনতা বাধ্য হয়ে বের হয়ে এল, কিন্তু ওদের আক্রোশ যেন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে ওঠে।

বসন্ত লাহিড়ী স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল ওকালতনামা নিতে। সহরের জনসাধারণ এই প্রথম জানালো সামন্ততান্ত্রিক নীল রক্তের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিবাদ। সারা সহর ফুঁসছে রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত। বারোদেউলের মাঠের মালিকানা নিয়েই বাধলো বিরোধ।

রাত্রি নেমেছে কাজল গাঁয়ের আকাশে আকাশে। কলরবমুখর নবচেতনায় জাগর কোন অমারাত্রি!

ছোট ঘরের মধ্যে প্রদীপের ম্লান আভায় বসে আছেন মদনবাবু; টেবিলের উপর ধূপদানে জ্বলছে সুরভিত ধূপশিখা; বকুল গন্ধের সঙ্গে মিশেছে ওই চন্দন সৌরভ; সামনেই বসানো কালো কষ্টিপাথরে তৈরী সেই মহাকাল মূর্তি। নৃত্যরত পদযুগল—একপায়ে দলিত মথিত করেছে জগতের সমস্ত কলুষ কল্মষ; একদিকে তার সংহার—অন্য পদক্ষেপে বাজে সৃষ্টির নূপুর নিক্কণ; এক হাতে তার ধ্বংস—অন্য হাতে প্রশান্তিমাখা বরাভয়। গতিশীল জগতের ঊর্ধ্বে তার বিকশিত সত্তার প্রকাশ।

·· বাম মুখে ধ্বংস—দক্ষিণ মুখে শান্তির প্রসাদ।

লিখে চলেছেন মদনবাবু···হিন্দুধর্মের সমস্ত বিবেচনা—সহনশীলতা ত্যাগকে বৌদ্ধধর্ম মেনে নিতে পারেনি ; ধ্বংসের দামামা নির্ঘোষে যে মহাদূত আসে—সে অজেয় অমর। বৌদ্ধধর্ম তাকে জয় করতে চেয়েছিল, বন্দী করতে চেয়েছিল মহাকালকে, মহাকাশকে—মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। অসীমকে বাঁধতে চেয়েছিল সংঘের সীমায়।

···কিন্তু কালক্রমে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, হিন্দু-ধর্মের চিরপূজ্য মহাকাল—আজও অবিনশ্বর, যুগ-যুগান্তর পল অনুপল নিয়ে সমগ্র তার রূপ—সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সে বিশ্বজয়ী—কালজয়ী। সমস্ত জীবজগৎই কালকে বিধৃত করে বেঁচে আছে। চক্রমধ্যস্থ 'আরা'র মত কাল সর্ববিশ্বজগৎ ধারণ করে আছে ; জীবনমৃত্যু একে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত।

···কি এক স্তব্ধ গহন অনুভূতির স্পর্শে সমাধিস্থ হয়ে গেছেন তিনি। রাত্রির হিমস্পর্শ মাখা বাতাস জানলার ফাঁক দিয়ে এসে তার শ্বেতশুভ্র কেশপাশ ছুঁয়ে যায়—যেন কৃপণ ধরিত্রী তার ব্যর্থ বঞ্চিত সন্তানকে হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে আনমনে—সর্বদেহে তাই আনে কল্যাণ স্পর্শ।

যমুনা সেদিন কি কাজে বের হয়েছে ; আশ্রমে ফিরতে বেলা দুপুর হয়ে যায়। বাগানের বাইরে কাদের কোলাহল—হৈ-চৈ শুনে থমকে দাঁড়াল। নিতাই এখন মেতে উঠেছে। ছেলেবেলায় বংশের ভাবও পাঁচজনের মতই সে ভেক নিয়েছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের পথে প্রান্তরে ঘুরে মেলায়—বৈষ্ণবসমাজে মিশেছিল, নামগান করছে আর ভেক নিয়ে হরিধ্বনি করে ফিরছে। পথেই একদিন দেখা পায় যমুনার। হঠাৎ পথের দেখা সেই যমুনা কেমন যেন আপন হয়ে গেল ; দুজনের পথ এক হয়ে এসে মিলল কাজল গাঁয়ের সীমান্তে এই ছায়াঘেরা বন-কুঞ্জে নিতাই কি এক নেশার ঘোরে মেতে ছিল যমুনাকে পেয়ে। ভেবেছিল এই শান্ত পরিবেশে কুজনঘেরা বনসীমাতেই তাদের সীমানা। অন্যজীবনকে সে চেনেনি।

হঠাৎ গঙ্গামণির বিশুয়া সর্দারকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছে। বেপরোয়া মাদকতাময় জীবনকে।···উদ্দাম স্রোতমুখর এ জীবন ; তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কামনা

জাগায় ওই পানীয়—মন নেচে ওঠে। বন্ধ চৌখুপি ঘরে আটকানো মন আজ সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

তালের তাড়ির হাড়িটা ভরে উঠেছে গাঁজলায়; সাদা ফেনার স্তূপ উপচে উঠেছে কানা বেয়ে; দু'একটা বড় ডাঁশ মাছি ভন ভন করছে ওর চারি পাশে, গামছার খুঁটে নামানো চাল কলাই ভাজা। নিতাই বিশু মটর অপিসের ক্লিনার হরিপদ আরও কারা জুটেছে নিভৃতে—ছায়াঘেরা এই ঠাঁইটুকুতে, বেশ নিরিবিলিতে জমেছে ওদের আড্ডা। প্রায়ই জমে।

হরিপদ বলে ওঠে—ওসব ভেক-ফেক ছেড়ে চলে এসো আমাদের নাইনে, কাঁচা পয়সা। দুট্রিপ মারতে পারলেই মোটা রোডসাইড। খাও দাও ফূর্তি-আর্তি করো।

বিশে সায় দেয়—ঠিকতো, তা লইলে খঞ্জনি বাজিয়ে কি মরদে ভিক্ষে করে? তোমার আবার ভাবনা কি? মদ মাংস খাও, ওই ডবকা ছুঁড়িটা আছে, সহরের বাবুরা তো মরে যায়নি, মানে,—

বাকী কথাটা শেষ না করে চোখ টিপেই ইসারায় জানিয়ে দিল বক্তব্যটা। নিতাইও বোঝে এটা। গঙ্গামণির ওখানে দেখেছে বাবুদের গতায়ত, মোটা পয়সা দেয়। যমুনার মত মেয়ের দাম কি তাও বোঝে সে।

এই জীবনে তার ক্লান্তি এসে গেছে। সুস্থ কর্মক্ষম মানুষ; আরও পাঁচজনের মত কাজ করতে মন চায়, এমনি নিস্পৃহ হয়ে বসে থাকতে পারে না। কাজল গাঁয়ের চলমান ব্যস্ত জীবনযাত্রার গতিপথে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়।

আধ্যাত্মিকতা তার মন চায়নি, মনের কামনাও মেটেনি কোনদিন, আরও পাঁচজনের দেখাদেখি ওপথে গিয়েছিল। কিন্তু অর্থের আকাঙ্ক্ষা—ভোগের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে; সহর-জীবনের বিষাক্ত নিঃশ্বাস তার মনের শান্তিকে ছারখার করে দিয়েছে। মন আজ পরের মুষ্টিভিক্ষায় জীবন ধারণ করতে নারাজ।

...হরিপদ বলে চলে—কালই শালা পাঁচ টাকা উপরি কামাই; তিনে ড্রাইভারকে ঠেকোলাম দুটাকা, বাকী তিনটাকা আমার, খা কেন্নে কত খাবি। তাড়ির খরচ—মুড়ি কড়াইভাজা সবই আজ সে জুগিয়েছে। নিতাইএর পেটে

পড়ছে ওই ঝাঁঝালো পানীয় ; ফেনার বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে নাড়ীতে-তন্ত্রীতে। সমস্ত মন কেঁপে উঠছে রুদ্ধ কামনায়। বলে ওঠে,

—তাই ভাল হে ; তোমরা আছো বেশ।

হাসতে থাকে নিজের সৌভাগ্যে হরিপদ আর বিশু। দুচোখ বুজে আসছে নিতাইএর ; দুপুরের বাতাস নদীর জল পার হয়ে বনে ঢুকে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ; ঝির ঝির করে বইছে নারকেল গাছের পাতায়।

ভর···ভর···ভর···! সবেগে চলেছে গাড়ীখানা।

পুরন্দরপুর, পুরন্দরপুর! ঘণ্টা বাজছে ; রাস্তার দুপাশের গাছগুলো সরে যাচ্ছে শোঁ শোঁ শব্দে পিছনের দিকে। ধুলো উড়িয়ে অন্ধকার করে চলেছে গাড়ীখানা। প্যাসেঞ্জাররা গুড়ের নাগরীর মত গাদাগাদি করে চলেছে। বাতাসে উঠছে পেট্রলের পোড়া গন্ধ ; ঝকঝকে টাকা সিকি দুয়ানি আসছে হাতে। কাঁধে ঝোলান রয়েছে ব্যাগটা।

—গোকর্ণ বারো আনা, এক পয়সা কমতি হবে না বাবা, কোম্পানীর রেট বাঁধা।

বারো আনা পয়সা পকেটেই ঢুকলো।

রামজোলার খাঁখাঁ মাঠের বুকচিরে চলে গেছে রাস্তাটা। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে শেষ ট্রিপ আসছে ; রাতের বেলায় ও পথে কোন গাড়ী চলে না ; কে জানে—যা খারাপ রাস্তা আর যে সব ঝড়ঝড়ে গাড়ী ; খারাপ হতে দেরী হবে না ; আর তাহলেই বিপদ। ডাকাতের দল ধনে-প্রাণে শেষ করে যাবে। ইতিপূর্বে এ ঘটনা ঘটেছেও।

রামজোলার মাঠে এম্নি দুপুরবেলাতেও ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে।···চলেছে গাড়ী ; রামজোলার মাঠই যেন কাজল গাঁ আর সদর সহরের মধ্যে কি এক ভীষণতার ব্যবধান গড়ে তুলেছে—তার ওপারেই হাটপাড়া। ছোট কয়েক ঘর বসতি ; নুইয়ে পড়েছে নীচু খড়ের চাল। বসতির মধ্যে একটা গাছ বলতে নেই। মাঠের মধ্যে তির্যক রোদে নুইয়ে পড়ে ক্লান্ত কুকুরের মত ধুঁকছে বসতিটা। ওরাই ঘর ঘর ডাকাত। কালো মিশমিশে চেহারা ; দিনের বেলায় ওদের একমূর্তি —রাতের অন্ধকারে ওরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাত।

···রামজোলার মাঠের মত অজানা রহস্য ওদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

—বহরমপুর—আটআনা।!

উঠেছে পাটের দালাল—তরকারীর পাইকের; ফেরিওয়ালার দল। সহরের সংক্রমণ সুরু হয়েছে। ঘোমটার আড়াল থেকে একটি সিঁদুর পরা মুখ, কালো ডাগর চাহনি মেলে চেয়ে রয়েছে তার দিকে ভীরু সলাজ চাহনিতে। ও যেন তার খুব চেনা।

—এ্যাই!···এ্যাই শুনছো?

···স্বপ্নঘোর কেটে যায় নিতাইএর। কোথায় বা বাস—কেইবা তার কনডাক-টার; কোথায় বাসে সেই সিঁদুর পরা মেয়ের কালো ডাগর দুটো চোখের চাহনি। নিস্তব্ধ বনভূমিতে গাছতলায় পড়ে আছে সে। হরিপদ কখন চলে গেছে। তারা পাকা খানেওয়ালা, দিব্যি সামলে নিয়ে উঠে গেছে; পড়ে আছে বেঘোর হয়ে নিতাই, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছিল—কখন গড়িয়ে পড়ে গেছে মাটিতে; ডালপাতার ফাঁক দিয়ে মুখে এসে পড়েছে রোদের আভা। ওদিকে কাৎ হয়ে পড়ে আছে হাঁড়িটা—দুর্গন্ধে জায়গাটা ভরপুর: একটা কাক কানার উপর বসে ভিতরে ঠোঁট ঢুকিয়ে ওর স্বাদ নেবার চেষ্টা করছে।

যমুনার ডাকে চমক ভাঙ্গল নিতাইএর। যমুনা দেখেশুনে অবাক হয়ে গেছে। ঘৃণায় রি রি করছে সারামন। আশ্রমের পবিত্রতা কোন দিকে মুছে গেছে; ধূপধুনো-মালতী ফুলের সৌরভ ছাপিয়ে উঠছে ওই গেঁজে-ওঠা তাড়ির বিষাক্ত দুর্গন্ধ। যমুনার সব শুচিতা যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

—কি বলছিস মাইরি? বেশ ছিলাম—খামোখাই হাঁক-ডাক।

করমচার মত লাল চোখদুটো আবার বুজে আসে—কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বাঁ হাত দিয়ে মুখের উপর উড়ন্ত মাছিটাকে তাড়াবার চেষ্টা করে।

—ধ্যাৎ!

···যমুনা ঘৃণাভরে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। আগেকার সেই লোক এ যেন নয়; নিতাইএর সুন্দর প্রশস্ত ললাট—মিঠে সুরেলা কণ্ঠস্বর; রসকলি কাটা টিকলো নাক—সব মিলে কি এক সুন্দর মূর্তি মনে পড়ে! দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল যমুনা।··· পথে ঘুরতে ঘুরতে এসে পেঁৗছেছিল কাজল গাঁয়ের সীমান্তে! এই বনভূমিতে

সেদিন নেমেছিল বসন্ত—আমের গাছে গাছে মধুক্ষরা যৌবন : বাতাসে বাতাসে পাখীর কাকলি, কাজল গাঁয়ের নদীর গহিন জলে কি যেন নিবিড় মায়া। যমুনাই বলেছিল,

—এইখানেই বসি বাবাজী! কুঞ্জবনের মত সোন্দর মনোরম ঠাঁই। থাকলে ও হয়।

বলেছিল সেদিন নিতাই—সহরের আশপাশে থাকিস্ না যমুনা ; ওর নিঃশ্বাসে বিষ আছে ; পথ ভুলিয়ে দেবে কুনদিন।

হাসে যমুনা—না গো না। পথের মানুষ যদি ঠিক থাকে—পথ কি কোনদিন ভোলা যায় ?

সে আজ কয়েক বছর আগেকার কথা : পথের মানুষ যে এমনি করে পথ হারাবে জানতে পারে নি ঘুণাক্ষরে।

—ঘরে চল।···হাতটা ধরে টেনে বসাবার চেষ্টা করে যমুনা।

—এ্যাও! গর্জন করে আবার পাশ ফিরে শুলো নিতাই।

···চোখের সামনে ভেসে ওঠে উপবাসের দিনগুলো। সেদিনও কেটেছে জলকচুর শ কসিদ্ধ খেয়ে—আজও সেই অবস্থা!···অভাব সহ্য করার অভ্যাস তার আছে। অভাবকে ভয় করে না সে। আজ যেন অজানা আতঙ্ক তার মন ছেয়ে ফেলেছে। ওদিকে পড়ে আছে নিতাইএর অচেতন দেহটা—ও যেন মূর্তিমান কোন ধ্বংসস্তূপ।···তারই পাশে স্তব্ধদৃষ্টিতে বসে আছে যমুনা।

···খাবার ইচ্ছে নেই, কলসী থেকে জল গড়িয়ে খেতে যাবে—তাও নেই। শূন্যগর্ভ কলসীটা পড়ে আছে। যেটুকু ছিল ওরাই হয়তো শেষ করেছে।

দাওয়াতে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে যমুনা। তার সব চেষ্টা—সাধ—স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে আসছে ; অন্তহীন অতলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। আজ সে একা। দুচোখ ঠেলে কান্না আসে তার।

···কি এক স্বপ্নময় দেশ। একা চলেছে যমুনা—পাখী ডাকা—নদীর ছায়াতট ; কে যেন দূরে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ; আকাশে আকাশে জাফরানী রংএর মেঘের দল—লালনেশায় ভরে তুলেছে দিগন্ত। কে ডাকে—ঠিক চিনতে পারে না। তবু ব্যাকুল সে ডাক! নিতাই সে নয়। সে যেন অন্য কোন জন।···চলেছে যমুনা সেই দিকে।

…হঠাৎ যেন কেমন ঘুম ভেঙে গেল। অবচেতন মনে সেই ডাক তখনও বাজছে? আশ্রমের নেমেছে অপরাহ্ন বেলা। সোনালী রোদ মিষ্টি পরশ এনেছে মাধবীলতার বনে ; গুন গুন করে উড়ছে কয়েকটা ভ্রমর।

—খুব যে ঘুমোচ্ছো?

…গায়ের কাপড়খানা তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিল যমুনা ; অসাড়ে ঘুমুচ্ছিল গায়ে মাথায় কাপড় নেই ; অফুরন্ত ব্যর্থ যৌবন বিদায়ী অপরাহ্ন বেলায় যেন রোদনভরা আহ্বান আনে ফটিকের কাছে।

—ছোটবাবু!

ফটিক স্তব্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে ; শিথিল কেশপাশ বাঁধছে দুহাত পিছনে দিয়ে—এ কোন সম্মোহিনী নারী ; বাজারে সেই ওদের মত নেশা করা চোখে মাতন আনে না ; সুস্থ স্বাভাবিক মনে বিচিত্র এক সুরের স্পর্শ আনে—সব ভুলে যাবার ডাক। যমুনার ক্লান্ত মলিন মুখে হাসির আভা।

উত্তর দেয় ফটিক—কেন আসতে নেই? নিতাই কোথায়?

…বাগানের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখালো—তখনও পড়ে আছে নিতাই সেই অবস্থায়।

—মানুষে নেশা করে কেন বলতো ছোটবাবু? কিসের দুঃখে এমন হয়?

…যমুনার কথায় যেন বেদনা ঝরে পড়ে ; যমুনা নিঃশেষে ভালবেসেছিল ওকে, সে ভালবাসার কোথাও কোন ফাঁক ফাঁকি ছিল না, তবে কেন ও সরে যাচ্ছে তার কাছ হতে!

…কথার জবাব দেয় না ফটিক ; চেয়ে থাকে যমুনার ব্যথাক্লিষ্ট মুখের দিকে।

—খেয়েছো আজ?

—হ্যাঁ, নদীর জল আর গাছের পাকা বেল, সে জুটে গেছে।

…নিতাই এর চেতনা ফিরে আসছে। তখনও চোখের সামনে ভেসে রয়েছে পেট্রলের গন্ধভরা বাতাস - ক্রমঅপসৃয়মান ছায়াজগৎ—তার পরনে লাল শাড়ী, কপালে সিন্দুর—কার ডাগর চোখের চাহনি।

…ওদের কথাবার্ত্তার শব্দ কানে আসে ; বৈকালের আবছায়ান আলোছায়া কাঁপছে নদীর জলে। যমুনা কাকে বলে চলেছে,

—ভালবাসলেই দুঃখ পায় গো, লইলে উর জন্য আবার দুঃখ পাবার আছে কি ? পথের মানুষ বইতো নয়।…তবু মন কাঁদে।

…একটু বিস্মিত হয় নিতাই ; যমুনার দিকে চাইতেই অবাক হয়ে যায়—ছোটবাবু বসে রয়েছে। তাকেই শোনান হচ্ছে কথাগুলো।…দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে সারা মন। তাকে মাতাল বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে—বেশ রাসলীলা সুরু করেছে। মাথার মধ্যে কি যেন সব ঘুরপাক খাচ্ছে।

—মাইরী, বেশ জমেছিস্‌ তো ?

…চমকে ওঠে যমুনা ; সামনেই দেখে নিতাই খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পা দুটো টলছে, চোখ লাল টক্‌টকে—সারা গায়ে বিশ্রী টক্‌ টক্‌ গন্ধ, গায়ে মাথার চুলে বালি জমাট বেঁধে রয়েছে। হাড়পিত্তি জ্বলে ওঠে যমুনার।

—জমেছিই তো। একশোবার জমবো। তোর কি ? লজ্জা লাগে না ? জাত বোষ্টম হয়ে তোর এই কাজ ?

জড়িত কণ্ঠে হাসছে নিতাই—বোষ্টম ! তুই যেমন বোষ্টমী—আমিও বাবা তেমনি বোষ্টম। কাঠে কাঠ। এ যে রাধাকেষ্টর রাসলীলা হচ্ছে কুঞ্জে—আমি তো বাবা আয়ান ঘোষ।

উঠে দাঁড়ালো যমুনা—যাবি ? না ঝেঁটিয়ে তোর নেশার ঘোর ছুটোতে হবে ?

আচ্ছা।

সরে গেল নিতাই ; যমুনা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—ফটিকবাবু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে।

হঠাৎ বলে ওঠে যমুনা—তুমি যাও ছোটবাবু, এখানে এসো না। দোহাই তোমার—আমার বরাতে যা আছে হবার হোক—তোমরা দয়া করতে এসো না।

—যমুনা ?…এগিয়ে আসে ফটিক।

যমুনা কান্নায় ভেঙে পড়ে—যাও, যাও বলছি। দুটি পায়ে পড়ি তোমার।

নীরবে উঠে গেল ফটিক ; যমুনা অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ছুটির দিন মনীষা বের হয়ে পড়ে সহরে ; কাজল গাঁয়ের অন্ধিসন্ধি জানতে চায় সে। দূর থেকে প্রথম সে কাজল গাঁকে দেখেছিল সবুজ গাছে ঢাকা

একটি দীর্ঘরেখার মত—দৃষ্টিপথের একোণ থেকে সে কোণ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে মাথাতুলে রয়েছে নারকেল তালগাছের প্রহরা; রৌদ্রতপ্ত আকাশের নীচে হামাগুড়ি মেরে পড়ে আছে ক্লান্ত জনপদ।

…এ্যাসফ্যাল্ট—টারম্যাকাডম্‌এর মুখ দেখেনি কাজল গাঁ; ধূলিধূসর রাস্তাগুলোয়…হাঁটু ডুবে যায়, বর্ষাকালে সহরের মধ্যে ছোটবড় অনেক রাস্তা দুর্গম হয়ে ওঠে—হাঁটু ভোর কাদায়; কোথাও বা কারো পানা ডোবা এসে চুবিয়ে দিয়েছে রাস্তাকে।

কোথায় ছায়াঘন বাঁশবন এসে অধিকার করছে রাস্তাটুকুকে…চারিপাশে তার কালকাসিন্দের ঘন জঙ্গল,—কোনখানে দাঁড়িয়ে আছে ঘনসবুজ চালতে গাছ—কোথাও ভুতুড়ে কালো গাবগাছের জটলা; বর্ষার জল পেয়ে রাস্তার আশেপাশেই গজিয়ে উঠেছে জেলকচুর গাছ। হলদে ফুলগুলো সবুজ রংএর মেলায় ঘন হলুদের রোশনী তুলে আদিমতর করে তুলেছে বনছায়াকে,…গলা ফুলিয়ে সপরিবারে ব্যাঙের দল ডাক ছাড়তে সুরু করে ভাংগা ধসে-পড়া মাটির দেওয়ালের ওদিকে, সবংশে কেউ বা মরে গেছে—ভিটেপুরী হচ্ছে জায়গাটা; নয়ত বা কেউ চলে গেছে দূর দূরান্তরে রুজিরোজকারের চেষ্টায়—জন্মভূমির শেষ সীমানার দেওয়াল ভেংগে পড়েছে—সীমা আজ অসীমে মিলেছে। নির্জন রাস্তা জুড়ে নেমে আসে স্তব্ধতা—ওপাশের ডোবায় ফুটেছে কচুরী পানার দামে বেগুনী রংএর ফুলগুলো; তারই এককোণে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে—একটা কাচভাংগা কেরোসিন আলোর লাইট পোষ্ট। কোনদিন কোনকালে হয়তো আলো জ্বলতো; আজ পোষ্টটাই হেলে পড়ে টিকে আছে। মিউনিসিপ্যালিটির খাতায় এখনও তেলের যথারীতি বরাদ্দটুকু আছে—তবে আলো আর জ্বলে না—এ নিয়ে অভি-যোগও করে না কেউ। সব পরিবেশটুকুই এর নিছক গ্রাম্য—এখানের ধ্যানভংগ করেছে ওই লাইটপোষ্টটা। এখানে একেবারেই বেমানান।

মনীষা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে…এ কোন পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ; আপনার স্বপ্ন নিয়ে আপনিই বিভোর, কাজল গাঁয়ের এই আদিরূপ…নিজস্ব স্বরূপ। কিন্তু কালের বিবর্তনের সংগে সংগে এর পরিবর্তন ঘটছে; এর বাহ্যিক আন্তরিক সত্তা—ভেংগে গড়ে উঠেছে নোতুন রূপ।

…কাছারী পাড়া—মোহনবাগান মাঠ—নদীর ধার ধরে সুরু হয়েছে নোতুন সহরের পত্তন। ফাঁকা খোলামেলা জায়গায় গড়ে উঠছে নোতুন ছাঁদে নোতুন বাড়ী! নোতুন মানুষ—আসছে যুগের সঙ্গে সঙ্গে। কাজল গাঁয়ের আদিম শান্তিময় জীবনের তাই সব সংস্কার—রীতিনীতি শ্লথ হয়ে উঠেছে।…মেয়েদের স্কুল ভালই চলছে; ওদিকের পথেঘাটে দেখা যায় জুতো পরে আধুনিকার দল বই বগলে স্কুলে যায়, এলো চুলের প্রান্তে গিঁট বেঁধেছে মাত্র। প্রবীণাদের অনেকেই নদীতে স্নান করতে গিয়ে চেয়ে থাকে ওদের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত চাহনিতে। ফোড়নও কাটে,

—কালে কালে হলো কি দিদি?

দিদি প্রথম থেকেই এটা পছন্দ করে না; নদীতীরে বাঁধানো অশ্বত্থগাছের মূলে চোখ বুঁজে জল দিচ্ছিল—বিড় বিড় করছিল মনে মনে। রসালো কথা শুনে ফিরে চাইল—তা যা বলেছো? দেখেশুনে লজ্জায় মরে যাই। আর হবে নাই বা কেন? ওই মাস্টারনী ছুঁড়িটাকে দেখেছো? রূপের দেমাকেই গেল।

বোন কানে আংগুল দিয়ে যেন লজ্জায় নদীর জলে ডুবতে যাচ্ছিল—বলে ওঠে,

—ছাই রূপ। বলে না—

অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর
অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।

কথাটা বলার কারণ আছে। মনীষা সহরের পথে একলাই ঘুরে বেড়ায়।…মঞ্জুদের বাড়ীতে আসে বৈকালে—মঞ্জুকে পড়ানোর অনুরোধ এড়াতে পারেনি। তাছাড়া কি এক নিবিড় কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে সহরের আদিম এবং বর্তমান রূপ। পুরাতন যুগ যাচ্ছে—আসছে নোতুন দিন।

…নদীর ধারে খোয়াঢালা নোতুন রাস্তা সুরু হয়েছে; সদ্য আমদানী করা স্টিমরোলার ঘিরে দাঁড়িয়েছে কৌতূহলী ছেলের দল; রেলগাড়ী অনেকেই দেখেনি; ধোঁয়া বের হচ্ছে—বাঁশী বাজছে—এই তাদের কাছে পরম বিস্ময়। কে যেন বলে,

—গংগাস্নান করতে গিয়ে সহরে দেখেছিলাম রেলগাড়ী, এর চেয়ে ঢের বড়ো।
কে একজন ধমক দিয়ে ওঠে—ছাই! দেখছিস কি জোর বাঁশী বাজে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরছে অনিমেষ। দূরে কোন গ্রামে ডাকে যেতে হয়েছিল। রোদে তেতে পুড়ে উঠেছে, ধুলো জমেছে মাথার চুলে—প্যাণ্টে। সাইকেলটা ঠেলে ঢুকেই অবাক হয়ে যায়।

—আপনি ?

মনীষা এগিয়ে আসে। সদ্য স্নান সেরে উঠেছে। পরনে চাঁপা রংএর শাড়ী, মাথার একরাশ চুলে একটা গিঁট বাঁধা। স্নান সুবাসে ভরে উঠেছে চারপাশ। হাসছে মনীষা ওর দিকে চেয়ে। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে অনিমেষ।

—এই যাঃ। একেবারে ভুলে গেছলাম। যাক এসেছেন—ওরে রামহরি—

—থাক, আর হাঁকডাক করতে হবে না। ওরা খেয়ে-দেয়ে একটু জিরোচ্ছে। বেশ লোক যা হোক, নেমতন্ন করে এমনি ভুলে বসে থাকেন ?

—একটা জরুরী কেসে ডাকে যেতে হল।

—থাক, আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। স্নান করে আসুন। সব তৈরী হয়ে গেছে।

…অনিমেষ এর স্বাদ যেন বহুদিন পায় নি। তৃপ্তি ভরে খেতে থাকে। মনীষাও বসেছে। সব কিছুই যেন অপরূপ লাগে তার। মনীষার সহজ সাবলীল ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করেছে।

—নিন, এত মাছ কে খাবে ?

ওর দিকে মাছের বাটিটা এগিয়ে দেয়।

—কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানি না ; বেশ খেলাম কিন্তু।

কথা বললো না মনীষা। তারও মনে কেমন তৃপ্তির সুর। বিচিত্র জীবন পথের বাঁকে এমনি অমৃত সঞ্চয় রেখেছিল জানেনা সে। নিজেও তৃপ্ত হয়েছে।

এ যেন অনিমেষ স্বপ্ন দেখছে। খাওয়া-দাওয়ার পর ডেকচেয়ারে বসে রয়েছে, নির্জন বাগানে কোথায় পাখী ডাকছে, নদীর ধারে জাবর কাটছে গরুর পাল ; সবুজ বনসীমা গাঢ় স্তব্ধতা বুকে নিয়ে কোন অসীমে মুছে গেছে। জেগে আছে সে আর মনীষা। বিচিত্র এক স্বপ্ন অনুভূতি।

—মনীষা !

…চমকে ওঠে সে। মুখ তুলে চাইল নীরব চাহনিতে। কালো তারায় ওই বনভূমির নিবিড় স্তব্ধতা। অনিমেষ ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। একখানা হাত তুলে নেয় হাতে ; কি যেন তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে,

মনীষা তার ডাকে সাড়া দিয়েছে। পথ খুঁজে এসেছে কাজল গাঁয়ে ; মনীষা স্তব্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে—কি যেন বলতে চায় অনিমেষ ; শোনবার জন্য কান পেতে আছে সে উৎকর্ণ হয়ে। সারা মন চায় কি যেন নিবিড় সান্নিধ্যে।

অভ্র রোদ গেরুয়া হয়ে আছে—ক্লান্ত পাখী মুখর হয়ে উঠেছে আমবাগানে ; আবার জেগে উঠেছে আকাশবনানী।

—চলি! উঠলো মনীষা।

…অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—মধ্যাহ্ন, স্বপ্নবিধুর ক'টি প্রহর শেষ হয়ে গেল। মনীষা নীরবে চলে গেল—বাগান পার হয়ে। আবার নেমে আসে সেই অস্তিত্বহীন স্তব্ধতা—অনিমেষকে ঘিরে। কি যেন বলা হোল না তার—না বলাই রয়ে গেল।

সরমা এখন নিজের হাতে কর্তৃত্ব নেবার চেষ্টা করছে সবদিক থেকেই। সেইই স্লিপ পাঠিয়ে টাকা আনে—যথেচ্ছভাবে খরচ-খরচা করে চলেছে। চক্রবর্তীমশায় অপিসে বসে স্লিপগুলো হিসাব করে—একটু হাসে মনে মনে।

—ওহে মদন তৈরিজ কষে রেখে দাও স্লিপগুলো, টাকাকড়ির হিসাব যেন গড়বড় না হয়। ও বদনাম সইতে পারবো না—তাও মেয়েছেলের কাছে।

মদন ও রেণুবাবুকে এ হিসাবের খাতা দেখতে দেয় না। নিজেই রাখছে সব কাগজপত্র। রেণুপদ মনে মনে ব্যাপারটা দেখে শিউরে ওঠে। কিছুদিন থেকে ও পাড়ার বৃন্দাবন সাঁপুইও এসে জুটছে মাঝে মাঝে এ বাড়ীতে। বুড়ো-বাঁদরের মত চেহারাখানা, রোদে জলে পেকে উঠেছে ; বারোমাসই গলাবন্ধ কোটের উপর চাদর চাপিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সহরের সর্বত্রই তার অবাধ গতি ; দালালি, বিয়ের ঘটকালি থেকে সুরু করে চাষের বলদ কেনা-বেচাও করে মাঝে মাঝে।

বৃন্দাবন সাঁপুই এখন ঠিক সময় খুঁজে নিয়েছে। ইতিপূর্বে দু'একদিন রমণবাবুর বাড়ী গিয়েছিল সকালের দিকে ; লোকটাকে চেনে মঞ্জু ; শয়তানের মত চেহারা।

— কাকে চাই ?

বৃন্দাবন নিবিষ্টভাবে নিরীক্ষণ করছে মঞ্জুকে, পাকা হিসেবী লোক। মানুষ দেখেই চিনতে পারে। এ মেয়ের কাছে জল গলবে না। বলে ওঠে,

—মাঠান ডেকেছিলেন।

—ও!

মঞ্জু আবার পড়ায় মন দেয়, কিন্তু লোকটার ধূর্ত চাহনির কথা ভুলতে পারে না। আড়চোখে দেখে দাওয়ায় আসনের উপর বসে বৃন্দাবন কোটের পকেট থেকে কি সব ঠিকুজী কুষ্টি বের করছে। গলগল করে বকে চলেছে হাতমুখ নেড়ে—পাকা অভিনেতার মত। কি যেন অসহ্য ঠেকে ওই মানুষটাকে। ও চলে যাবার পরই মঞ্জু জিজ্ঞাসা করে—কেও ?

সরমা মনে মনে কি আঁচ করছিল; মেয়ে পার করা দরকার। নইলে তার স্বাধীনতায় মেয়েই হাত দেবে, মেয়ের শাসন মেনে চলতে হবে তাকে। ব্যবস্থাও ঠিক করে এনেছে বৃন্দাবন; পাত্র ম্যাট্রিক পাশ—ঘরে ধানজমি আছে, নৈকষ্যকুলীন।

ফুলে মেল—গদাধরের সন্তান। অর্থাৎ কুল কৌলীন্য মর্যাদা কোন দিকেই কম নয়; কমতি একটু পয়সার দিকেই, তবে একমাত্র মেয়ে তাঁর, সহরের বাড়ী—গাড়ী, ব্যবসা সবই তাকে অর্শাবে, সুতরাং পয়সার সমস্যাও মিটবে—তাছাড়া তার জামাইও দেখাশোনা করতে পারবে তাদের।

মেয়ের কথায় সরমা বাধা পায়; বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে,

—সে খবরে তোর কি দরকার ? কে এল-গেল তোর তাতে কি ?

মঞ্জু বলে ওঠে—তোমার ঘটে বুদ্ধিসুদ্ধি কম, লোকে ঠকাবেই তোমাকে। ওই লোকটিকে আমি চিনি, বিশেষ সুবিধার নয়।

সরমা থামিয়ে দেয় মেয়েকে—সে আমি বুঝবো। আমার পেটে তুই হয়েছিস না আমি হয়েছি তোর পেটে ? আমাকে বুদ্ধি দিতে আসিস না বুঝলি ? সব বুঝি আমি—তোমার গুণের কাহিনীও কানে আসে।

মঞ্জুর চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে; সারা দেহে জ্বালা ধরে মায়ের কথায়; স্তব্ধদৃষ্টিতে মায়ের দিকে চেয়ে থাকে। সরমা মেয়ের ক্রুদ্ধদৃষ্টির সামনেও মাথা

তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করে—কিন্তু কেন জানে না নিজেই মাথা নুইয়ে সরে গেল নীরবে। গজগজ করে—যার জন্য চুরি করি—সেই বলে চোর।

তারপর হতে মঞ্জু আর বৃন্দাবন সাঁপুইকে এ বাড়ীতে দেখেনি। মনে মনে খুসীই হয়েছে। সাঁপুই মশায় এত কাঁচা লোক নয়। মঞ্জু স্কুলে যাবার পরই ধীরে ধীরে এসে ঢোকে।

বৃন্দাবন সাঁপুই সেদিন দাওয়ায় না বসে আসন নিয়েছে বাইরের ঘরে; সঙ্গে একটি লোক, বয়স যৌবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে পেঁাছেছে: পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাতে যাবে, হাঁ হাঁ করে ওঠে বৃন্দাবন।

—হবু শ্বাশুড়ীঠাকরুণ আসছেন, তোমার আর দুদণ্ড তর সইল না? বিড়ি না ফুঁকলে কি পেট ফুলে উঠবে? হ্যাঁ—এলেই প্রণাম করবে। দেখ—কি রকম ঘর-টর। ফলাও ব্যবসা।

—মেয়ে কই?...ছোকরাটি বড় হিসেবী।

ফ্যাঁচ করে ওঠে বৃন্দাবন—অতো বেড়োনা, যার তার মেয়ে নয়। মেয়েও ম্যাট্রিক পাশ দেবে এইবার।

—হুঁ। কথাটা ছোকরার যেন মনঃপূত হলো না। পাশ দিয়ে আবার কি হবে?

ওকে ঘরে বসিয়ে রেখে বৃন্দাবন বাড়ীর ভিতর এসে হাতমুখ নাড়ছে, —বুঝলেন মাঠান, ছেলের স্বাস্থ্য দেখুন। আর রূপ! ছেলের গুণই তো বড়, রূপে কি আসে যায়! হিসেবী সচ্চরিত্র। পান বিড়ির নেশা পর্যন্ত নেই, একেবারে জিতেন্দ্রিয়।

সরমাকে কেউ কোন দিন খোসামুদি করেনি; ব্যক্তিত্ব বলে কোন কিছুই নেই। বৃন্দাবনের মত লোককে সরমা পছন্দ করেছে কারণ তার মতে সরমার মত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী মেয়ে আর নেই। দয়ার শরীর।

...বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে; খেতে বসবার সময়ই সরমা পাত্র দেখবে; ফলাও ব্যবস্থা; পুকুর থেকে মস্ত মাছ—জিনিষপত্র এসেছে। এ যেন পাকা দেখার সমারোহ সুরু করেছে সরমা, এখন থেকেই বেহিসেবী হয়ে উঠেছে সে!

বৃন্দাবনের জন্য কর্তার ফুরসী নামানো হয়েছে ; জলবদলে বৃন্দাবন দাওয়ার বসে গম্ভীরভাবে টানছে ; যেন সেই-ই এ বাড়ীর মুরুব্বি। বাবার পূজার একখানা আসন সেবার কাশ্মীর হতে আনান হয়েছিল সেইটাই পেতে বসেছে বৃন্দাবন। বেশ গলা ছেড়েই গল্প করছে—কেমন ঘর দেখতে হবে মা ; ফুলের মুখুয্যে ঘর ; আর আপনাদের বল্লভি ঘর। তারপর মেয়েও ফর্সা গৌরীর মত, আর জামাই আপনাদের ভস্মমাখা মহাদেব। যান না গিয়ে এক নজর দেখে আসুন।

বৃন্দাবন মনে মনে হিসাব করছে—একবার গাঁথতে পারলে হয় ; তারপর দেখবে কোথাকার জল কোন দিকে দাঁড়ায়।

ছোকরা বসবার ঘরে উসখুস করছে ; বনাতমোড়া টেবিলের উপর নামানো কয়েকখানা বই, মঞ্জুর নিজের হাতে নাম লেখা ; আলমারীর মধ্যে কিসের ছবি ; একটি হাস্যময়ী মেয়ে ; মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে লোকটা ছবির দিকে ; পাল্লাটা খুলে দেখতে থাকে ছবির এলবাম ; দু'একখানা বইও নামিয়েছে।

...হঠাৎ পিছনে কার পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইল। লোকটা একটু চমকে ওঠে—হঠাৎ ওপাশের ছবি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মেয়েটি ঘরে ঢুকছে বই খাতা বগলে, রোদে তেতে উঠেছে, রাঙা হয়ে গেছে ফর্সা মুখখানা, কপালের উপর উড়ে এসে পড়েছে দু'একগাছি চূর্ণ অলকদাম। হাঁ করে লোকটাকে চেয়ে থাকতে দেখে চটে ওঠে মঞ্জু!

শরীরটা ভাল লাগছিল না তাই সকাল সকাল বের হয়ে এসেছে স্কুল থেকে, বসবার ঘরটা এরই মধ্যে বিড়ির টুকরো পোড়া দেশলাইএর ছাইএ ভরে উঠেছে। টেবিল ক্লথের উপর চায়ের দাগ ; বই খাতা সব হাটকানো, আলমারি খুলে তার ছবির এ্যালবাম দেখছে, মনে মনে বিস্মিত রাগান্বিত দুইই হয়েছে, অপরিচিত লোকের দুঃসাহস দেখে।

—আপনি ?

হাসবার চেষ্টা করে লোকটি—মানে আমি ! আমি এসেছি এখানে—

বেশ কড়াসুরেই বলে ওঠে মঞ্জু—যার তার বই খাতা—আলমারি এসব ঘাঁটাঘাঁটি করেন কেন ? ইস্—ঘরময় ছাই।

—পড়ে গেছে।

মঞ্জু কথা বলে না, লোকটার দিকে চেয়ে রয়েছে ; ঠিক বুঝতে পারে না কি উদ্দেশ্যে ওর আগমন। কি ভেবে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

উঠানে পা দিয়েই হাড় পিত্তি জ্বলে ওঠে, একে রোদে তেতে পুড়ে এসেছে, বাইরের ঘরে ওই কাণ্ড, আবার বাড়ীর ভিতরে এসে জুড়ে বসেছে ওই নোংরা বৃন্দাবন সাঁপুই। যেন বাড়ীর কর্তৃত্ব ওদের হাতেই গিয়ে পড়েছে। আসনখানার দিকে নজর পড়তেই চমকে ওঠে মঞ্জু, বাবার প্রিয় আসনখানা পূজার ঘর থেকে বের হয় না, সেইখানাতেই বসেছে ওই শয়তান, আর টানছে বাবার মোরাদাবাদী কাজকরা দামী ফুরসি। এ যেন তার বাবাকেই অপমান করতে সাহস পেয়েছে ওই বৃন্দাবন আর তার মা।

...বৃন্দাবন ওর চোখমুখের দিকে চেয়ে একটু ঘাবড়ে যায়। রান্নাঘরে আয়োজন চলেছে—তোফা গন্ধ উঠেছে গাওয়া ঘিএর, এসব ভণ্ডুল করা চলবে না। সরমাও বের হয়ে এসেছে।

বৃন্দাবন ভরসা পেয়ে বলতে থাকে—ভালোই হলো। দেখলেন মাঠান, আসতেই হবে ওকে—এ যে ছয় নাড়ীর টান। জন্ম থেকেই বাঁধা। তাহলে অপরাহ্ণ বেলায় অমৃতযোগ আছে—শুভদিন, আশীর্বাদী হয়ে যাক।

এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা যেন পরিষ্কার হয় মঞ্জুর কাছে। তারই অন্তরালে এই সব চক্রান্ত চলছিল। আজ হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে। মায়ের দিকে ঘৃণাভরে চেয়ে থাকে ; এত নীচ। ওই অপদার্থ বাঁদরটাকে কি করে কল্পনা করে তার স্বামী হিসেবে ভাবতেই পারে না সে। ঘৃণায় সারামন ভরে ওঠে।

—বসো মা।

বৃন্দাবনের কথায় দাঁড়ালো না।

এ সময় ঝগড়া করে অশান্তি বাধাতে চায় না।

সরমা এগিয়ে আসে—শোন।

—চুপ করো। লজ্জা করে না তোমার ? ছিঃ ছিঃ !

—কোথায় যাচ্ছিস ? সরমা এগিয়ে আসে।

—চুলোয় ! মরতে যাচ্ছি—

সেই রোদের মধ্যেই পথে নেমে গেল মঞ্জু। এক মুহূর্ত আর বাড়ীতে থাকতে মন চায় না। এখান হতে সব বন্ধন যেন মুছে ফেলতে চায় সে।

পথে বের হয়ে মঞ্জু আজ নিজেকে চিনতে পারে। লক্ষ্যভ্রষ্টের মত চলেছে। কোথায় যাবে জানে না—কোন সহপাঠিনী বন্ধুর বাড়ী? অন্য কোথায়? না। লোকালয়ের মধ্যে যেতে ইচ্ছা করে না। এগিয়ে চলে নির্জন ছায়াঘন নদীর ধারের দিকে। ভয় হয়—অজানা ভয়ে বুক কাঁপতো অন্য সময়। এখন যেন সে মরীয়া। মায়ের অন্যায় অবিচার মানতে রাজী নয়। বাবার কথা মনে পড়ে—কিন্তু বাবা বাইরে গেছেন।

নির্জন বনছায়ায় বসে বসে কি যেন আকাশ পাতাল ভাবছে মঞ্জু। হঠাৎ মনে পড়ে অনিমেষের কথা! সারামন কি এক দুঃসহ লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে—তবু মনে হয় ও যেন পরম নির্ভরস্থল। ওকে সব কথাই বলা যায়।

এ এক বিচিত্র অনুভূতি। ক্ষতবিক্ষত মনের জ্বালা যেন জুড়িয়ে আসছে—বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওর শান্ত—গম্ভীর চেহারা; সাধারণ মেয়েদের তুলনায় ওর মন অনেক অগ্রসর—হালকা সুর সেখানে বাজে না। বার বার অনিমেষের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু দুস্তর লজ্জা ভয় তাকে পেয়ে বসেছে।

আকাশ ছেয়ে গেছে কালোমেঘে। ওদিকে খেয়াল করেনি মঞ্জু। নিজের চিন্তাতেই ডুবেছিল। মেতেছিল নিজের মনের ঝড়ে—সেই ঝড়ের রুদ্ররূপ সংক্রমিত হয়েছে আকাশ বাতাসে। ক্ষেপে উঠেছে গাছগুলো।

কড়—কড় কড়াৎ। চোখ ঝলসে ওঠে।

উতরোল কল্লোলের মধ্যে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাজ পড়ল দূরে নারকেল গাছের মাথায়—বৃষ্টির মধ্যেও দাউ দাউ করে জ্বলছে কাঁচা গাছটা। চোখ ঝলসে ওঠে মঞ্জুর।

ছুটছে প্রাণপণে। ভয়ে—আতঙ্কে সারা মন ভরে উঠেছে। ঘরে বাইরে যেন তার কোথাও কোন ঠাঁই নেই—শত শত বৃন্দাবন সাঁপুইএর দল লোলুপ হাত মেলে তাকে গ্রাস করতে আসছে, ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে আসছে তার জীবনের সব আশা-ভবিষ্যৎ।

ছুটছে মঞ্জু লক্ষ্যভ্রষ্টের মত। আকাশ বাতাস জুড়ে লাখো দৈত্য আঁধারে ডুব দিয়ে ছুটে আসছে। দূরে একটু আলোর ইসারা—ছুটছে মঞ্জু। হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়লো—উঠে আবার চলছে অদম্য সাহসে ভর করে।

—সাঁ সাঁ করে এসে মুখে—এলো চুলে লাগে নদীর বালুকণা; কাপড়খানা লুটিয়ে পড়েছে।

দরজা জানলাগুলো আছড়ে পড়ে সশব্দে। রামহরি আর উড়ে মালি দুজনেও ছুটোছুটি করছে বাড়ীময়; মাঝে মাঝে আলসেসিয়ান কুকুরটা হেঁকে ওঠে।

অনিমেষ বের হতে যাবে—সেই সময়ই ঝড় উঠেছে, সেই সঙ্গে নেমেছে বৃষ্টি। মুষলধারে পড়ছে বৃষ্টি; তৃষিতমাটির বুক থেকে উঠছে বৃষ্টির মিষ্টি সোঁদা গন্ধ। বাতাস ভরে উঠেছে। ডেকচেয়ারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে অনিমেষ; ঝড়ে আটকে পড়েছে বাড়ীতেই।

গেট পার হয়ে কাকে ছুটে আসতে দেখে অবাক হয়ে যায়, ঠিক ঠাওর করতে পারে না মূর্তিটাকে; বিদ্যুতের এক ঝলকে ওকে একবার দেখা যায়—আবার অন্ধকার নেমে আসে। বারান্দায় বের হয়ে এল অনিমেষ। এই ঝড় জলের মধ্যে হাসপাতাল থেকে হয় তো কোন দুঃসংবাদ এসেছে; একটা খারাপ কেস দেখে এসেছে সেখানে।

বারান্দায় উঠে হাঁপাচ্ছে সে, আবছা আলো জানলার ফাঁক দিয়ে ছিটিয়ে পড়েছে; হঠাৎ চমকে ওঠে অনিমেষ।

—তুমি! সারা শরীরে শিহরণ খেলে যায় তার।

এগিয়ে আসে মঞ্জু! হাঁপাচ্ছে তখনও। মাথার চুলগুলো খোঁপা ভেঙে খসে পড়েছে; চুইয়ে পড়ছে বৃষ্টির ধারা, সুন্দর টলটলে মুখখানা যেন জলেভেজা পদ্মের মত সতেজ—শ্যামস্পর্শময়। শাড়ী ব্লাউজ ভিজে চেপে বসেছে—গায়ে; সর্বাঙ্গে জল ঝরছে। হাঁপাচ্ছে দাঁড়িয়ে।

—এমনি করে ভিজেছো? কোথায় গিয়েছিলে?

এগিয়ে এল অনিমেষ; ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

...জবাব দেয় না মঞ্জু। ওর দিকে চাইবার চেষ্টা করে মাথা নীচু করলো।

—এস। ছেড়ে ফেল ওসব, নইলে ঠাণ্ডায় অসুখে পড়বে।

…নিজের ঘরেই নিয়ে গিয়ে কাপড়ের সন্ধান করতে থাকে।…এদিক ওদিক খুঁজে হঠাৎ হেসে ফেলে মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করে। আমতা আমতা করে,

—শাড়ী তো নেই, ব্লাউসও তাই। কি আর করা যাবে—আমার ধুতিই পর, যাও বাথরুমে ধুতি-চাদর-তোয়ালে আছে। বেশ করে মাথা মুছে নাও। ওঠো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠতে হল মঞ্জুকে। ওর আদেশ অমান্য করবার শক্তি তার নেই।

…অনিমেষ চেয়ে রয়েছে তার দিকে, পরনে পাটভাংগা ধুতি, সাদা ধুতির পিঠে এলিয়ে পড়েছে একরাশ চুল, গায়ে একটা তোয়ালে জড়িয়ে এসে বসেছে ইজিচেয়ারে। মুখচোখ থমথমে। কি যেন একটা ঝড় বয়ে চলেছে ওর মনে।

অনিমেষ চায়ের পেয়ালা কিছু বিস্কুট এগিয়ে দেয় তার দিকে।

—নাও, খুব ভিজেছো আদা দিয়ে তৈরী চায়ে কিছুটা কাজ হবে।

সারাদিন খায়নি কিছু; পেটের ভিতর নাড়ীগুলো পাক দিচ্ছে খিদের জ্বালায়। বিস্কুটগুলোর দিকে চেয়ে থাকে, মনের তেজ-জ্বালা তখনও কমেনি। জবাব দেয়,

—উঁহু!—খাবনা কিছু! খিদে নেই আমার। বেশ উষ্ণতা ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠে।

ওর ছেলেমানুষী দেখে হাসি আসে—সামনে হাসলে হয়তো আরও চটে যাবে, মুখ ফিরিয়ে বলে ওঠে অনিমেষ।

—রাগটা কার ওপর? বাবা বাড়ী এসেছেন—না মায়ের উপরেই চোট চলেছে।

সঞ্চিত বিক্ষোভ ফেটে পড়ে চোখের জলে, নিজেকে সামলাতে পারে না মঞ্জু। এতক্ষণের সঞ্চিত বিক্ষোভ ঝরে পড়ে কান্নায়। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে—অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অনিমেষ তার দিকে। সবই তার কাছে হেঁয়ালি বলে মনে হয়। অশ্রুভিজে কণ্ঠে বলে ওঠে,

—মা কেন বিয়ে দেবে আমার? বিয়ে আমি করবো না? মা যেন পাগল হয়ে উঠেছে। কেন? আমি তার শত্রু, না গলার কাঁটা? আমার মতামত নেই?

…হাসিতে ফেটে পড়ে অনিমেষ; এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন সহজ হয়ে আসে, বলে ওঠে—সত্যিতো মায়ের খুব অন্যায়; আজকালকার সভ্য শিক্ষিত মেয়ের বিয়ে দেবে মা? এ যে রীতিমত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।

—বলুন আপনি, একটা যার তার সংগে বিয়ে! যেমন রূপ তেমনি তার গুণ। আমি বিয়েও করবো না—বাড়ীও যাবো না। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো।

বাইরে ঝড় তখনও কমেনি; বিদ্যুতের আভায় বাগানটা বিচিত্র এক রহস্যময় হয়ে ওঠে। ওর কথায় একটু ঘাবড়ে যায় অনিমেষ। এই বয়সে মেয়েদের পক্ষে কম বেশী ভাবপ্রবণতা আসে, কিন্তু এমন শক্ত মেয়ে বিগড়ালে তাকে ঠাণ্ডা করা দায়। নিজে অবিবাহিত—সহরে সুনামও আছে। এই সময় যদি কেউ নেহাত এসেই পড়ে—তার ঘরে ওই কান্না দেখলে অনেক কিছু ভাবাই স্বাভাবিক।

…ব্যাকুলকণ্ঠে অনুরোধ করে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে—চুপ কর মঞ্জু।

…চুপ করাতো দূরের কথা; কান্নার মাত্রা বেড়ে চলে তার। অনিমেষ কি করবে ভেবে পায় না, রামহরি—মালীও কান্নার শব্দে এসে পড়তে পারে,—ওরা যদি দেখে কালই বাজারে ছড়িয়ে পড়বে সংবাদ।

—মঞ্জু! লক্ষ্মীটি!

ওর কাঁধে হাত দিয়ে ওকে ডাকবার চেষ্টা করে।

মঞ্জু বলে চলেছে—নদীর দহেই ডুববো আমি; না হয় আফিম খাবো।

…মনে মনে শিউরে ওঠে অনিমেষ, এমন বিপদে কখনও পড়েনি।

—মঞ্জু! শোন।

…নীরবে অশ্রুভিজে টলটলে মুখ তুললো সে ডাগর দুটো চোখে সরল অসহায় চাহনি।…বলে ওঠে—আপনি বাঁচান আমাকে! যেন আর্তনাদ করে ওঠে মঞ্জু।

ওর হাত দুটো ধরেছে মঞ্জু, নিবিড় স্পর্শে শিউরে ওঠে অনিমেষ। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে মঞ্জু, ধুতিখানা খসে পড়েছে কাঁধ থেকে। এ যেন অন্য কোন নারী!

…অনিমেষের হাত পা যেন কাঁপছে আতংকে। হাসপাতালে অনেক বড় অপারেশন করেছে সে; চোখের সামনে দেখেছে মানুষের দেহের মধ্যেকার কোষ—রক্ত মাংস। কিন্তু মনের মধ্যে যে গহন অতল রয়েছে তার পরিচয় পায় নি। আজ বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যার নির্জনে—নিঃশব্দ ধরিত্রীর বুক থেকে—কে যেন আশা নিয়ে চেয়ে রয়েছে সেই মনোজগৎ হতে।

…মঞ্জুর একখানা হাত ওর হাতে ; মঞ্জুই ধরেছে শক্ত করে।

—আপনিই পারেন এই বিপদ থেকে বাঁচাতে। তাই ছুটে এসেছি এইখানে।

এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই বলে ওঠে অনিমেষ—আচ্ছা, সে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—না ; কথা দিন আপনি ? আপনি নিষেধ করুন মাকে।

…কথা দিচ্ছি। বাধ্য হয়েই বলে বসলো সে।

মঞ্জু আশ্বস্ত হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে জলভরা চোখে—জানতাম আপনি ফেরাতে পারবেন না আমাকে। মঞ্জু চোখ মুছে স্থির হয়ে বসলো।

অনিমেষ বলে ওঠে,

—চলো রাত্রি অনেক হয়েছে, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

…দুজনে বের হলো বাগানে ; ঝড় থেমে গেছে ; থেমে গেছে বৃষ্টি। কে ভাবতে পারে একটু আগেই প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে আকাশ বাতাসে। বর্ষণসিক্ত মাটিতে ঝরে পড়েছে পাতা—ছোট ছোট ডাল ; ওপাশে ছিটকে পড়েছে একটা পাখীর বাসা।

বৃষ্টি বিধৌত আকাশবনানীর বুকে জেগেছে। চাঁদের আলো—মিষ্টি আভায় ভরে তুলেছে চারদিক। মিষ্টি বৃষ্টি-স্নাত নির্মল পৃথিবী।

চলেছে ওরা দুজনে জনহীন রাস্তা দিয়ে, লোকচলাচল নেই, যে যার ঘরে ফিরে গেছে বৃষ্টি থামতেই। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরাও আশ্রয় নিয়েছে নিরাপদ ঠাঁইয়ে।…অনিমেষ কি যেন ভাবছে।…মঞ্জুর সারা মনে কি এক অপুর্ব্ব শান্তির সন্ধান।

একটু স্পর্শ—একটু বিচিত্র সুরের অনুরণন তখনও তার মন ছেয়ে রয়েছে ; কোথায় ডাকছে—পত্রাবরণের মধ্যে দোয়েল পাখী। আজ মঞ্জুর মনে কি এক দুর্বার সহনশীলতা জেগে উঠেছে। ওদের সকলকেই অগ্রাহ্য করবার শক্তি সে অর্জন করেছে ; আজ সে একা নয়।…অনিমেষের দীর্ঘ যৌবনপুষ্ট দেহের দিকে চেয়ে থাকে—মনে পড়ে ওর কথাগুলো ; পরম নির্ভর আনে।

এই সময় একা ওকে সহরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে সাহস করে না অনিমেষ। যতই সভ্য হবার চেষ্টা করুক কাজল গাঁ—এখনও এখানের সমাজে পরনিন্দা পরচর্চাটাই প্রধান আকর্ষণ; তাকে মঞ্জুর সঙ্গে এত রাত্রে দেখলে অনেকেরই নীরব জিব অন্তরালে মুখর হয়ে উঠবে।

—কোন্ দিকে যাচ্ছেন? এই তো সহরের মধ্যে দিয়েই চলে যাবো? অনিমেষ একা নিতান্ত অসহায় মনে করে নিজেকে মঞ্জুর কথায়।

—হেডমিসট্রেসের ওখান হয়েই যাবো। একটু কাজ আছে। বলে অনিমেষ।

কথাটা শুনে চমকে ওঠে মঞ্জু; আজ নিঃশেষে সে পেয়েছিল অনিমেষকে; দেখছে মাঝে মাঝে এই অনিমেষ—মনিষাদির কাছে যেন অন্যরকম হয়ে ওঠে।

হাসিতে ভরে ওঠে মুখচোখ; কথাবার্তাব ধাবাও বদলে যায়। আজ চাঁদের আলোঢাকা নির্জন পথে অনিমেষের সঙ্গে যেতে যেতে কোথায় যেন অনুভব করে মনীষাদিকে সে হিংসা করে। ওখানে বিশেষ করে আজ যেতে মন চায় না; …যে অপরিসীম তৃপ্তির সন্ধান সে পেয়েছে—তার অংশ কাউকেও দিতে সে নারাজ। সে তার একান্ত নিজস্ব গোপনীয় স্মৃতি—মনের মণিকোঠায় তাকে সযত্নে সঞ্চয় করে রাখতে চায়। বলে ওঠে মঞ্জু।

—না গেলেই কি নয়? ওর কণ্ঠে কি যেন ব্যক্তিত্বের সুর, সদ্যজাগর নারীত্ব যেন ধীরে ধীরে মাথা তুলছে।

অনিমেষ কথা বললো না, নীরবে পথ চলছে তারা।

মনীষা পরীক্ষাব খাতায় লাল পেন্সিল দিয়ে আঁচড় কাটছে, মাঝে মাঝে মেজাজ খিঁচড়ে ওঠে—মেয়েদের কাণ্ড দেখে। একেবারে যেন আশমান থেকে পড়েছে সব, যেমন হাতের লেখা—তেমনি উত্তর। রেগেমেগে একখানা খাতা ছুঁড়েই ফেলে দেয় দরজার দিকে সাঁ করে; চটে উঠলে তার জ্ঞানগম্যি থাকে না।

অনিমেষ ঢুকছে পেছনে মঞ্জু; উড়ন্ত খাতাখানা সবেগে গিয়ে ছিটকে লাগে অনিমেষের মুখেই। অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না—নিজের মনে কি

ভাবতে ভাবতে আসছিল—হঠাৎ মুখে লাগাতেই অনিমেষ চমকে ওঠে ; মনীষাও অবাক হয়ে যায়।

—আপনি ?

অনিমেষ হেঁট হয়ে ধাবমান বস্তুটার স্বরূপ নিরীক্ষণ করছিল ; সেটা তুলে নিয়ে বলে—কোন বেচারার খাতা, এত কষ্টে পরীক্ষা দিয়েছে আর সেই খাতার কিনা এই হেনস্থা ?

হাসে মনীষা—কি লিখেছে দেখুন না, অনেক মূল্যবান তথ্য আছে ওতে, সবই একেবারে 'ওরিজিন্যাল'। বিন্ধ্যাচল—মস্ত বড় ইস্টিশান, দিল্লী বেগমদের জন্য বিখ্যাত ; কাশী জর্দার জন্মস্থান—

—হঠাৎ পিছনে মঞ্জুকে দেখে উঠে পড়লো চেয়ার ছেড়ে ; মনীষা অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে তার দিকে ; পরনে একটা পাটভাঙ্গা ধুতি, গায়ে জড়ানো তোয়ালে। ...ভিজে চুলগুলো পিঠময় ছড়ানো ; মুখচোখে কি এক পরম তৃপ্তির আভা। চমকে ওঠে মনীষা, সাজপোশাক দেখে বুঝতে বাকী থাকে না কোথায় গিয়েছিল মঞ্জু ; কিন্তু এই পোশাকে সহরের পথে বের হতে পারলো কি করে ? স্তম্ভিত হয়ে গেছে মনীষা। সারা মন যেন অসহ্য বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে।

অনিমেষই বলে ওঠে—বসো মঞ্জু,...আপনি একটু শুনুন।

মনীষা বের হয়ে এল বারান্দায়।

...অনিমেষ বলে চলেছে আদিপর্ব। আজ মনীষার কাছে পরিষ্কার হয় তার মনের বক্তব্য। অনিমেষ মনীষার সাহায্য আজ চায় ; সেইই যদি ওকে পেঁছে দিয়ে আসে সহরের কৌতূহলী দৃষ্টির হাত থেকে বেঁচে যায় সে। বিস্মিত দৃষ্টিতে মনীষা ওর দিকে চেয়ে আছে—মনীষা বলে ওঠে,

—ওই পোশাকে নিয়ে পথে বের হলেন কি করে ? বেশ আক্কেল যা হোক। আর কেউ দেখেছে ?

হাসে অনিমেষ—সব ভিজে গেছল ওর, আমার ঘরে ও ছাড়া আর আছে কি ? প্যাণ্ট পরতো ?

—থাক্ খুব হয়েছে। খুব খ্যাতির কাজ করেছেন। কচি মেয়েটারও দেখছি মাথা খারাপ।

অনিমেষ বলে ওঠে—সত্যিই। অবশ্য মেয়েদের সকলেরই অল্পবিস্তর ওই লক্ষণটা আছে।

চটে ওঠে মনীষা—থাক্, ঢের হয়েছে। তারজন্য ছেলেরা কম দায়ী নয়। এত জায়গা থাকতে…দুঃখ জানাতে ও বেছে বেছে তোমার কাছেই বা গেল কেন? মনীষার মুখ দিয়ে 'ফস্' করে তুমি শুনে একটু বিস্মিত হয় অনিমেষ; আজ মনে হয় এই বৃষ্টিধারার বর্ষণে অনিমেষের মনেও কোথাও শ্যাম সজীবতা জেগে উঠেছে; অজানা একটি মুহূর্তে ওই কিশোরীকন্যা কোন ঠাঁই ছুঁয়ে ফেলেছে আনমনে; সদ্যজাগর সেই স্বপ্নমন নিয়ে আজ মনীষাকে দেখে।

—তা কি করে বলি? এমনিই গিয়ে হাজির হয়েছে। এখন তুমিই ভরসা।

—মানে? হাসছে মনীষা; দুচোখের তারায় ওর দুষ্টুমিভরা চাহনি।… অনিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর শ্যাম সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে রয়েছে; হাতের বালা দু'গাছি সুডৌল সুষমা এনেছে,…গলার হারের ঝিকিমিকি যেন ওর চোখের তারারই দ্যুতিময় প্রতিবিম্ব।

—খুব ভয় পেয়ে গেছো তুমি?

অনিমেষের পৌরুষ যেন জেগে ওঠে—নাঃ, ভয় পাবো কেন? ওইটুকু বাচ্চা মেয়ে ওর কাছে আবার ভয় করবার কি আছে?

—গোখরো সাপের ছোট বড় নেই, হাসছে মনীষা।

মঞ্জু একা বসে আছে ঘরের মধ্যে; বাইরের বারান্দায় ওদের হাসির শব্দ শুনতে পায়, আজ মনীষাদিকে কেমন যেন ভালো লাগে না—কি কথা এতক্ষণ বলছে অনিমেষ? অনিমেষের ওখানে যাবার কাহিনী মনীষাদিকে জানাবার কি এমন প্রয়োজন ছিল জানে না মঞ্জু। নিজের গোপনতম দুর্বলতার কথা অন্য কোন নারীর সামনে প্রকাশিত হবে—এটা ভাবতেই পারে না সে।

ওরা ঘরে ঢুকলো। মনীষা বলে ওঠে,

—ওগুলো ছেড়ে ফেলো মঞ্জু; ওঘরে আমার শাড়ী রয়েছে।

…মঞ্জু এতক্ষণ একথাটা ভাবেনি; নিজের দিকে চেয়ে কি এক দুস্তর লজ্জায় পড়ে যায়।…তার সমস্ত সম্ভ্রম শুচিতা আজ কালো হয়ে যেন ওই নারীর চোখে ফুটে উঠেছে।

মঞ্জুকে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয় মনীষা, অনিমেষ বলে ওঠে,

—আমি যাবো সঙ্গে ?

মনীষার তারায় তারায় ব্যঙ্গের ছায়া—থাক, আর নাই বা গেলেন ? কষ্ট হবে নাকি ? মঞ্জু তখনও ঘরে কাপড় বদলাচ্ছে।

অনিমেষ কি যেন ভাবছে। আজকের ঝড়ের রাত্রি তার শান্তজীবনে কোথায় বিপ্লব এনেছে ! মঞ্জুর অসহায় আকৃতি তার চোখে বার বার ভেসে ওঠে, কি নির্ভর সে চায় তার কাছে ? হয়তো তরুণমনের প্রথম বিক্ষোভ ; এর বেশী কিছু নয়।

মনীষা তখনও ফেরেনি। একাই বসে আছে সে। ঝড় থেমে গেছে, বৃষ্টি ধোয়া গাছগাছালির মাথায় পড়েছে চাঁদের তরল আলোর আভা, সোনালী স্বপ্নে রাতের আঁধার ভরিয়ে তুলেছে। বার বার চেষ্টা করেও মঞ্জুকে ভুলতে পারে না সে ; ওর জাগর যৌবনের বেদীতে কি যেন অনিবেদিত শ্যাম অর্ঘ্য !

মনীষাকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়ালো অনিমেষ।

—এখনও বসে আছেন ? নিরাপদে পেঁছানোর খবরটা নেবার জন্য ?

ওর কণ্ঠে তিক্ত বিদ্রূপের সুর। চমকে ওঠে অনিমেষ ; মনীষা এগিয়ে এসে বলে—কতদিন ধরে চলছে রাসলীলা ?

—মনীষা ! অনিমেষ জবাব দেবার চেষ্টা করে।

—থাক ! আর সাধু সাজতে হবে না। কৈফিয়ৎও চাইছি না। রাত অনেক হয়েছে। আপনি যান।

—ভুল বুঝোনা আমাকে। অনিমেষ ব্যাকুলকণ্ঠে বলে ওঠে।

—প্রথমেই বুঝেছিলাম, আজ ভুল ভেঙেগেছে।

ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। একলা স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে অনিমেষ। মনীষার কাছে তার সম্মানটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল। কতটুকু সত্য তা যাচাই না করেই মনীষা তাকে ভুল বুঝতে পারলে—এটা যেন নিজেই সে বিশ্বাস করতে পারে না।

…রাত্রি হয়ে গেছে। ঝি দরজা বন্ধ করবার জন্য উশখুশ করছে। চুপ করে বের হয়ে এল অনিমেষ। সব যেন কেমন ঝড়ো হাওয়ায় তালগোল পাকিয়ে গেছে।

থমথমে কালো আকাশ ফেটে তখনও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—কালো মেঘ আবার চাঁদ ঢেকে ফেলেছে।

হরিপদ মিস্ত্রী বাজে কথা বলে না—সেইটাই বার বার জোর গলায় জাহির করবার চেষ্টা করছে সে নিতাইএর কাছে জড়িত কণ্ঠে। নিতাই পৃথিবীর ধনদৌলত সমস্ত কিছুর বিনিময়ে ও কথাটা অস্বীকার করতে নারাজ।…আজ আর তাদের তাড়ির আসর বসেনি আমবাগানের ছায়ায়, আজ মদের দোকানে গেছে নিতাই। ফণীচক্কোত্তির মটর কোম্পানীতে হরিপদর সঙ্গে কাজ শিখছিল ক'মাস, এখন নিজেই মিস্ত্রী, মাইনে পেয়েছে নগদ, সেই উপলক্ষ্যে এসেছে চণ্ডীশুঁড়ির দোকানে! সহরের বাইরে নদীর ধারে আখখেতের পাহারাঘেরা ছোট মাঠে নীচু হয়ে পড়ে আছে ঘরখানা; কয়েকটা বড় বড় জালে কালিমাখা হাঁড়িতে ভাতসেদ্ধ হচ্ছে—তার থেকে পচুই মদ তৈরী হবে; ওদিকে খদ্দেরদের ভিড় জমেছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সবুজ আখ খেতের আড়াল চলেছে ওদের মদ্যপকণ্ঠের চীৎকর।

…নিতাই এখানকার বনেদী খদ্দের। হরিপদর বন্ধু। হরিপদর প্রভাব এখানে অপরিসীম। মটর কোম্পানী তার হাতধরা; অনেক বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে আসে। হরিপদ বলে ওঠে,

—একটু পেঁয়াজ কামড়ে ঢোক গেল বাবাজী; আঁশমুখে লাগবে ভালো।

নিতাই এখনও পিয়াজের গন্ধটা সহ্য করতে পারে না—গলায় এখনও রয়েছে কণ্ঠী; বাবাজী বলেই পরিচিত সে।

যমুনা একাই বসে আছে আশ্রমে। মন্দির বলতে তার ছোট্ট চালঘর—তারই মধ্যে কাঠের সিংহাসনে একটা কৃষ্ণ রাধিকামূর্তি। পূজা উপচার কিছুই নেই; নিতাই আর সে পরম ভক্তি-ভরে রোজ সন্ধ্যা সকালে কীর্তন করতো, শ্যাম ছায়া-ঘন

বাগান সীমা পার হয়ে সেই সুর পেঁছিতো পথচারীর কানে। অনেক যাত্রীও থেমে যেত ওদের সুরেলা পদাবলী কীর্তনে। সিকি দু'আনি নামিয়ে দিয়ে যেতো ধানের ব্যাপারী-হাটুরে দল পাল পার্বণে; এখন সে সবও বন্ধ, যমুনার কণ্ঠে আর সুর আসেনি। আজ মনে হয়—দেবতাকে সে ভালবাসেনি, ভালবেসেছিল তার দেহজ কামনাকেই—নইলে আজ নিতাইএর জন্য সব কাজ তার ভুল হয়ে যায় কেন? সাধারণ আরও পাঁচজনের মতই ঘর বেঁধেছিল সে। ঠাকুর বৈষ্ণব-জীবন ছিল তার পটভূমিকা, মনে কোথায় সেই পবিত্রতার স্পর্শ নেই। সে নেহাত পরগাছা—

নিতাইকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে—ডালপালা মেলেছে। নিজের মনের এই অসহায় দীনতায় নিজেরই লজ্জা আসে। আজ যে পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করে সে। নিতাই তাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে নি; বন্ধনই এনেছিল। আজ সে মন শক্ত করেছে বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবার জন্য।

বাগানের নীরবতা ওদের জড়িত কণ্ঠে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, নিতাই টলছে এদিক ওদিকে। হরিপদ মিস্ত্রী ধরে আনছে তাকে। গান গাইবার চেষ্টা করে নিতাই—

বলো—কেমনে ধরিব হিয়া,
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া।

যমুনা শিউরে ওঠে ওর ক্লেদাক্ত মূর্তি দেখে; ঘৃণায় মন ভরে ওঠে। একটা চলন্ত কীট যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফতুয়ার পকেট থেকে কয়েকটা টাকা ছিটিয়ে ফেলে দেয় ওর সামনে নিতাই—এই লে। শালা খঞ্জনী ঠুকে ভিক্ষে করে কি ওর মুখ দেখেছিলি? দেখ এইবার ঝমাঝম টাকা আনবো।

যমুনা টাকার কাঙ্গাল নয়, সামান্য যা প্রয়োজন তার জন্য নিতাইএর ওই অধঃপতন দেখে নিজেরই দুঃখ হয়।

বলে ওঠে যমুনা—তোর টাকা আমি ছুঁই না। তুই সরে যা আমার সামনে হতে!

খুঁটি ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে নিতাই—মাইরী! আবার নোতুন নাগর জুটেছে নাকি? কোন্ শালা আসে, বল বল?

যমুনাকে ধরবার জন্য এগিয়ে আসে শ্বাপদ লালসায়, ওর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে যেন। রুখে দাঁড়ায় যমুনা।

—মারবি নাকি?

হরিপদ অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আছে, সে বলে ওঠে,

—চটো কেন বাবাজী; চট্‌তে নাই।

...পরম সত্যটা যেন চকিতের মধ্যে অনুভব করতে পারে নিতাই, দয়া ক্ষমায় সারা অন্তর ভরে ওঠে, পরম ধর্মজ্ঞানী হয়ে ওঠে তখনই।

—যাঃ, তোকে ছেড়েই দিলাম আজ।

সটান শুয়ে পড়ে দাওয়াতে; একটা ত্রিবমি কীট যেন নড়ছিল, স্তব্ধ হয়ে গেল তার স্পন্দন। যমুনা ঠায় বসে আছে ওপাশের দাওয়ায় গুম হয়ে।

রাত্রি আসে জনহীন বনে বনে। বাতাসে আজও তেমনি উদাস বকুল গন্ধ—চাঁদের আলোয় কোথায় প্লাবন ডেকেছে ফিরে চাইবার মত মানসিক অবস্থা যমুনার নেই। মনের সব কমনীয়তা—সৌন্দর্যবোধ তার মুছে গেছে। পৃথিবী তার কাছে সব সুষমা হারিয়ে বিশ্রী এক নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে; ওরা সেই ক্রিমিকীট।... অসহ্য জ্বালায় মন ভরে ওঠে।

হঠাৎ শিউরে ওঠে অজানা আতঙ্কে, জনহীন বনভূমির প্রতিটি বৃক্ষকাণ্ড সজীব হয়ে উঠেছে; গ্রাস করতে আসছে তাকে; নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে কার শক্ত হাতের চাপে; হরিপদ মিস্ত্রী এই সুযোগই খুঁজছিল; নিতাই নেশার ঘোরে অচৈতন্য। যমুনার উপর বহুদিনের পুঞ্জীভূত লোভ আজ চরিতার্থ করবার সুযোগ পেয়েছে। শিরায় শিরায় বুনোরক্ত মাতন তুলেছে; কেঁপে উঠেছে হরিপদ; নির্মম নিষ্পেষণে যমুনাকে বুকের কাছে টেনে নেয়, নিবিড় বন্ধনে তাকে পিষে ফেলতে চায়, লোহাঠোকা কঠিন বজ্রমুষ্টিতে তার মুখ টিপে ধরেছে হরিপদ। যমুনা প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে; ওর কব্জিতে বসিয়েছে ধারাল দাঁত! কেমন একটা নোনতা আস্বাদ। রক্ত বের হয়ে গেছে; তবুও নিষ্কৃতি নেই, হরিপদের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল যমুনা মেঝেতে,...উন্মত্ত জানোয়ারের মত লাফ দিয়ে পড়ে সে শিকারের উপর।

কেমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ছেয়ে ফেলে, পুঞ্জীভূত

অশ্রু বুক ঠেলে বের হয়ে আসতে চায়, চোখের সামনে হতে মুছে যায় অন্ধকার বনচ্ছায়া ; সব স্তব্ধ হয়ে গেছে—কোথায় ঝড় উঠেছে আকাশে আকাশে।

হরিপদ মিস্ত্রীর দু'চোখের আগুন জ্বালা স্তব্ধ হয়ে আসে ; রাত্রি গভীর, স্তব্ধ বনতল হতে সে বের হয়ে চলেছে, মদের নেশা—আর ক্লান্তি মিশে তার দেহ যেন ভেঙে পড়ছে ঘুমে।

নিতাই ওপাশে মড়ার মত অসাড়ে পড়ে আছে।...যমুনার দেহমনের উপর ঝড় বয়ে গেছে, অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে সে ; কাঁদছে—দুচোখে নেমে আসে অসহায় অপমানিতের অশ্রুধারা ; নির্মম পিশাচ ওই হরিপদই তার সর্বনাশের মূল। নিতাইকে সেইই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তার শান্ত গৃহাঙ্গন হতে — ছন্নছ করে তুলেছে তার জীবন ; যে পরম শুচিতাটুকু আজও অবশেষ ছিল—ওই নিষ্ঠুর দৈত্য নির্মমভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার সবটুকু !...

ঝড়ো সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে, ছিটকে পড়া ডাল পাতা ফুল দলের সঙ্গে মাটিতে পড়েছিল দু'একটা পাখীর বাসাও। দেহমন ঘৃণায় ভরে ওঠে,—হরিপদর বীভৎস চাহনি।...শিউরে ওঠে সর্বাঙ্গ। ওযেন এক অতীত রাত্রের দেখা দুঃস্বপ্ন ; সারাক্ষণ ভরে রেখেছে তার মন।

...কাঁদছে যমুনা—ওর সেই কান্নার কোন সাক্ষীও রইল না, চরম অপমানের কোন প্রতিবাদই সে করতে পারল না -- একান্ত অসহায় সে।

শচীন এখন অবস্থাও একটু ফিরিয়েছে। জীবিকা সংস্থানের উপায় সে খুঁজে বের করেছে একটা। এতদিন নানা কাজে ছিল—আজও আছে, তবে একটা আড্ডা সে গড়ে তুলেছে। বাজারের চৌমাথার পাশেই একখানা ঘর নিয়ে দোকান দিয়েছে।

—চা ঘর। ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্টেশনারী মালপত্র—তেল, সাবান ভর্তি কাঁচের আলমারী,...ব্রুকবণ্ড-লিপটন চায়ের প্যাকেট ভর্তি শো-কেস, এক কথায় সহরের মধ্যে।সবচেয়ে ফ্যাশানেবল দোকান। সরকারী অফিসার মহলে ও সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। লিপটনের কফি—কোকো জেম ও দুচার

কৌটা আছে এস-ডি-ও সাহেবের বাবুর্চির বরাদ্দ মত। আর বৈশিষ্ট্য এনেছে শচীন সহরের মধ্যে—খবরের কাগজের এজেন্সী নিয়ে।

…আগে মাত্র খানকয়েক কাগজ আসতো এখন অমৃতবাজার—আনন্দবাজার --বসুমতী সদ্য প্রকাশিত দেশ আসছে নিয়মিত।·· একদল লোক বিনা পয়সায় খবরের কাগজ পড়বার জন্য রোজই বিকালে জমায়েত হয়—সহরের সংবাদ সমালোচনাও হয় সেই সঙ্গে।

…বারোকোণার মামলা তুমুল চলেছে। ওকে কেন্দ্র করেই সহরের দুটো দল গড়ে উঠেছে। বসন্ত লাহিড়ী বিনা পয়সায় মামলা করছে সহরের যুবসম্প্রদায়ের হয়ে; নামডাকও বেড়েছে; সেই সঙ্গে পসারও।

'কাজল গাঁ বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক সেদিন ছ'পৃষ্ঠার জীর্ণ পত্রিকায় পুরানো ভিক্টোরিয়ার আমলের ছাপাখানার কাগজে বসন্ত লাহিড়ীর সম্বন্ধে এক পাতা প্রশংসা বাক্য লিখেছে।

মুরারী বলে ওঠে—আরসুলা আবার পাখী। বসন্ত যেমন উকিল—তেমনি জুটেছে কাজল গাঁ বান্ধব পত্রিকা।

তবু সহরের কোর্ট থেকে মামলা জিতেছে যুবসম্প্রদায়। হরেরামবাবু মামলায় একতরফা হাত দিতেই চেয়েছিলেন। গিন্নী দাবড়ে দেয়—ইয়ারকি নাকি, আজ মাঠ নিয়ে যাবে, কাল আসবে বাড়ী মহাল দখল করতে। জেলাকোর্টে মামলা করবো আমি।

হরেরামবাবু থেমে যান. স্ত্রীর মাতৃসম্পত্তি কিছু আছে। স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করলেই হয়তো অনর্থ বাধবে—না হয়, বঁটি দা নিয়েই তাড়া সুরু করবে।

দৈহিক ক্ষতি হবারও সম্ভাবনা আছে। তাই চুপ করে গেলেন তিনি। মামলার আপীল হ'ল জজকোর্টে। গিন্নী শাসায়।

—এখানে কি! হাইকোর্ট অবধি চালাবো মামলা, দরকার হয় প্রিভি কৌন্সিলেও যাবো।

হুংকার দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা বিশাল উদরে জড়াবার চেষ্টা করে।

যুবসম্প্রদায়ও উঠে পড়ে লেগেছে। বাজার থেকে চাঁদা উঠছে, দোকানদারও দিতে বাধ্য হয়েছে তাদের হুমকিতে। অদনী হাটিকেও ধমক দেয় তারা,

—দেবেন না মানে ? জমিদার বলে ওকে এতো ভয় ? নদীর ধারে গুদোম আছে না আপনার ?

…জেল ফেরত ছেলে ওরা, দু'কান কাটা সেপাই। সব পারে। অবনীহাটি বলে ওঠে কর্মচারীকে—দাও হে কিছু টাকা। হ্যাঁ—ঈশ্বরবৃত্তি খাতে খরচটা লিখো। দিতে কি ইচ্ছে করে না বাবা, কিন্তু আমাদের হয়েছে দা কুমড়োর ব্যাপার। কুমড়োর উপর দা পড়লে ও কুমড়োর বিনাশ, দায়ের উপর পড়লেও তাইই। যাই কোনদিকে বলো দিকিন ?

…শচীন হয়েছে ক্যাসিয়ার। হুট করতে সহরে ছুটছে, মালপত্র আসছে তার আর মামলার দিন পড়ছে ঘন ঘন। চা-ঘর এখন সহরের অন্যতম ব্যস্ত কর্ম-কেন্দ্র। শচীনকে কেন্দ্র করেই আজকের নবজাতক কাজল গাঁ বিবর্তিত হচ্ছে।

এ যুগের বেনিয়াতন্ত্রের সদ্য উপাসক—ঘৃণ্য রাজনীতি, বিকৃত সমাজ-ব্যবস্থা রূপায়িত হতে চলেছে ধীরে ধীরে ; কাজল গাঁ এই চিরন্তন বিবর্তনের ধারা থেকে অব্যাহতি পায় নি। দেশ-কাল-নীতি ও মানুষকে তার মত করে গড়ে পিটে তুলছে নীরবে—মহাজীবনের ছন্দে ছন্দে, কর্মব্যস্ত দিনে রাত্রে।

রাত্রির নিস্তব্ধতাময় তমসার মাঝে জ্বলছে একটি ক্ষীণ শিখা—বাতাসে কাঁপছে, নিভু নিভু হয়ে আসছে। সন্তর্পণে মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোটুকুকে ঘিরে রেখেছেন মদনবাবু। রাত্রি কত জানেন না,…

ঘড়িটা সময়মত দম দেওয়ার অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে, ঘরময় ছিটিয়ে পড়ে আছে বই খাতা,…রাত্রির আকাশে জেগে উঠেছে বর্ষার প্রথম সজল মেঘের অঙ্গনে—স্নিগ্ধ তারাফুল। কোথায় ডাকছে রাতজাগা পাখী ; দমকা বাতাসে উড়ছে পাতাগুলো, কলম থামিয়ে কি যেন ভাবছেন তিনি।

…আজকের টলমলো রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো ; বিপর্যস্ত সমাজ জীবনের বুকে পা ফেলে আসছে নোতুন দিনের সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত। এই মাৎস্যন্যায়ের দিনগুলো তবু অফুরন্ত। ক্ষুদ্র মাছ চিরকালই বৃহৎ মৎস্যকুলের উদরেই শেষ আশ্রয় লাভ করেছে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ। বাংলার শস্যশ্যামল দিনগুলো শেষ হয়ে আসছে। বৌদ্ধ-হিন্দুধর্মের সংঘাত উঠেছে। সমৃদ্ধশালী তাম্রলিপ্তের তীরভূমি

হতে সমুদ্র সরে যাচ্ছে। দেশবিদেশের পণ্যবাহী নৌবহর আর আসে না ; হিয়েন সাংএর দল ফিরে গেছে—মজাবন্দরের বুকে ধ্বংসস্তূপের মাঝে পড়ে আছে ভাঙ্গা মাস্তুল।

কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাংকও দিন গুনছে, বাংলার রাজশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে বণিক্-শ্রেষ্ঠীসমাজের চক্রান্তে। হস্তান্তর হচ্ছে—ক্ষমতা ;…স্বর্ণস্বপ্ন নিঃশেষ হয়ে আসছে। বংশ কৌলীন্য মুছে গিয়ে জন্ম নিচ্ছে কাঞ্চনকৌলিন্য। সাহিত্য—সংস্কৃতি-শিল্পধারার মাঝে এসেছে স্তব্ধতা ; উচ্ছৃংখলতায় ভরে গেছে দেশের অন্তপ্রত্যন্ত। বর্ণ শংকরত্ব সমাজের বুকে আশ্রয় পেয়েছে।

থেমে গেলেন মদনবাবু ;…মনে হয় কয়েক শতাব্দী পরেও সেই দিন বদলায় নি ; কয়েকটি মাত্র সত্য—বার বার আবর্তিত হয়ে এসেছে মানুষের জীবনে। কয়েকটি মতবাদ—কয়েকটি নীতিই মানুষ গ্রহণ করেছে সমাজাশ্রয়ী রাষ্ট্রে ; তারই পুনরাবৃত্তি চলেছে পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসে,…মানুষের চিন্তাধারায়।

শ্রেষ্ঠী শাসন—কাঞ্চনকৌলিন্যের যুগও বদলে গেছে কালের আবর্তনে। বিদেশী বাণিজ্য বাংলার বুকে গড়ে তুলেছিল নোতুন সম্পদ।

এখানকার শ্রেষ্ঠীদের নৌবহর—যেত জাভা—সুমাত্রা—শ্যাম, কম্বোজে ; পশ্চিমে গ্রীস আরব অবধি। কিন্তু বাংলার সপ্তগ্রাম—তাম্রলিপ্তের মৃত্যুর সংগে সংগেই অন্ধকার যুগ নেমে এল, অর্থ আগমনও কমে গেল—ব্যর্থ-মনা সমাজের অন্তরে পুঞ্জীভূত হতাশা মাথা তুলছে ; গ্রাস করলো ধ্বংসপ্রায় রাজতন্ত্র—বণিকতন্ত্রকে নবজাগ্রত ব্যর্থতা বিদ্রোহের আগুনে। সে আগুনে পুড়ে ছাই হোল কর্ণসুবর্ণের গৌরবময় দিন—বারোদেউল, সপ্তগ্রাম—কানসোনা, ভুরিশ্রেষ্ঠ পরগনা। উত্তর রাঢ় হতে দক্ষিণ রাঢ় অবধি বিস্তৃত হোল সেই সামাজিক বিপর্যয় ; করালগ্রাসী ভাংগন।

…আজকের ভারত জোড়া সেই আলোড়নের সামান্য রূপ বদলানো পুনরাবৃত্তিই ঘটতে চলেছে। কাজল গাঁ তার থেকে বাদ যায় নি। সপ্তম শতকের শেষ সীমায় যে মহাকালের পদধ্বনি ধ্বনিত হয়েছিল আকাশে আকাশে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদেও সেই দিন নীরবে আসছে—বিস্মৃত চিতাভস্ম থেকে উঠে আসছে

জটাজুটধারী মহাকাল—বিভূতিভূষিত অংগ ; হাতের ডমরুধ্বনি ভরে তুলেছে গুরু গুরু শব্দে পূর্ব পশ্চিম বিস্তৃত আকাশঅংগন, ঝলসে উঠছে তার তৃতীয় নয়নবহ্নি—যুগযুগ সঞ্চিত বিপ্লবের অগ্নিজ্বালায়।

নিতাই মটরকোম্পানীর গ্যারেজেই চাকরী সুরু করেছে। বেশীর ভাগ সময় থাকে বহরমপুরের গ্যারেজে ; বাসকোম্পানীর কারখানা সেইখানেই। টুকিটাকি মেরামত—পুরানো চেসিসের উপর বডি তৈরী করা ; স্প্রেপেন্টিং—মোটামুটি মেরামতি কাজ সেইখানেই হয় ; কালামদনের তাঁবে থাকে, হাফপ্যাণ্ট পরেছে—গায়ে তেলকালিমাখা হাফসার্ট ; হাতের মুঠোয় খানিকটা কটনওয়েস্ট নিয়ে পাকা মিস্ত্রীর চালে কাজল গাঁ এ্যাটোমোবাইল এসোসিয়েশনের মিস্ত্রীগিরি করছে। গলায় কণ্ঠিগুলো ছিঁড়ে আসছে ; আর নোতুন করে মালা পরেনি, একটুকরো এখনও ঝুলছে কণ্ঠে ; কবে শেষ হয়ে যাবে। নামটাই তার পুরোনো বৃত্তির শেষ পরিচয় হয়ে টিকে আছে।

নিতাই, হরিপদ আর বিশু পানওয়ালা চলতি কথায় মটরকোম্পানীর থ্রি মাসস্কেটিয়ার্স। কাঁচাপয়সার মুখ এর আগে দেখেনি নিতাই, মাধুকরী করে মুষ্টি ভিক্ষায় যা পেয়েছে তাই নিয়েই তৃপ্ত হয়েছিল, আজ সেদিনগুলোর কথা ভাবলে হাসি আসে।

যমুনা সেই জগতের—অচল জীবনের সংগী ছিল ; সেই জীবন থেকে সরে এসে চেয়েছিল যমুনাকেও টেনে আনতে এই পথে। যমুনা তাকে সহ্য করতে পারেনি। ওই মদ্যপস্বভাব—আর বিশ্রী জীবনযাত্রাকে যমুনা ঘৃণা করে।

—কেন যাবিনি ? তুই কি আমার মালাচন্দনের সেবাদাসী লস্ ?

ফোঁস করে ওঠে যমুনা—তুই কি আর ভেকধারী বাবাজী আছিস্ ? এপথে কেন গেলি তুই ?

বিরক্ত হয়ে ওঠে নিতাই—ধ্যাৎ ফুঁসি, কেবল কান্না আর কান্না। গায়ে হাত দিতে গেলেই—সেই এককথা ঘেন্নায় মরে যাই। বলি তুকে কি কাচের আলমারিতে বসিয়ে রেখে দোব ? যত সব ন্যাকামি।

মটরকোম্পানীর যান্ত্রিক জীবনযাত্রা, কাঁচা পয়সা আর গতিময় জীবন নিতাইএর মনে আগাগোড়া পরিবর্তন এনেছে, দুর্দাম গতিতে এসেছে তার মনে কামনার নেশা, যমুনাকে সে আজ পায় না। কি এক বাধার পাঁচীল উঠেছে সেখানে।···ক্ষুব্ধ হয়ে বের হয়ে এল নিতাই। গজ গজ করছে,

—কেবল ঠাকুর আর ধম্মো। ভোগ বিলেস নাই—কাঁচকলার রসা খেয়েই সব ফোৎ হয়ে গেছে।

···আজ গঙ্গামণির পাড়ায় সে বাঁধা খদ্দের—বিশু গুণ্ডার এক গেলাসী দোস্ত। সন্ধ্যার অন্ধকারে তার কেডস্ হাফপ্যাণ্ট পরা মূর্তিটাকে ওপাড়ায় প্রায়ই দেখা যায় কার দরজা ঠেলছে।

—এ্যাই!

দু একজন দোস্ত রসিকতা করে—বাবাজী কি নিরামিষা ভোগ খুঁজছো?

নিতাই হাসে—রাইট্। অল রাইট্।

···ইংরাজী বুলিও শিখেছে কয়েকটা। জীবনের গীতি পথ তার পুরোপুরি বদলেছে। এ কোন দুর্বার ভোগবিলাসের জীবন বাবাজীর মনে তুফান এনেছে।

যমুনা হঠাৎ আবিষ্কার করে তার জীবনের পরম নিষ্ঠুর সত্যকে। শিউরে ওঠে সে!···শিরায় শিরায় জাগে চাঞ্চল্য। সন্ধ্যার দীপ জ্বালতে ভুলে গেছে—নিস্তব্ধ বনভূমিতে সেরাত্রে সন্ধ্যাতারা উঠলো কেউ তাকে প্রদীপের আলো জেলে অভ্যর্থনা জানালো না।···কীর্তনের সুরও থেমে গেছে সেখানে। অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে যমুনা। কথাটা নিজেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু পরম নিষ্ঠুর এ সত্য।

···অতীতের এক সর্বনাশা রাত্রির কথা মনে পড়ে;···অন্ধকুয়াসার আবরণ ভেদ করে জ্বলন্ত শিখার মত জ্বালা আনে সারা দেহ মনে, নিষ্ঠুর দৈত্য কঠিন হাতে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার সব কিছু। নির্মম দৈত্য তার জীবনের শ্যাম-সজীবতাকে দলিত মথিত করে দিল। আজ মনে হয় সহরঘেঁষা জীবনে সে না

এলেই ভালো করতো। নিতাই বাধা দিয়েছিল প্রথম যখন তারা এখানে আসে ঘুরতে ঘুরতে।

—ইখানে থাকিস না যমুনা, বাড়ন্ত জায়গা, দিন এখানে চিরকাল এক থাকবে না! মতিগতি—সাধনভজন সব শিকেয় উঠবে শেষকালে।

নিতাইএর কথায় হেসেছিল যমুনা—না গো না,…তুমি আমি ঠিক থাকলে সব হবে। এমন কুঞ্জবন—নদীর ধার—বেশ মনে বসছে।

হেসেছিল নিতাই—মন মজেছে বল যমুনা।

সে আজ কয়েক বৎসর আগেকার কথা; তখন মটর চলতে সুরু হয়েছে সবে, কাজল গাঁয়ে নোতুন পেট্রলের গন্ধ উড়ছে আকাশে বাতাসে। বিদেশী সভ্যতার নীরব পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে দূর দিগন্তে।

…নিতাই পুরুষ, জীবনে ওদের চিরকালের অতৃপ্তি, হঠাৎ সেইই প্রথম আবিষ্কার করেছে এই বৈচিত্র্যহীন জীবনে পরিবর্তন দরকার। তার সদ্য জাগর মন—পিছনে ফেলে গেল অতীত দিনগুলো—ঝাঁপ দিয়ে পড়লো নবাগত যুগাবর্তের মাঝে—ভেসে চলেছে দুর্বার স্রোতে, এর শেষ কোথায় ওর তা জানা নেই।

আজ যমুনা সেই পথ মেনে নিতে পারে নি। সংস্কারময় নারী মন নোতুনকে মেনে নিতে পারে নি, পারলে হয়তো ছিল ভালো, সুখী হোতে পারত সে। গা ঢেলে দিত বিলাসের স্রোতে। সহরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু মন তাতে সায় দেয় নি। ঘৃণা করেছে ওই উন্মাদদিকে।

ওদের সহ্য করতে পারে না আজ। নিজের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে; নিতাইও আর আসে না, খোঁজ-খপর নেয় না।

সে আজ অন্যত্র বাসা বেঁধেছে। যমুনার জীবনে এতবড় দুর্দিন আর আসে নি; দেহের অনুপরমাণুতে জন্ম নিয়েছে কোন অনাগত রক্তবীজের বংশধর; শিউরে ওঠে সে—কোনদিনই ভুলতে পারেনি সেই মুহূর্তটিকে, একটা দানব পৈশাচিক বীভৎসতায় তার উপর চালিয়েছিল জঘন্য অত্যাচারের নির্মম বিজয়-রথ। সারা মন বিষিয়ে উঠেছে—ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছে তার দেহ।…তিলে তিলে বেড়ে চলেছে সেই মহাশত্রু তাকেই কেন্দ্র করে।

…হঠাৎ বাগানের মধ্যে টর্চের আলো দেখে শিউরে ওঠে যমুনা ; তার দেহটা যেন কুকুরের কাছে পচা মাংসপিণ্ড হয়ে উঠেছে, দিনরাত চিল শকুনি আর ঘেয়ো কুকুরগুলো ফিরছে আশপাশে, লোলুপ দৃষ্টিতে। বিরক্ত হয়ে উঠেছে যমুনা।

—কোন মুখপোড়া রে ?

—আমি !

…সামনে এসে দাঁড়াল ফটিক ; গলার স্বর শুনে চিনতে পারে যমুনা ; মাঝে মাঝে আসে ও। নীরবে আসে—একটু বসে ; দুচারটা কথা বলে চলে যায় আবার। কোনদিন মুখ তুলে চায়ও নি,—চাইবার সাহস তার নেই। মনের আগুন মনেই জ্বলে ধিকি ধিকি। এত দুঃখেও ওকে দেখে হেসে ফেলে যমুনা ; —মরণ আমার ; তুমি আবার রাতদুপুরে কেনে ?

—আসতে নেই ?

যমুনা বলে ওঠে—তোমাদের রাতদুপুর ছাড়া দিনের আলোয় আসা কি চলে ভাই ? লোকে দেখে ফেলবেক যে। আমাদের দু'কান কাটা ; তোমাদের ফর্সা মুখে চুনকালি বড় বাজবে যে ভাই ? আমরা তো কালামুখী—কলঙ্কিনী।

ফটিক কথা বলে না, নিজেও বুঝতে পারে না কেনই বা সে দুর্বার আকর্ষণ, কামনার কোন জ্বালা এখানে নেই, তার জন্য গঙ্গামণির পাড়া আছে, আর পয়সারও অভাব নেই। তবু যমুনা ওকে চিমটি কেটে ছাড়া কথা বলে না। তবুও ভাল লাগে ফটিকের, ওই হাসি—ওর নিঃস্ব ব্যথাতুর বঞ্চনাময় জীবনকে ভাল বেসেছে মনে মনে।

বলে ওঠে ফটিক—নিতাই তোমাকে ঠকিয়েছে, তাই বলে সব পুরুষই ঠকাতে আসে না।

দুচোখের ভ্রু এক হয়ে আসে যমুনার উদ্যত ধনুকের মত। চোখ দুটোতে কৃত্রিম বিস্ময়ের ছায়া—তাই নাকি ! মাগো মা ! আগে জানলে এমন বিপাকে ঘুরে মরতাম না।

হঠাৎ সরল হাসিতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে কণ্ঠস্বর—চল কেনে তোমাকে নিয়েই মালা চন্দন করি। এমন দরদী মনের মানুষ গেলে—'স্বর্গেও যাবো না কোনদিন।

ফটিক নীরবে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে ; যমুনা হাসছে। গালের দুদিকে পড়েছে ছোট্ট মিষ্টি টোল, টকটকে ফর্সা ঘাড়ের উপর ভেংগে পড়েছে খোঁপাটা।

—অমন হাঁ করে চেয়ে দেখছো কি ? উবু উবু গিলেই ফেলবো নাকি ?

—অনেক সুন্দর হয়েছ তুমি। আগের থেকে ঢের বেশী সুন্দর।

চমকে ওঠে যমুনা ; শিউরে ওঠে সারা মন। তবে কি বুঝতে পেরেছে সে ! অনুমান করেছে তার চরমতম বিপদের কাহিনী! দুঃসহ লজ্জায় ভেংগে পড়ে অসহায় নারী ; ফটিককে সে এই জঘন্যতম অপমানের পরিচয় জানতে দিতে চায় না সে।

…কি হোল ? ফটিক এগিয়ে যায় তার দিকে।

রহস্যময়ীর মত স্তব্ধ হয়ে বসে কাঁদছে সে।

রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে ফটিক ! পা দুটো কে যেন আটকে দিয়েছে তার মাটির সংগে। হঠাৎ প্রশ্ন করে ওঠে যমুনা।

—মদ খাওনা আর ?

চুপ করে থাকে ফটিক। মদ সে ছেড়েই দিয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে শচীনের সংগে মেলামেশা ! বন্ধু-বান্ধবদের সংগেও মেলামেশা কমে গেছে। এটা যমুনারও দৃষ্টি এড়ায় নি। বড়লোকের ছেলে হঠাৎ এমন বদলে যাওয়াটা কাজের কথা নয় ! যমুনা ওই দৃষ্টির অর্থ বোঝে ; মনের অতলে কোথায় যেন ভাংগাগড়া চলেছে তার। এক মুহূর্তের ইংগিতে যমুনা ওকে পথে নামাতে পারে, কিন্তু তা চায় না যমুনা। ওই ভালবাসার ছোঁয়াটুকুই ভালো—বেশী ঘাঁটালে পাঁকই উঠবে। কিন্তু ! ও যেদিন জানতে পারবে যমুনার জীবনের কালো পরিচয়টা—সেদিন ! কি যেন ভাবছে যমুনা।…মনস্থির করে ফেলেছে সে আজই। তবু কেন জানেনা—আজ পৃথিবীকে ভাল লাগে—কিন্তু কোথায় তার অধিকার—কতটুকু তার দাবী ?

যমুনা আজ যেন অন্য রকম হয়ে উঠেছে। সেই ধারালো ফলার মত কথাগুলোও থেমে গেছে। কাছে এগিয়ে আসে সে।

—কেন রোজ রোজ আসো বলো ত ? কি তুমি পাও ছোটবাবু ?

সোজা কথায় চমকে ওঠে ফটিক। জবাব দেয়,

—চাই না কিছুই, না এসে তবু পারি না।

—না এলেই ভালো ছোটবাবু। মনের বশ হয়ো না—মন কে বশ করো।

ফটিক শোনে কথাটা ; জীবনের সব আলো আজ জ্বলে উঠেছে ওই একজনকে কেন্দ্র করেই।

ও যেন কত আপন জন। চলতি পথের বাঁকে—কে যেন সহসা উঠে এসেছে ; আপন করে নিয়েছে তাকে নিবিড়তরভাবে।

…চেয়ে রয়েছে যমুনা ওর দিকে নিষ্পলক চাহনিতে, আকাশের তারায় তারায় প্রতিবিম্ব। যমুনার হাতখানা তার হাতে।

…একটু উত্তপ্ত স্পর্শ ; শিউরে ওঠে ফটিক। কতদিনের ব্যাকুল আশা তার সফল হতে চলেছে ! মন ভরে ওঠে পূর্ণতার স্বাদে।

—ছোটবাবু, বিয়ে থা করে সংসারী হও, এমনি আলেয়ার পিছু পিছু ঘুরো না। তোমরা সমাজের মাথা ; বড় হবে—বটগাছের মত বহুজনকে আশ্রয় দেবে—শান্তি দেবে রোদের তাপে। এ ভাবে নষ্ট করোনা নিজেকে।

—যমুনা ! ফটিক চেয়ে রয়েছে তার দিকে। অতল অন্ধকারে ডুবে গেছে পৃথিবী ; মুছে গেল ক্ষুরধার নদীর ব্যাকুল তৃষ্ণাময় আর্তনাদ। শ্যাম সজীবতা ঘিরে উঠেছে সব কিছু জুড়ে ; অনাবিল স্তব্ধ প্রশান্তি ছেয়ে দিয়েছে ধরণীকে। জীবনের পরম লগ্ন।

…যমুনা উঠে দাঁড়ালো,—নিজের উদ্গত কামনাকে নীরবে নিঃশেষ করেছে সে। গ্লানিতে ভরে ওঠে মন ; এত সুন্দর—এত উদার—মধুময় পৃথিবী, তার কাছে এর অন্ধকার জগৎটাই বড় হয়ে রইল, জীবনকে চিনলো সে কদর্যতার মাঝে।

—যাও, রাত অনেক হয়েছে। আবার বৃষ্টি নামবে।

একাই বসে আছে যমুনা। সারা শরীরে সেই নবাগত রক্তবীজ ; শিউরে ওঠে সে।

একরাত্রে নিষ্ঠুর পিশাচ এসে তার আশা আনন্দভরা জগতের সব আলোই একটি ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে গেল। তবু কোন ক্ষোভ এই পৃথিবীর মানুষের উপর তার নেই। আঘাত পেয়েছে সে নিদারুণভাবে—অপমানিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে ওদের হাতে! হরিমিস্ত্রী, নিতাই বিশুর মাঝেই বাস করে অনিমেষ—ফটিকদের মত মানুষ। মানুষকে অশ্রদ্ধা করবে কেমন করে ? সবই, সবই তার অদৃষ্ট। ভালোমন্দ, আলোছায়ার জগৎ। একসূত্রে বাঁধা জগৎ—কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটাই সম্পূর্ণ নয়।

মনীষা সেই রাত্রের ঘটনাটাকে ভুলতে পারে না ; মঞ্জুর উদ্গত যৌবন—উচ্ছল কলহাস্যময় রূপ যে কোন পুরুষের কাছেই আকর্ষণীয়।

অনিমেষের সারাদেহমনে তেমনি চিরসজীব কৈশোর ; সে মনেপ্রাণে তরুণ, কর্মঠ, তার আদর্শের কাছে জীবনের স্তিমিত গতির ঠাঁই নেই ; অফুরান প্রাণ প্রাচুর্যময় যৌবন—চিরদিনই সন্ধান করে সে তারই পরিপূরক মনকে, মঞ্জুকে তাই ভয় করে মনীষা।

জীবনের কর্মক্লান্ত পথ বয়ে এসেছে সে, মেয়েদের জীবনে যৌবন আসে দুর্বার বন্যাস্রোতের মত, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, দুকূল প্লাবিত করে প্রবাহিত হয়, তার কল্লোল যেন পাহাড়ী নদীর বন্যা—গতিবেগ তার তীব্র কিন্তু স্বল্পস্থায়ী। জলস্রোত নিঃশেষ হয়ে গেলে আবার জেগে ওঠে ক্লেদাক্ত জীবন ; মরা পলিতে পড়ে থাকে বানে ভাসা পচা ডালপালা, মরা ফুলদল। মনীষার যৌবন গাংএ এসেছে স্তিমিতধারা।

আজ মনে হয় ফুরিয়ে আসছে সে। অপরাহ্ণ বেলায় স্কুল থেকে ফিরে এসে ক্লান্ত হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে সে। এ চিন্তার শেষ নেই। ব্যর্থ যৌবন—আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ক'দিন অনিমেষ আসেনি। দেখাও হয়নি। মনে হয় অনিমেষ যেন সেই রাত্রির পর থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে ; কাঙ্গালমন তাই হাহাকর করে ওঠে।...জীবন দুর্বিসহ বোঝায় পরিণত হয়েছে।

সাইকেলের বেল শুনে বের হয়ে আসে। সাইকেলটা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে ঢুকছে অনিমেষ।...অসংযত কাপড়খানাকে গায়ে তুলে নেয়।...স্কুল থেকে ফিরে স্নান সেরে ওঠেনি, বর্ষার গুমোট গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

—এসো। ক'দিন দেখা নেই যে ? ভাবলাম বুঝি ব্যস্ত হয়ে রয়েছো। হ্যাঁ ভালো কথা—মঞ্জু কাল এসেছিল, প্রাইভেট আই. এ. দেবে, পড়াশোনা করছে, আমাকে একটু দেখিয়ে দিতে হবে।

মঞ্জুর প্রসঙ্গ আসতে বিস্মিত হয় অনিমেষ। বলে ওঠে,

—বেশ তো, পড়াও। পাশ করতে পারে। বুদ্ধিশুদ্ধি আছে বলে ত মনে হয়।

হাসে মনীষা—তা যথেষ্ট আছে। যেন শ্লেষই করছে মনীষা।

—মানে ? অনিমেষ প্রশ্ন করে।

—এমনিই। হাসতে থাকে মনীষা। কথার জবাব দিল না। অনিমেষ ওর মুখের দিকে চেয়ে কিসের সন্ধান করতে থাকে।

মদনবাবু রোজকার মত বেড়াতে বের হয়েছেন—

—মনিমা !

…হুঙ্কার ছেড়ে তরুণ বৃদ্ধ প্রবেশ করলো, হাতের লাঠিটা কোণে রেখে নিজেই চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

— তারপর ডাক্তার, বলো খবর কি ?

…ভালোই ! আপনার ?

—বর্তমানের সংবাদ আর অতীতের তথ্য সব একাকার হয়ে গেছে আমার কাছে। দেখছি কালস্য কুটিলা গতি ! তবে চাকার মত পাকই খাচ্ছে অনবরত ; অন্তহীন পাক ; শেষ নেই এর।

স্কুলের সংবাদ সবই নেন তিনি ; কলেজ করবার জন্য মেতে উঠেছেন। হাসে মনীষা—আবার কলেজ করবেন ?

—কেন ? তুমি আমি না করলেও কলেজ হবে। ফাঁক থেকে রথের দড়িতে হাত লাগিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতে আপত্তি কি ? কারোর জন্য কিছু আটকায় না মা ; মহাকাল তার পথ ঠিকই করে নেয়। কি বল ডাক্তার—হাসপাতাল কি কাজল গাঁয়ে হতো না ? হতো ঠিকই—ফাঁক থেকে কিস্তিমাৎ করে দিল অনিমেষ ডাক্তার।

…সন্ধ্যা নেমে আসছে। চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে উঠে পড়লেন মদনবাবু।

—উঠছেন যে !

— হ্যাঁ মা, রাত্রে আবার পথ ঘাট ভালো দেখতে পাই না। তা ছাড়া কাজও অনেক বাকী আছে।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ওরা দুজনে। মাঝখানে যেন অন্তহীন ব্যবধান।

—মনীষা !…অনিমেষের ডাকে মুখ তুলে চাইল সে।

…কি যেন বলতে চায় সে—সেই রাত্রে কোথায় তুমি যেন ভুল বুঝেছো আমাকে !

গম্ভীর হয়ে ওঠে মনীষা, কি ভেবে বলে ওঠে সে,

—মেয়ের হয়ে বুঝি কি জানো ? সবচেয়ে দুর্বল মেয়েরাই ; একটি মুহূর্তের ভুল তাদের জীবনকে বদলে দিতে যথেষ্ট। ভালোর দিকেও যেতে পারে—তার চেয়ে বেগে নেমে যাওয়া সম্ভব নীচের দিকেও।

—কি বলছো তুমি ? ঝড়ের রাতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল মাত্র। অনিমেষ কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা

—ঝড়টাই আপন পর চিনবার পক্ষে যথেষ্ট।

অনিমেষ যেন থমকে গেছে—ওসব কথা বলে কি এড়িয়ে যেতে চাও মনীষা ?

হাসে মনীষা—সামনাসামনিই পড়লাম না যার ; তাকে এড়াবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অভিমানে ভরে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর।

সবই যেন হেঁয়ালি বলে মনে হয় অনিমেষের। ডাক্তারি শাস্ত্রে মনস্তত্ত্ব কিছু পড়ানো হয়, পড়েছেও, ব্যবহারিক জীবনে ও কিছু দেখে শিখেছে। কিন্তু তার শিক্ষা যে কত সামান্য বাস্তবক্ষেত্রের জটিলতার তুলনায়—আজ তা বেশ বুঝতে পারে সে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে উঠে গেল মনীষা, শচীনের লোক—খবরের কাগজ পেঁাছে দিতে এসেছে। বৈকালে আসবার কথা। বানের জন্য দ্বারকা নদীর খেয়া বন্ধ ছিল ; তাই দেরী হয়ে গেছে। অনিমেষের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওই কাগজখানাকে কেন্দ্র করে মহানগরীর কথা—স্বপ্নময় দিনগুলো। আজ সব যেন অতল তমসায় মিলিয়ে গেছে। অন্ধকারে কোন দূর প্রান্তে নির্বাসনজীবন যাপন করছে সে একাকী, নিঃসঙ্গ—ক্লান্ত।

– চলি !

মনীষা দরজার কাছ অবধি এগিয়ে দিতে এলো ; আবছা অন্ধকার, হঠাৎ চমকে ওঠে মনীষা ; অনিমেষ ওর হাতখানা ধরেছে ; স্তব্ধ হয়ে আসে মনীষার মনের আলোড়ন। অনুভব করে ওর অন্তরের ঝড় ; বাদলরাতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ছলনাময়ী নারী ওর দিকে ; এ চাহনিতে কোন দ্বিধা সংকোচ নেই।…একটি মুহূর্তে মনীষার সব আবরণ ভেদ করে শাশ্বত নারীত্ব ফুটে ওঠে, কামনামদির সে চাহনির অর্থ বোঝে অনিমেষ ; নিজেকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেও পারে না মনীষা।

—হাতছাড়ো, ঝি দেখতে পাবে।

ধরতে গিয়েও পারল না মনীষা—কোথায় যেন ফাঁক একটা গড়ে উঠছে তার অজ্ঞাতসারেই নিজের মনে।

অনিমেষ নেমে গেল সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে; দমকা বাতাসে ঝরে পড়ে বর্ষণ-ক্লান্ত পত্র দল হতে সঞ্চিত বৃষ্টির জলকণা। মনীষা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনিমেষকে যতবার যাচাই করতে গেছে—মিথ্যা অভিযোগ এনেছে তার বিরুদ্ধে অন্তরের অন্তর থেকে কে প্রতিবাদ করেছে বার বার। সেই অন্যমন আজ বড় হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে একটি মুহূর্তের নিবিড় স্পর্শে। সমস্ত ক্লান্তি শূন্যতা তাকে স্পর্শ করেনি কোনদিন। আজও সেই মন বেঁচে আছে।

সেইমন আজ হাহাকার করছে। নীরব কান্নায় ব্যথিত করে তুলেছে তার সত্তা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মঞ্জুর মুখখানা।

প্রথম ফোটা বর্ষার রজনীগন্ধার শুচি শুভ্রতা ওতে মাখানো—একটি স্নিগ্ধ সুবাস ঘিরে রয়েছে ওর চারপাশে। সবুজ সতেজ ওর বৃন্ত। মনীষা!··· জীবনের বহু বৎসর কেটে গেছে বৃথাই পথ চেয়ে আর ব্যর্থ বসন্তের দিনগুণে। কোন ভ্রমরই আসেনি তাতে। সে আজ বিশীর্ণ··মলিন, কীটদষ্টা। নিজের মনেই আজ মঞ্জুকে সে হিংসা করে সব থেকে বেশী।

যে অনিমেষ তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল—সেই অনিমেষ তাই হয়তো বার বার কাছে পেয়েও তাকে ডাক দেয়নি—যে ডাক শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়েছিল মনীষা। মঞ্জু তাকে পথভুলিয়ে নিয়ে গেছে তাঁর যৌবনের শ্যাম উপবনের বসন্তের মধুমেলায়। অনিমেষ পথ হারিয়ে ফেলেছে।

···কাজল গাঁ তার কাছে প্রাণহীন হয়ে উঠছে। পরক্ষণেই বেদনা রঙীন অন্তর সতেজ হয়ে ওঠে—এ কোন ভিন্ন মনীষা জেগে উঠছে। আহত ফণিনীর মত গর্জাচ্ছে তার অন্তরাত্মা; নিজেকে পরাজিত রক্তাক্ত হয়ে ব্যর্থ হতে দেবে না। ব্যর্থ নারীত্ব জন্ম নেয় ভিন্ন সত্তায়; মনীষা কি ভাবছে। অনিমেষ নিঃশেষে কোনদিন আসবে না তার কাছে—অভিনয় করতেই আসবে। এর জবাব সে দিতে পারবে! দৃঢ়তর হয়ে ওঠে সারামন।

সকাল বেলাতেই সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ে। যমুনা মরেছে। তার প্রাণহীন দেহটা আনা হয়েছে হাসপাতালে। অনিমেষ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে; কালই এসেছিল সে। তার কথাগুলো মনে পড়ে—কলসী আমার শূন্যই রয়ে গেল দেবতা, সব জল যে পোকায় থিক্ থিক্ করছে। কলসী ভরি কোথায়। কি যেন নিবিড় অভিমানে চলে গেল সে পৃথিবী থেকে। কাজল গাঁ বান্ধব পত্রিকার এককোণে ছাপান হবে সংবাদটা।

মা হতে চলেছিল সে। গর্ভে তার ভ্রূণের অস্তিত্ব। এ কি!...জীবনের অন্ধকার দিকটাকেও ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না অনিমেষ। স্বেচ্ছায় এই ঘৃণ্য জীবন সে মেনে নেয়নি, নিতে পারেনি। তা হলে এমনি করে নিজেকে হত্যা করে এই চরম অপমানের প্রতিবাদ করে যেতো না। কিন্তু কে সেই অপরাধী সমাজ কোনদিনই জানবে না। কাজল গাঁয়ের লোকরা নিশ্চিন্ত হল: জনতার মধ্য থেকে কে যেন বলে ওঠে,

—বাগানে কুঞ্জবন গড়ে তুলে রাসলীলা করছিল আর কি?

ভিড়ের মধ্যে নিতাই হরিমিস্ত্রিও এসেছে। তারা বাঁশের খাটিয়াও এনেছে। বলে ওঠে নিতাই,

—প্যাটে প্যাটে ওর অনেক গুণ মিস্ত্রী; লইলে কি খামোখাই ছোড়-ছাড় করে দি। উটা নষ্টা মাগী। বুঝলে না?

হরিপদ মিস্ত্রী সায় দেয়—সিওর।

তবু পোড়াবার লোকের অভাব হোল না।

অনিমেষ অপিসে বসে আছে নীরবে; সিগারেটের পর সিগারেট ফুঁকছে। বার বার মনে পড়ে যমুনার মুখখানা—পাপের কোন চিহ্নই তাতে ফুটে ওঠে নি। অন্যায় সে কোনদিনই করেনি; কাজল গাঁয়ের আগামী বিষাক্ত জীবনই হয়তো জন্ম নিচ্ছিল তার গর্ভে; নিজের জীবনের বিনিময়ে তাকে অস্বীকার করে গেছে যমুনা।

যমুনা কাজল গাঁয়ের জীবনের একটি শান্ত মধুর সুর। বৈরাগ্যের গেরুয়ারংএ রঞ্জিত উদাসী একটি মন; সেও মুছে গেল। চলমান জীবনস্রোতের আবর্তে মিলিয়ে গেল একটি বুদবুদ, কেউ তার সংবাদ রাখবে না। কাজল গাঁয়ের

ইতিহাসে স্বৈরিণী নারীর কলঙ্কিত পরিচয়টুকু জেগে থাকবে কিছুদিন, তারপরই মৌন অতীতের অন্তরালে লজ্জায় মুখ লুকোবে সে চিরতরে।

...ছায়াঘন পথে পথে অার শোনা যাবে না তার সুরেলা গলার কীর্তন গান। রৌদ্রদগ্ধ ধূলিধূসর রাস্তায় বিরহিণী রাধার অন্তরের ব্যাকুল সুর ধ্বনিত হবে না কোনদিন।

সোই বৃন্দাবন আর নাহি যাওব
না গাওব রাধা গুণগান।
সোই মধুর লীলা আর নাহি পেখব
সকল হি ভেল অবসান॥

সব স্তব্ধ হয়ে গেল। মিশে গেল তার সুর দূর দিগন্তে।

অনিমেষ ভুলতে পারে না তার কথা গুলো। বেলা অনেক হয়েছে। কলরব থেমে গেছে পথে; সাইকেল ঠেলে বের হল বাড়ীর দিকে, সারা মনে কেমন উদাস একটা নিঃসঙ্গতা। যমুনা কেন—কাজল গাঁয়ের সব শ্যামলিমা—সজীব প্রাণ স্পন্দনের গতি এমনি করেই অতর্কিতে থেমে যাবে; নোতুন জীবনধারা আসছে—তার গতিপথে যা পড়বে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সে।

রমণবাবুর দিনগুলো কেটে চলেছে শান্ত স্তিমিত গতিতে। গঙ্গাতীরের ছায়াময় বাগান ঘিরে রয়েছে স্তব্ধতা। পাখীডাকা সবুজে—ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে একটি মানুষ আপনার গড়া মনোজগতে। তবুও মাঝে মাঝে মন যেন সায় দিতে পারে না। এ যেন সংসারে কাজের সব বিষয়টুকু ফাঁকি দিয়ে, পালিয়ে এসে তিনি স্বার্থপরের মত শান্তির সন্ধানে রয়েছেন। এ তাঁর পলায়নী মনোবৃত্তি।...দুঃখ কষ্ট সংঘাত—নীচতাকে মেনে নিয়ে—সমগ্রতার মাঝে সারাজীবন খুঁজে এসেছেন যে মহাজীবনকে—আজ তাঁর সেই অন্বেষণ করবার সামর্থ্য নিঃশেষে হয়ে গেছে। তাইই পালিয়ে এসেছেন পাট চুকিয়ে দিয়ে। কোথায় মনে হয় তিনি ভীরু; সারা জীবনের নীতিকে কোথায় অস্বীকার করতে বসেছেন এই নিষ্ক্রিয় জীবন বেদ মেনে নিয়ে।

...মনে মনে কোথায় সংঘাত দানা বেঁধে উঠেছে। নির্জনতা ছাপিয়ে কানে

আসে দূর থেকে কর্মব্যস্ত জীবনের কোলাহল; মটরের হর্ণ বাজছে দূরে;... মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, সংগ্রামী মন স্তব্ধ হয়ে বসেও শান্তি পায় না।

হঠাৎ মঞ্জুকে আসতে দেখে একটু বিস্মিত হন। বাগানের সরু পায়েচলা পথ দিয়ে আসছে মঞ্জু। আকাশী রংএর শাড়ী পরনে, বেণীটা দুলছে পিঠে; এই পরিবেশে ওকে মানায় বড় চমৎকার, শ্যাম সজীব একটু স্পর্শ নিয়ে মানুষের জগৎ থেকে নেমে এল কে এক নারী। ও যেন তার কেউ নয়; চিরন্তন শান্তি—সৃষ্টির প্রতীক।

—বারে; কই গেরুয়া—দাড়ি চুল কই? তবে আর কোথায় সন্ন্যাসী হলে?

মঞ্জু বাবাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল—ইস্, চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে তোমার।

—বস।

মঞ্জু চঞ্চল কিশোরীর মত বাগানময় ছুটোছুটি করে—বাঃ, পেঁপেগুলো চমৎকার হয়েছে তো! উস্—কত বাতাপি নেবু ধরেছে!

...আপনার খুসিতে আপনিই উচ্ছল সে।

—হঠাৎ কি মনে করে? বাড়ীর খবর ভালো?

...মঞ্জু ফিরে দাঁড়ালো; হঠাৎ ফুলে ওঠে তার ঠোঁট; রুদ্ধ অভিমানে ফুলছে সে, কান্নায় ভেঙে পড়ে;...রমণবাবু অবাক হয়ে যান ওর কান্নায়। মেয়েকে বুকে টেনে নেন, মাথায় পিঠে হাত বুলোতে থাকেন।

—চুপ কর! চুপ কর মঞ্জু।

...মঞ্জু অশ্রুভিজে কণ্ঠে বলে ওঠে—কেন চলে এসেছো আমাদিকে ছেড়ে? আমি কি করেছি অপরাধ? এমনি করে পর করে দেবে কেন?

—এই কথা! ছেড়ে এলাম কোথায়? দিনকতক বাইরে এসেছি মাত্র। সেই গায়ক-গায়িকার গল্প জানিস মঞ্জু?

মঞ্জু বাবার দিকে চেয়ে থাকে; রমণবাবু বলে চলেছেন—

...এক রাজসভায় গানের আসর বসেছে। রাত্রি প্রায় শেষ হতে চল্ল, গান তবু জমে না। গানের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, গায়িকা যেন আর গাইতে চাইছে

না, নিরাশ-হতাশ হয়ে পড়েছে সে। অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে গায়ক, ব'লে ওঠে,

বহুৎ গায়ি—থোড়ি রহি, অব থোড়ি ভি বিত যায়।

গায়ক কহ্‌তা - শুন্‌হো গায়কী, তাল ভংগ না হোয় ॥

…গায়কের কথা শুনে রাজা নিজে দিলেন গলার মুক্তাহার, রাজপুত্রও বসেছিল সে উপহার দিল হাতের স্বর্ণবলয়, ওদিকে বসেছিলেন এক সাধু; তিনি দিয়ে দিলেন তার কম্বলখানাই।

গায়ক-গায়িকা—সভাস্থ সকলেই অবাক। কি এমন কাণ্ড ঘটল যার জন্য এত অমূল্য উপহার দিয়ে বসলেন রাজা স্বয়ং, রাজপুত্রও এমন কি কৌপীনবস্ত ওই সাধু।

রাজা বলেন—বহুকাল রাজত্ব করলাম; জীবন শেষ হয়ে আসছে। শেষ ক'টা দিনও আর কেন লোভের মোহে পড়ে থাকি। তাই—

ভাবছি, সিংহাসন ছেড়ে বনবাসে যাবো। সবজীবনটাই চলে গেল—কি সঞ্চয় করে গেলাম।

রাজপুত্রও বলে ওঠে; মনে মনে আমি ত অতিষ্ঠ হয়ে গেছলাম, আজীবন রাজত্ব করে চলেছেন, মৃত্যুর আগেও সিংহাসন ছাড়বেন না, আমাকে রাজা হতে গেলে—ওই বৃদ্ধকে হত্যা করে তবেই রাজ্য নিতে হবে। ঠিক করেছিলাম—হত্যাই করবো। কিন্তু গায়কের কথা শুনে মনে হল—বাবার জীবন শেষ হবে কালক্রমে, তার দেরী নেই, মিছেমিছি আমি কেন আর সামান্য ক'টা দিনের জন্য পিতৃহত্যার অপরাধ করি! তাই উপহার দিলাম ওকে—ওর কাছে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ।

সভাসদরা তো অবাক, সাধু বলে ওঠেন—আজীবন সন্ন্যাস নিয়ে কাটালাম—ভগবানের অনুসন্ধান করে, কিন্তু সফল হতে পারিনি। শান্তিও পাইনি। তাই ভাবছিলাম—এই দুঃখকন্টময় জীবন ছেড়ে দিয়ে আবার সংসারাশ্রমে ফিরে যাবো। —হঠাৎ গায়কের কথা শুনে চমক ভাঙলো—মনে হ'ল সারাজীবন এই পথেই কাটালাম, মিছেমিছি আবার নোতুন করে বাঁধনমানার কোন সার্থকতা নেই। কিছু

পাই বা না পাই, তবু এই পথই আমার চরম পথ। তাই খুসি হয়ে আমার শেষ সম্বল ওই কম্বলখানাই দিয়ে দিলাম।

মঞ্জু বাবার দিকে চেয়ে থাকে, মধুর প্রশান্ত হাসিতে মুখ ভরে উঠেছে। স্তব্ধ বনতলে নেমেছে অলস মধ্যদিনের ক্লান্তি ; নীল নির্জন নদীতীরে কাজল কালো জলের প্রান্তে চিকে চিকে রূপালী বালুচরে যেন তন্দ্রা নেমেছে।···স্বপ্নের মত বয়ে চলেছে দু'একটা নৌকা বাদামপালে হাওয়া লেগেছে।

মঞ্জু বাবার দিকে চেয়ে আছে, তিনিও যেন ওই মহাজগতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছেন, মধুর কণ্ঠে বলে ওঠেন তিনি,

—আজীবন সংসারের মাঝেই শান্তির সন্ধান করেছি মা ; আজ বাইরে আসবার চেষ্টা করছি ; যেন মনের সাড়া পাই না। ওই গায়কের কথা আমার জীবনেও সত্যি ; সারাজীবনের নীতি—চলা পথ ছেড়ে শেষ জীবনে অন্য পথে আর নাই বা গেলাম!

মঞ্জু বাবার দিকে চেয়ে রয়েছে—দুচোখে তার হাসির আভা ; রমণবাবু কি যেন খুঁজছেন ; আজ মনে হয়—ভুলই করেছিলেন তিনি। কোথায় এসেছিলেন স্বর্গের সন্ধানে ? স্বর্গের সুষমা, আনন্দ পিছনে ফেলে রেখে।

মঞ্জুর হৃদয়ের বাঁধনহারা প্রীতি-শ্রদ্ধা, ভালবাসার মধ্যেই যেন তার খুঁজে পাওয়া নোতুন স্বর্গ আজ ধরা দিয়েছে।

প্রকৃতির বিস্তৃত বুকে ছড়ানো রূপ রস বর্ণ নিয়ে মানুষের অন্তর সত্তা তার মন। সেইখানেও আছে প্রশান্তি, আছে ভালবাসার স্বর্গ অবহেলা করে এসেছিলেন এ কোন শান্তির সন্ধান করতে!

অন্তি সন্তং নঃ জহাতি
অন্তি সন্তং নঃ পশ্যতি,
পশ্য দেবস্য কাব্যং
ন মমার, ন জীর্যতি।

কাছে আছে তবু তাকে দেখা যায় না, তারই মধ্যে বাস করেও তাকে চেনা যায় না ; বিরাট ধরণীর বুকে চলেছে সেই দেব কাব্য রচনা ; সে কাব্য কখনও মরে না, জীর্ণ হয় না। সে অজর—অমর।

প্রকৃতির বুকে শ্যামসজীবতায়, মানুষের অন্তরে স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-শ্রদ্ধার বর্ণালীতে রচিত হয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে কোন মহাকাব্য। এক যুগের মানবাত্মা, অন্য যুগের উত্তরসাধক অন্তরে নব মহিমায় আবর্তিত হয়ে চলেছে; ছন্দে-গানে-হাসিতে—ওই প্রেমের বিকাশ সেই কাব্যের অলংকরণ উপমা।...বিশাল প্রশান্তি ঢাকা পৃথিবী আর ক্ষুদ্রদেহের সীমার বাঁধনে বদ্ধ অসীম মানবাত্মার মহামিলন যেন ক্ষণিকের জন্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে রমণবাবুর মনে!...এ এক মধুরতম সত্যোপলব্ধি, মনের সপ্তসুর ঝংকৃত হয়ে ওঠে; সব কালো—আলো হয়ে যায়।

আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে বলে ওঠেন রমণবাবু—

—বাইরে কোথায় গেছি রে পাগলি?...তোদিকে ছেড়ে যাবার কথাও কোনদিন ভাবিনি।

হঠাৎ বাগানের বেড়ার দিকে নজর পড়তেই কৃত্রিম রোষভরে তিনি হেঁকে ওঠেন,

—রেণুপদ!

রেণুপদ মঞ্জুকে পাঠিয়ে আশেপাশে ঘুরছিল, লক্ষ্য করছিল ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়; হঠাৎ চোখে পড়ে গেছে রমণবাবুর। আমতা আমতা করে সে,

—মানে এসেছিলাম গংগাস্নান করতে, ভাবলাম প্রণাম করে যাই।

ধমকে ওঠেন রমণবাবু—তোমার মত পাপী বিষয়ী লোকের গংগাস্নানেও মনের পাপ ধুয়ে যাবে না। কি মতলবে এসেছো? সবই তোমার চক্রান্ত, তুমিই মঞ্জুকে নিয়ে এসেছো।

মঞ্জু হাসতে থাকে মুখ টিপে; রেণুপদ কথা বলে না, গোঁফজোড়াটা বার কতক নাড়াচাড়া দিয়ে থমকে দাঁড়াল।

—উঠে এসো, রোদে আর বনমানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। খুব হয়েছে।

রেণুপদ উঠে গিয়ে প্রণাম করলো তাঁকে, মনে মনে খুসী হয়েছে রেণুপদ। তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

আজ্ঞে ক'টার ট্রিপে যাবেন? সিট বলে আসি।

—খুব খুসী যে।

বারোদেউলের মামলায় সদরেও জিতেছে বসন্ত লাহিড়ী; সারা সহর জেগে উঠেছে। হরেরামবাবু মনে মনে আনন্দিতই হ'ন। গেল কিছু অর্থদণ্ড। হরেরাম-গিন্নীর জেদ আরও বেড়ে উঠেছে দ্বিগুণতর হয়ে—

—শোধ এর নিতেই হবে, হাইকোর্টে আপীল করবো।

ফটিক বলবার চেষ্টা করে—সে যে অনেক খরচ।

হরেরামবাবু আপত্তি করেন—ওই পড়া মাঠের দাম কি। যাক না, খেলাধুলো করবে ওরা, করুক। আর বারোবছরের উপর ওখানে ওদেরই দখল।

—মানে! ফোঁস করে ওঠে গিন্নী,—এমনি ছেড়ে দোব? মামলা চলবে।

সামন্ততান্ত্রিক ভূইহারের শেষ বহ্নিশিখা; অর্থের চেয়ে জেদ প্রতিষ্ঠার মূল্য রাখবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সে।

'চাঘরে' প্রতিপক্ষ তৈরী হচ্ছে। উৎসব অনুষ্ঠানের পর সংবাদ আসে হাইকোর্টে আপীল করতে গেছেন হরেরামবাবু, একা যেতে চাননি, গিন্নীও সঙ্গে গেছেন কর্তাকে সাহস বুদ্ধি যোগাতে। শচীনও লেগেছে আবার চাঁদা আদায় করতে। চাঘরকে কেন্দ্র করে সহরের নব আন্দোলন ধ্বনিত হয়ে ওঠে; জন্ম নিচ্ছে কোন বিদ্রোহী শক্তি—ধীরে ধীরে। জমিদার শাসিত অঞ্চল, নীলরক্তের ঘোর ফিকে হয়ে আসছে; ওরা উঠে পড়ে লেগেছে আগামীকালের নব জাগরিত কোন অসুর শক্তির মত। শচীন তাদের নেতা হয়ে পড়েছে।

ফটিকের সারা মন শূন্য হয়ে গেছে। উচ্ছৃংখল জীবনে তার স্তিমিত ভাঁটার টান এসেছিল; পথ চলতে চলতে হঠাৎ সুন্দর কোন দৃশ্য দেখে—চলতি মানুষ ক্ষণিকের জন্য থেমে যায়; দুচোখ ভরে দেখতে থাকে সেই সুন্দর দৃশ্যকে, সবুজের স্নিগ্ধতায় অবগাহন স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নেয়।

তেমনি ফটিকও থমকে দাঁড়িয়েছিল—যমুনা তার রাশ ছেঁড়া বাঁধনছারা মনকে বাঁধন পরিয়েছিল। যমুনার মৃত্যুটা তার কাছে অত্যন্ত আকস্মিক।

ভিড়ের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে দেখেছিল—একটা রক্তমাংসের দেহকে ওরা নিয়ে চলে গেল।...গতরাত্রেও তার কাছে বসেছিল সে; যমুনার স্নিগ্ধমধুর হাসি এখনও ভুলতে পারে না—ধ্রুবতারার মত নীলাভ ম্লান জ্যোতিতে তার অন্ধকার মনের অতল রাঙিয়ে দিয়েছে; সে ধরা দিয়েছিল তার কাছে। ফটিক জয় করেছিল

তাকে নিজের অপরিসীম ধৈর্য্য দিয়ে ; কিন্তু হঠাৎ কোন দিকে সব ছারখার হয়ে গেল ; যমুনার কথাটা বার বার মনে পড়ে অকারণে।

—বটগাছের মত হয়ো ছোটবাবু ; বহু পাখীকে আশ্রয় দেবে—শান্তি দেবে। মনের বশ হয়ো না, ··মনকে বশ করো।

···কিন্তু পারে কই !

আজ সহরের বন্ধুবান্ধব তাদের মামলার প্রতিপক্ষ ; সেখানেও ওঠাবসা করবার মত মন নেই ; গঙ্গামণির পাড়ার উপর আর কোন মায়া—কোন আকর্ষণও তার নেই। সব কামনা—চিন্তাশক্তি—কর্মক্ষমতার স্রোতে এসেছে ভাটার স্তিমিত টান। একা—অসহায় সে। অপরাহ্ণ বেলায় নিজেই ঘুরে বেড়ায় সে নির্জন নদীতীরে ঘন আমবাগান-আখক্ষেতের ধারে ; সন্ধ্যা নামে রক্তটিপ পরে ; নদীর ক্ষীণ জলরেখার ওপারের বিস্তৃত সবুজ দিগন্তসীমায় নামছে—আকাশ জোড়া অবগুণ্ঠন টেনে কোন রূপবতী ; দুচোখে তার অলস মায়া, কাজ ভোলাবার আহ্বান। ললাটে তারার টিপ ; শাড়ীর নীল আঁচল উড়ছে আকাশে আকাশে, তারার চুমকি বসানো আঁচল।

···হঠাৎ কি ভাবতে ভাবতে থেমে গেল ফটিক ; তার মনের অবদমিত কর্ম-ক্ষমতা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে ; নীরব নিষ্ক্রিয় জীবন বইতে সে পারবে না। হাঁপিয়ে উঠেছে, তার থেকে মুক্তি পেতে চায় সে।

···কাজকর্ম সুরু করেছে ফটিক ; হরেরামবাবু প্রথমে সায় দেন নি ; ফটিকের এক জ্ঞাতি মামা মোকামা থেকে এসে পড়েছেন, তিনি সেখানে ফলাও কারবার করেছেন তেলকলের ; সুগারমিল করতে সুরু করেছেন। কাজল গাঁয়ের আশপাশ ঘুরে দেখেছেন ফটিকের সঙ্গে ; নদীর ধারেও গেছেন।

ফটিকের কথায় লাফ দিয়ে ওঠেন ভূঁইহার কলওয়ালা—আলবৎ। জরুর চলবে এখানে কলকারখানা। সহর বাড়তে চলেছে ; নৌকায় ভি মালপত্র আনা হোবে, নিজে দুটা ট্রাক রাখবে ; ব্যস দেখ—বৎসর দোবৎসরকা অন্দর লাল হো যায়ে গা ; জমিদারীতে ক্যা কুছ আউর আছে ? ঘরসে খাজনা দিতে হোবে। নাম কা বাস্তে জমিদার।

হরেরামবাবু সম্বন্ধীর কথাগুলো শুনে চলেছেন। নিষ্ঠুর হলেও কঠিন সত্যকথা। জমিদারীর দিন যেন শেষ হয়ে আসছে। খাজনা আদায় উশুল

নেই—কেবল বাকী ; কালেক্টরীর কড়ি ঠিকই যোগাতে হয় ; নেহাত তেজারতি কারবার, বেশ কিছু নগদ টাকা আছে নইলে আশেপাশের জমিদারদের অবস্থা তিনি ভালেই জানেন। বাঘডাঙ্গা—জেমোর সব জমিদাররাই ধ্বসে পড়েছে। খরচ—চালচলন বেড়েছে তিনগুণ ; অথচ আয় বাড়াতো দূরের কথা—কমছেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে অনেকেই এসে হ্যাণ্ডনোট কেটে টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু এ ভাবে চললে আর কতদিন। মামাবাবু বলে চলেছেন।

—জমিদারীর জমানা আজ না হোক কাল খতম হোবে হরেরাম ; সময় থাকতে—তাগদ থাকতে দুসরা পথ নিতে হোবে : ব্যবসা ছাড়া পথ আর নেই।

ফটিক মামাবাবুর দিকে চেয়ে থাকে, মামার কথাগুলো মনে হয় বর্ণে বর্ণে সত্যি। চলমান জীবনযাত্রার সঙ্গে পা ফেলে চলতে গেলে—তার গতির সঙ্গে তাল রাখা চাই ; সেকেলে জমিদারীর জীর্ণ কাঠামো—কোনদিন পরিবর্তনের ঝড়ে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে একেবারে।

হরেরামবাবু বলে ওঠে সম্বন্ধীকে—ফটিক ওসব কিছু বোঝে না, তুমিই লোকজন দিয়ে ব্যবস্থা করো।

হাসেন মামাবাবু—কেঁউ নেহি সমঝে গা ? বহুৎ তুখোড় এলেমদার হ্যায় ফটিক।

অকারণে ভাগ্নের গর্বে মামা বিহারী খিউ ডালে পুষ্ট গোঁফজোড়াটাকে চুমরিয়ে নেয়। সাহস দেয় ভাগ্নেকে,

—সব ঠিক হো যায়ে গা, তামাম সহরমে ফটিকবাবুকো পাক্কা কলমালিক বানায়া যায়ে গা।

রণজিত চায়ের দোকানে, বাঘভাঙ্গা—জেমো—রূপপুরের ধ্বসেপড়া জমিদার নন্দনদের বৈঠক বসে ; সকালে এখানে জমে, সন্ধ্যায় ওদের আড্ডা ওই গঙ্গামণির পাড়ার কাঁচা মদের দোকানের পিছন দিকে একটা কোণে।

কমলবাবু এখন নামেই পরিণত হয়েছে জমিদার ; জীর্ণ দিশি ধুতি ক'খানাকে সাবধানে পরে, পাঞ্জাবী এসে ঠেকেছে ক'টিতে মাত্র, তাতেই গিলে করে বেরুনো চাই।

করুণাবাবুর চোখ দুটো ঢুকে গেছে কোটরে ; কোলে বসেছে পুরু কালি ; চেহারায় এসেছে নিদারুণ অত্যাচারের ছাপ ; বাগানের নারকেল, কাঠ আর

দালানের পুরোনো কড়ি বরগা বিক্রী করে দিন চলে ; জমিদারী নিঃশেষ হয়ে গিয়ে বিঘে কয়েক জমিতে এসে ঠেকেছে। বলে ওঠে চায়ে চুমুক দিতে দিতে,

—কি আর দেখবো, ওসব কাজ ওদেরই পোষায়। ধানের ধুলোয় গা ভর্ত্তি করে বসে থাকবে।

করুণাবাবুর কথায় কমল বলে ওঠে—যা বলেছো! কি আর হবে ওদের! পয়সার জন্য সাতহাত মাটি খুঁড়তেও ওরা রাজী। জীবনে জমিদারী তো করেনি, চালচলন—জানে না।

রণজিত ওদের নাড়ীনক্ষত্রের সংবাদ জানে, বলে ওঠে চা দিতে দিতে,

—যা বলেছেন মেজবাবু, ওঁদের আর বাজে খরচ কি! এক কাপ চা পর্যন্ত খায় না, আর আপনাদের সাতপুরুষের জমিদারী। নবাবী আমল থেকে পরোয়ানা খাটোয়ালী!

কমলবাবু খুব খুসী—হুঁ হুঁ বাবা, কাকপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলেও সেই বলবে। ও ব্যাটা কালকের আরসুলা—আজ হলি কিনা পাখী। তোর ফুর্তি বাবদ খরচা কতো শুনি? আমার ঠাকুর্দার আমলে একটা পরগনাই ছিল মদের খরচবাবদ।

ন' আনির তরফের মোহনবাবু, ইদানিং বিষয় সব শেষ করে—হাঁপানি রোগটি কিনেছেন; কোণে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করছিলেন।

ওদের কথায় বলে ওঠেন—যা বলেছো কমল; একা সুন্দরী বাইজীর পিছনেই বাবাঠাকুর কাজল গাঁ মৌজা 'ফুঁ' করে উড়িয়ে দিল। এই আমিই—

কথাটা আর শেষ করতে পারেন না; ফুঁ দিয়ে সব উড়িয়ে দিয়ে এখন অনবরতই ফুঁ ফুঁ করে হাঁফানির টান টানছেন।

শচীন একদিকে বসে কি হিসাবপত্র দেখছিল। মামলার হিসাব; হাইকোর্টে চলেছে বারোদেউলের মামলা; বেশ কয়েকহাজার টাকা গলে গেছে; তার থেকে দুধ বাদ দিয়ে জলের হিসাব করছে শচীন।

কমলবাবু বলেন—ঠিক করেছিস শচীন ব্রাদার, দে ওই ভুঁইহার পাপটাকে টিট্ করে, মুখ কসে রগড়ে দে মাটিতে। সাবাস ছেলে।

শচীন কথা কয় না, ওদের চেনে। রূপপুরের বর্তমান সমাজের ক্রিমিকীট ওরা; অন্তহীন নরকে পচে থিক থিক করছে। বিষয়-সম্পত্তি সবই গেছে, বাকী

আছে নোংরা অভ্যেস আর কুটিল মনগুলো। মরতে ও মরে না। ওরা যেন সব মিউজিয়ামে রাখা ন্যাকড়া জড়ানো মমি; আজকের দিনে বেঁচে নেই; অন্ধকার রূপপুরের অতীত জীবনের নগ্ন বিভীষিকার মূর্তিমান রূপ। গলিত পচা সমাজের শেষ বংশধর।

পকেট থেকে তাস বের করে ওরা নিজেদের মধ্যেই ফিস খেলতে সুরু করেছে। পয়সা বাজী ধরবার মত সংগতি ওদের নেই; এখন ওদের বাজী চলে দেশলাই কাঠি না হয় বিড়ী দিয়ে। তবু জুয়াখেলার নেশা ছাড়তে পারেনি তারা, মাঝে মাঝে বীভৎস চাহনিতে চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে; মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে!

—ওটা কে রে? চলে নীল শাড়ি!

অন্যজন জবাব দেয়—বেশ কিন্তু! ওই যে বড় দিদিমণি যাচ্ছে দেখেছিস? ইস্—জিব দিয়ে যেন লালা পড়ছে ওর।

শচীন নীরবে বের হয়ে এল নিজের দোকানে। এই সময় আড্ডাধারীর দল বড় একটা কেউ আসে না; কাজকর্ম হিসেবনিকেশ চুকিয়ে রাখে এই বেলা। কোথায় তার মনে কি যেন চিন্তা ঢুকেছে। কমলবাবুদের বিরূপ মন্তব্যগুলোকে মেনে নিতে পারে না। আজ সে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যেন ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে। নীরব নির্জনে বসে নিজেই বার বার স্বপ্ন দেখেছে শচীন, কাজল গাঁয়ের ইতিহাসে সেই-ই হবে প্রথম পথপ্রদর্শক; কিন্তু তার সেই পরিকল্পনা ফটিক আজ রূপ দিতে চলেছে। নিজের হাতে বিশেষ টাকাকড়ি নেই এতবড় কল্পনাকে রূপ দেবার মত। তবু কোনরকমে নানাদিকে যোগাযোগ করে সে গড়ে তুলতে পারতো একটু সময় সুযোগ পেলেই, কিন্তু তা আর হোল না। চিরকালই নিজের মধ্যে একটা অফুরান প্রাণশক্তির—তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অস্তিত্ব অনুভব করেছে সে। এগিয়ে চলতে যায়; সামান্য অবস্থা—অপরিচয়ের তমসা ভেদ করে শচীন সহরের মধ্যে উঠেছে শীর্ষসমাজে। এইখানেই তার শেষ নয়; এই আশাভঙ্গের জন্যই আজ হতাশ হয়েছে সে; পথ খুঁজছে কি করে তার কর্মশক্তিকে কাজে লাগাতে পারে সে।

মটর অফিসে আলোচনা চলেছে যাত্রীদের, কর্মচারী ড্রাইভারদের মুখে মুখে। দুখানা নোতুন ট্রাক এসেছে; দ্বারকা নদীর উপর সদ্যনির্মিত ব্রিজ আজ কাজল

গাঁয়ের বাধা অনেকখানি দূর করেছে। এখানে চেপে বসো, আর নদীর ধারে গিয়ে নাকানি-চুবোনি খেতে হয় না ; 'সিট' নিয়ে আবার মারামারি করার দরকার নেই, রেণুপদ বলে—এত সুবিধা দিচ্ছে কোম্পানী, দুটো পয়সা টিকিট পিছু বেশী দেবা না কি গো ?···চোখবুজে হাওয়া খেতে খেতে চলে যাবে।

অবশ্য কথাটা একটু অতিরঞ্জিত ; গাড়ী আর রাস্তা তেমনিই প্রায় আছে ; একটু আলস্য এলেই বিপদ, ধাঁ করে ধাক্কা লাগবে রডের সংগে, না হয় পাশের লোকের মাথাতেই। আর নাক বুজে যায় এখনও ধুলোতে। তবে নির্ভর এইটুকু যে, বন্যার সময় আর হাত পা গুটিয়ে আটকে বসে থাকতে হবে না, যেতে পারবে।

রেণুপদ যাত্রীদিকে আশ্বাস দেয়—এইবার পদিআঁটা বড় গাড়ী আসবে কত্তা, রাস্তা পাকা হ'তে দেরী। ওদিকে চলে যাবে সাঁইথে পর্যন্ত আয়নার মত ঝকঝকে রাস্তা হবে।

একজন প্যাসেঞ্জার বলে ওঠে—সে তো অনেক কাল থেকেই শুনে আসছি রেণুদা !

রেণুদা টিকিট কাটবার ফাঁকেই ফোড়ন দেয়—দ্বারকার সাঁকোর কথাও তো শুনেছিল—হলো না এবার ?

চীৎকার করে ওঠে—ঘনা ষ্টার্ট কর ? ন'টার ট্রিপ ছেড়ে দে।

নীরব রাস্তায় ইঞ্জিনের শব্দ তুলে ধুলোর রাশ উড়িয়ে বেগে চলে গেল দুখানা ঝকঝকে নোতুন ট্রাক কি সব লোহা-লক্কড় বোঝাই করে ; ওদের সতেজ ইলেক্‌ট্রিক হর্ণের আওয়াজে পুরোনো বাসের শব্দ ঢেকে যায় ; সকলেই চেয়ে থাকে ওই দিকে। সারা সহরের বুকে এনেছে তীব্র শাসনের ভ্রূকুটি নিয়ে ফটিকবাবুর ওই নোতুন ট্রাকগুলো আর উদ্ধত মাথা উঁচু করে সহরকে যেন শাসন করতে উঠছে দুটো চিমনি, পাশাপাশি কালো দুটো নল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হয় নীল আকাশে—বনছায়াময় নদীতীরের নীরব নির্জনতা ওর ক্রুদ্ধ গর্জনে তছনছ হয়ে গেছে।···ভোর বেলায় বাজে বিচিত্র সুরে কলের বাঁশি। পাখীডাকা বাগানে—নদীর স্তিমিত জল-ধারার বুকে—ওপারের বেণুবন সীমায় বাঁশীর তীব্র গর্জনধ্বনি শোনা যায়—কাজল গাঁয়ের আকাশ বাতাসে সে দৃপ্তকণ্ঠে আগামী যুগের আগমনী শোনাচ্ছে।

কাজল গাঁয়ের জীবনযাত্রা বাঁধা ছিল জমিদার বাড়ীর দেউড়ির ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে, নীরব শ্যাম ছায়াঘন অলস বেলায় কাঁপতো দূরের ঘণ্টার শব্দ; ঢং ঢং ঢং, মানুষ হিসাব করতো সময়ের; এখন তার ঠাঁই নিতে চলেছে কলের বাঁশী, খেয়া-ঘাটের পারানীমাঝি হাটুরেদিকে তাগাদা দেয়,

—ছ'টার ভোঁ হয়ে গেল, পার হয়ে নে বাবা; আপিস কাছারীর লোকজন আসবে এইবার।

…মুদি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে খেতে বের হয় দুপুরে একটার বাঁশী বাজলে।

ফটিকের স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে। নদীর ধারে ওদের বড় বাগানটা ছায়ায় আলোয় ঘিরে রাখতো নিজেকে; সেই বাগানের পাশের জমিতে উঠেছে বিশাল কল; তকতকে সিমেণ্টের অংগনে রাশি রাশি ধান সেদ্ধ শুকোচ্ছে; মাঝে মাঝে কুলিরা ঠেলাগাড়ী বোঝাই ধান এনে ঢেলে দেয় আঙ্গিনায়; ভাপ্ উঠছে, কামিনের দল ঠেলাবরুষ দিয়ে মেলে দিচ্ছে রোদে ধানগুলোকে; রাঢ়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ওই একমাত্র প্রথম ধানকল; সমস্ত ধানই ওরা চাল করে চালান দিতে সুরু করেছে, ওই দিকটায়—নোতুন তেলকল পত্তন করবার আয়োজন চলছে। নদীর ধারে বাঁশবন কেটে ইট দিয়ে রাস্তা পাকা ঘাট তৈরী করা হয়েছে, বর্ষাকালে নৌকা-যোগে চালান আসে বিলের দিক হতে হাজার হাজার মণ ধান।

…ফটিক ঠিক তন্ত্রীতে ঘা দিতে পেরেছে; সে আঘাত করেছে—রাঢ় অঞ্চলের ধমনীতে; দেহের শেষরক্ত বিন্দুটি অবধি বের হয়ে আসবে নিঃশেষে। প্রধান পণ্য এ অঞ্চলের ধান, সেই কারবার ফলাও করে সুরু করেছে। ছোটখাট মহাজনরা যেন পাত্তা পাচ্ছে না; সমস্ত ধানই কিনে চাল করে ডবল লাভে চালান দিচ্ছে ফটিক।

…রমণবাবু ফিরে এসেছেন সত্যি, কিন্তু বেশ অনুভব করেছেন যে কাজল গাঁ সেদিন দেখেছিলেন আজ তার পরিবর্তন ঘটছে, সে পরিবর্তনের গতি এত দ্রুত যে তাল রাখা সম্ভব নয়; ফণী চক্রবর্তী এখন উঠে পড়ে লেগেছে;…

বড় ছেলের ননীর কারবারে যেন একটু মন্দা এসেছে; তাই সেই ক্ষতিটা পুষিয়ে নেবার জন্য বুড়ো মরিয়া হয়ে উঠেছে। গাড়ীর সংখ্যাও বেড়ে গেছে তার অনেক।

মনে পড়ে রমণবাবুর অতীতের কথা, প্রথম যেদিন তিনি বাস সার্ভিস খুললেন এখানে সেদিন কোথায় ছিল ওই ফণী চক্রবর্তী। ধানের আড়তদারি করতো ; হঠাৎ সেও সুরু করলো ; কিন্তু কোণঠাসা করে দিয়েছিলেন রমণবাবু তাকে। আর কিছুদিন চালাতে পারলেই ফণীবাবুকে সে কারবার গুটোতে হোত ; কিন্তু সাপের মত ক্রূর ওই চক্রবর্তী সেদিন মাথা নীচু করে এসেছিল তাঁর কাছে আপোষ মীমাংসা করতে। অর্থাৎ পরাজিত হয়ে এসেছিল কৃপা ভিক্ষা করতে ; সেদিন তাকে ফেরাতে পারেন নি ; গ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু সেই ফণী চক্রবর্তী আজ মনে মনে তাঁকে বিপদে ফেলবার জন্য এই চক্রান্ত করছেন তা ভাবেন নি। যেদিন আবিষ্কার করলেন সেদিন আর কোন উপায় নেই। ক্ষতি চরম সীমায় উঠেছে।

…মঞ্জুর ডাকে ফিরে চাইলেন রমণবাবু, মঞ্জুর বাবাকে দেখে আজ কষ্ট হয়, সংসারের বাইরে নিবিড় শান্তির মাঝে মগ্ন ছিলেন, সেই প্রশান্তিময় জীবনযাত্রা পথ থেকে ছিটকে বের করে এনে শত চিন্তা উৎকণ্ঠার মাঝে দাঁড় করিয়েছে বাবাকে সেইই। এই অশান্তির জন্য নিজে সেও দায়ী।

—কি হয়েছে বাবা ? মঞ্জুর কণ্ঠে বিষাদের সুর।

হাসবার চেষ্টা করেন রমণবাবু—কিছু নয়।

—লুকোবার চেষ্টা করছো আমার কাছে ?

—নারে না। চল রাত অনেক হয়েছে।

কানে আসে সরমা খুকির মাকে রান্নাঘরে বকছে।

—বললাম তোকে, আমি ভয়সা ঘি খেতে পারি না, গাওয়া ঘিয়ে লুচি করে দে আমাকে, তা হ'ল না ! দুধে এতো জল দিলে খেতে পারি ?

…সরমা চিরকালই একরকমই রয়ে গেল। ওর মনের কোন একটা অংশ চিরকালই এক রয়ে গেছে ; শৈশব হতেই তার কোন পরিবর্তন হয় নি। মানসিক বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। মঞ্জু মায়ের জন্য মাঝে মাঝে অসহ্য লজ্জায় পড়ে।

—খাবে না বাবা !

—শরীরটা আজ ভাল নেই মা ; একটু দুধ সন্দেশ খেয়েই থাকবো আজ।

মঞ্জু বিস্মিত দৃষ্টিতে বাবার দিকে চেয়ে থাকে ; বাবার দেহে মনে আজ যেন নিদারুণ ক্লান্তি—অসহায়তা ফুটে উঠেছে। কোথায় একটা ঝড়ের আভাষ দেখেছেন তিনি, ঈশান কোণে রুদ্রমূর্তি ধরে আসছে ধ্বংসের করাল দেবতা।

তিনি যেন এই ধ্বংসলীলার সামনে একটি অসহায় ক্রীড়নক। মঞ্জু আগামী বিপদের আভাষ পায় বাবার চোখমুখে। বেশ অনুভব করে কোথায় একটা গোলমাল ঘটেছে।

তবু এই অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে থাকতে পারে না রমণবাবু, তিনি একবার বোঝাপাড়া করতে চান।

হঠাৎ অপিসে এসে খাতাপত্র তলব করেছেন, নিজে রেণুপদকে নিয়ে বসে কয়েকটা বিল দেখাশোনা করেই আবিষ্কার করে বসেন, ব্যাপারটা কতদূর এগিয়েছে। চমকে ওঠেন তিনি। ফণীবাবুকেই জেরা করেন।

—কি করেছেন এসব ?

ফণীবাবু পাকা মামলাবাজের মত মিথ্যা কথাটা জোর দিয়ে বলে—ঠিকই আছে। কোথাও গলদ নেই।

—ঠিক আছে ? এই ভাউচার—বিল এগুলো অন্য গাড়ীর বাবদ খরচা।

ফণীবাবু বলে ওঠে -ওসব হবার যো নেই, হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না। ঠিকই আছে।

রমণবাবু বলে ওঠেন—জানেন, ইচ্ছা করলে মামলা করতে পারি ?

মনে মনে হাসে ফণী চক্রবর্তী, এতক্ষণ ঠিকই কথা বলছিল, মামলার নাম শুনে বুকে বল পায় ; মামলার হালহদ্দ সব বোঝে ফণীবাবু, ছেলেবেলা হতেই ও জিনিষটা করে আসছে। নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয়,

—চেষ্টা করে তাই দেখুন। আর কথাবার্তার কি থাকতে পারে, সেইখানেই মীমাংসা হোক।

বের হয়ে গেলো ফণীবাবু ; মনে মনে শিউরে উঠেছে। অনেক কিছু জাল-জোচ্চুরি আছে, সইসাবুদও নকল করে রেখেছে অনেক খরচের খাতায় ; সুতরাং মামলার মুখে সব ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাহলেই সর্বনাশ, পিছনে রয়েছে ওই রেণুপদ। লোকটাকে দুচোখে দেখতে পারে না ফণীবাবু ; কে এই

সংবাদ প্রকাশ করলো—ভাবতে থাকে। রেণুপদও এ সব সংবাদ কিছু জানে। হঠাৎ মনে পড়ে—মণি মাঝে মাঝে যায় ওখানে। দু'একবার কথাটা কানেও এসেছে ; রমণবাবুর মেয়ের সঙ্গে ওর মেলামেশা আছে। গেছোমেয়ে—কলেজে পড়েছে। ছেলের মাথা বোধ হয় বিগড়ে দিয়েছে একেবারে। রেগে ওঠে আগুনের মত তেজে। বাড়ী ঢুকেই দেখা মণির সঙ্গে।

মণি নিজেই গাড়ীর কাজকর্ম শিখেছে। একটা গদি পেতে গাড়ীর নীচে চিৎ হয়ে শুয়ে গিয়ার বাক্সে কি ঠোকাঠুকি করছে। বাবার ডাকে বের হয়ে এল ; গরমে—পরিশ্রমে ঘেমে নেয়ে উঠেছে ; হাতে মুখে গেঞ্জিতে কালির দাগ।

—রমণবাবুর ওখানে যাও তুমি !

বাবার প্রশ্নে একটু চমকে ওঠে ; পরক্ষণেই সন্দেহ করে বোধ হয় হিসেবপত্র দেখতে এসেছেন তিনি। বাবার স্বার্থে আঘাত লেগেছে, তাই আজ মারমুখী হয়ে উঠেছে ; ফণী চক্রবর্তী কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—জবাব দাও।

মণির মনে মনে দৃঢ়তা ; নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই তৈরী করছে সে। এখন হতেই সারাদিন পরিশ্রম করে, দুখানা ট্রাক কিনেছে মায়ের টাকায়, বাবা তাকে কিছুই দেয় নি বরং বাধাই দিয়েছিল। আগেকার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—বাবা তার ব্যবহারে রেগে উঠে বাড়ী থেকে দূর করে দিতেও চেয়েছিল। কোন কর্ত্তব্য নেই ; স্নেহ প্রীতির স্পর্শ নেই, দাবী শুধু পিতৃত্বের। ফণীবাবুর অন্তরের যে ঘৃণ্য পরিচয় পেয়েছে তাতে—তাকে স্বীকার করতেও বাধে তার।

—চুপ করে রইলি কেন ? বল—

—হ্যাঁ, কয়েকদিন আগে গিয়েছিলাম। স্থির কণ্ঠে জবাব দেয় মণি।

বারুদের স্তূপে আগুন জ্বলে ওঠে, ফণীবাবু বোমা ফাটার মত ফেটে পড়ে,—তা আর যাবে না, খুব যে গলায় গলায় ভাব। বাবাও তোমাদের শত্রু।

চটে ওঠে মণি, সংযত কণ্ঠে বলে—আপনার ওসব করার দরকার কি ? এই অন্যায়—

—মানে ?

—এই নীচ কাজগুলো কি না করলেই নয়? লোককে তেজারতি করে পথে বসিয়েছেন; আবার ব্যবসা করতে নেমে পার্টনারকে পথে বসানো?

ফণীবাবুর মাথায় যেন আগুন জ্বলছে, কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলো। চেয়ে থাকে মণির দিকে; ওকে যেন এড়িয়ে চলতে চায়, দুর্মুখ ওই সন্তান তার আপন কেউ নয়; কোন নিষ্ঠুর বিচারকের ভূমিকা নিয়েছে—তার সব পাপের বিচার করে কঠিন শাস্তি বিধান করতে। চুপ করে সরে গেল ফণীবাবু, এর জবাব পরেই দেওয়া হবে।

সরমাকে দোষ দেওয়া যায় না, তার সংসার তার জগৎ সাদামাটা, সেখানে ঘোরপ্যাঁচ নেই। নিজের সামান্য সুখসুবিধার কথা ছাড়া অন্য কথা ভাবে না; কিছুদিন হতেই দেখে আসছে মঞ্জুর সঙ্গে মণির মেলামেশা; বৃন্দাবন সাঁপুই সেই যে গেছে আর ফেরেনি, কোন নোতুন পাত্রের সন্ধানও পায় নি আর। অথচ মনে মনে শিউরে ওঠে; স্বামী ওদিকে নজর দেবে না, মেয়েও বিয়েতে বসবে না যার তার সঙ্গে। নিজেরই কল্পনায় সে শিউরে ওঠে। অগত্যা নিজেই মনে মনে কর্মপন্থা স্থির করে নেয়।

প্রথম প্রথম আসা যাওয়া দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। একত্রে কারবার সুরু করার পর থেকে দুই পরিবারের মধ্যে সামাজিকতাও গড়ে উঠেছিল একটা, কিন্তু মণির মা মারা যাবার পর থেকে সেটা কমে গেছে, বৌরা একালের মেয়ে—তারা ওসব সম্পর্কের বড় ধার ধারে না। সরমাকে আসতে দেখে মণির পিসীমা এগিয়ে যান, আদর করে বসালেন—এসো দিদি, এসো। ওগো বৌমা মঞ্জুর মা এসেছে—আসন দাও ওঁকে।

—সব ভালোতো ঠাকুরঝি?

সরমার কথায় মণির পিসীমা বলে ওঠে—আর ভালো; সব ছত্রাকার হয়ে আছে দিদি; ঘরের লক্ষ্মী চলে গেছে সে, আমরা তো জঞ্জাল।

বৌমা নেমে আসে—কয়েক মিনিটের মধ্যে; এইটুকু সময়েই সে সামান্য প্রসাধন সেরে গায়ে কয়েক থান গহনাও চাপিয়েছে; নেমে এসে প্রণাম করবার ভান করে দূরে দাঁড়াল। সরমা বলে ওঠে,

—এসো মা,

—গয়না কি নোতুন হোল ?

এইবার কথাবার্তা ঠিক লাইনে এসেছে। বড়বৌ কৃষ্ণচূড়া পুষ্পহার, চুড়িতে কত ভরি বর্তমানে আছে, টায়রা গড়তে দেওয়া হয়েছে, কত ভরির কি দর বাণী—তাও বলে বসে।

ফণীবাবুর অবস্থা এখন চলতি, ঘরে বাইরে তার লক্ষ্মীর আবির্ভাব। বিরাট বাড়ীর বাইরের অংশে গোটা পনের ধানের গোলা ; সবই নিজের জমির ; সুন্দর তেতালা বাড়ী ; রেডিও কেনা হয়েছে বৌএর সখে ; উপছে পড়ছে সংসার। সরমা মনে মনে কল্পনা করে মঞ্জু এসেছে এ বাড়ীতে বৌ হয়ে ; সেও মালিক হবে এই প্রাচুর্যের।

পিসীমা একটি মাটির ছোট হাঁড়িতে ভাত চাপিয়েছে—কাঁচকলা, আলু-পটল সেদ্ধ।···ফণীবাবুর অজীর্ণের ধাত, বেশী খাওয়া বারণ। তাছাড়া প্রাণধরে ভাল-মন্দ খেতেও পারে না ; ওই সেদ্ধোপোড়া আর একটু ঘি বড়জোর। এই তার আহার।

নোতুন আর এক ব্যবসা সুরু করেছে ফণী চক্রবর্তী। এ পথে পয়সা আসে রাতের অন্ধকারে। গঙ্গামণির দিন ফুরিয়ে এসেছে। মাধববাবুর ব্যবসা চলতো গঙ্গামণিকে কেন্দ্র করে ; সেই গঙ্গামণি আজ তলিয়ে যাচ্ছে। কাজল গাঁয়ের বিষাক্ত নীলরক্তের অভিশাপ এতদিন চাপা পড়েছিল তার নীচে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গঙ্গার পুরানো রোগটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। গাময় উঠছে চাকাচাকা কুৎসিত দাগ ; কেউ বলে কুষ্ঠ—কেউ বলে অন্য কিছু। উচ্চতম সমাজের পোষা রোগ তার দেহে অনুপ্রবেশ করেছে অনেক আগেই।

মটুরাণী সময় থাকতেই সাবধান হয়েছে। ফণীবাবুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। বিপত্নীক ফণী চক্রবর্তী বলে—আলাদা বাড়ী করে দিচ্ছি তোকে, উঠে আয়। রাজরাণী হয়ে থাকবি।

বুড়ো মিটকে বামুনের মুখে নুড়ো জেলে দিতে ইচ্ছে করে ; যৌবন আছে মটুরাণীর। এই তো বয়েস—পাঁচফুলে মধু খাবার—গুনগুনিয়ে গান গাইবার। দুপয়সা হাতে তোলবার। এসময় বাঁধন মানে না মন। চোখের তারার চমক তুলে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ে সে ফণীবাবুর গায়েই—রাখনী রাখবে না কি গো ? ছেলেপুলে নাতি-নাতকুড় আছে—তারা বলবে কি ?

—ওসব পরোয়া করি না। আলাদা বাড়ীই দোব তোকে।

—উহুঁ! তার চেয়ে বাপু, এসো কাজ-কারবার করি। আধা-আধি বখরা।

ব্যবসা বোঝে ফণী চক্রবর্তী ; টাকা পয়সার গন্ধ পেলেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। ব্যবসা ভালো বোঝে ; ওর কথাগুলো ভাবতে থাকে। কথাটা মন্দ বলেনি। তাছাড়া মটু খেলোয়াড় মেয়ে ; এ পথে আছে অনেকদিন—পারবে ঠিক ওসব চালাতে। গঙ্গামণির চেয়ে অনেক গুণে বুদ্ধিমতী।

এগিয়ে আসে মটু ; নদীর ধারে নোতুন বাড়ীর একটা মহল চক্রবর্তীমশায়ের আলাদা। ওর আসা যাওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী। মটু ওই বৃদ্ধকে যেন পেয়ে বসেছে। নিস্তব্ধ দুপুর। নির্জনতার বুকে কোথায় মাঝে মাঝে ডাকছে ঘুঘু—ওর দিকে চেয়ে আছে ফণীবাবু। হ্যাঁ রূপ এখনো আছে মটুর, যেন সড়কখালির দহ, চলতে চলতে রূপের স্রোত ওইখানে ঠেকে গেছে ; বারোমাস নদীর ওখানে থাকে শান্তগহিন অতল শান্তির ইসারা।···কাছে টেনে নেয় তাকে।

এ যেন অন্য কোন মানুষ—লোলরসনা লক লক করছে লালসায়। হ্যাঁ ব্যবসাই করবে ; ফাউ হিসাবে থাকবে মটু।

হাসে মটু ওকে কাছে টেনে নিয়ে—এখনও যোয়ানই আছে লাগছে, এত লোভ তুমার।

চক্রবর্তী কথা কয় না, দুপুরের শান্ত নির্জন বাড়ীটা কি এক স্বপ্ন দেখছে। উঠে দাঁড়ালো মটু।

—দাঁড়াও তামুক সেজে দিই তোমাকে।

ফণীবাবু এই জীবনের স্বপ্ন দেখে ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে, শয়তানী বুদ্ধি একদিকে যেমন কর্মঠ—অন্যদিকে মন তেমনি লোলুপ। সারাদেহে যেন একটা রোমাঞ্চ জাগছে।

হঠাৎ বাইরে কার পায়ের শব্দ শুনেই একটু বিরক্ত হোল, মটুও নিমেষের মধ্যে সরে গেল ওপাশের ঘরে ; ফণীবাবু যেন মনে মনে ক্ষেপে উঠেছে এসময় কে এল জ্বালাতে!

···চক্রবর্তীমশায় ঘরের বাইরে ডাক শুনে একটু অবাক হয়। হঠাৎ সরমাকে এ বাড়ীতে দেখবে কল্পনা করেনি। সে আসা যাওয়ার সম্বন্ধ ফণীবাবুই তুলে

দিয়েছে। আগে আগে রমণবাবুকে তার প্রয়োজন ছিল, রমণবাবুর সাহায্য চাই, তাইই ফণীবাবু নিজেই সম্বন্ধটা গড়ে তুলেছিল, যেদিন সেই প্রয়োজন ফুরিয়েছে তার পরদিন হতেই সে সম্বন্ধ সেইই চুকিয়ে দিয়েছে। আজ ফণী চক্রবর্তী'র কাছে রমণবাবু যেন গজভুক্ত কপিত্থবৎ অন্তঃসারশূন্য। ওকে সমীহ করবার কোন প্রয়োজন নেই!

যেটুকু সৌজন্যতাবোধ ছিল কয়েকদিন আগের সেই কথাবার্তার পর তাও বুদবুদের মত মিলিয়ে গেছে শূন্যে। মনে মনে একটা চাপা আক্রোশই ফুটে উঠেছে। নিজের ছেলের মন পর্যন্ত বিবিয়ে দিয়েছে ওই রমণবাবু—তার মেয়ের সংগে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়ে। তবুও মুখে কিছু প্রকাশ না করেই অভ্যর্থনা জানায় ফণীবাবু,

—আসুন বৌঠান! কি মনে করে?

হয়তো কোন একটা আপোষের সর্ত নিয়েই এসেছে ও।

সরমার কথাগুলো যেন দূর থেকে ভেসে আসে তার কানে,...সরমা বলে চলেছে—দুজনে মানাবে ভালোই, ছেলেবেলা হতেই পরিচয়; তাছাড়া আমার মেয়েও লেখাপড়া জানে, শিক্ষিত ছেলে আজকালকার—তারাও চায় মেয়েরা ভালো হোক।

...কথাটা যেন বিশ্বাসই করতে পারে না ফণীবাবু; হুঁকোটানা বন্ধ করে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সরমার দিকে।

—কি বললেন? মণির বিয়ে দিতে হবে আপনার ওই গেছো মেয়ের সংগে?

...সরমা ওর চাহনির সামনে আঁতকে ওঠে; আমতা আমতা করে,

—কেন? আমাদের ইচ্ছে...যদি আপনি মত দেন?

—মুখ বিকৃত করে ওঠে ফণী চক্রবর্তী—ও আর সবই ঠিক হয়ে আছে, আমার মতটারই বাকী?...তাহলে ওটুকুর জন্য আর কষ্ট করে এসেছেন কেন—ও আমি দোব না।

—দেবেন না কেন? ছেলের মত আছে—সরমা বলে ওঠে।

ফণীবাবু ভাবতেই পারে না এতদূর এগিয়েছে। বিকৃত কণ্ঠে জবাব দেয়,

—তবে আর কি? ছেলেকে হাত করেছেন—বিয়ে আটকাবে কে? কিন্তু ও

যদি ওখানে বিয়ে করে—কোন সম্বন্ধ আমার সংগে থাকবে না। কোথায় গেল সে হতভাগা! মনে—মনে?

চটিতে পা গলিয়ে উঠে পড়ে ফণীবাবু—হতাভাগাকে সামনে পেলে তখুনিই ঘা কতক বসিয়ে দিয়ে এর একটা মীমাংসা করে ফেলবে—ভাবখানা। অবশ্য হতভাগা তখনও লাইনে কোথায় গাড়ী নিয়ে বের হয়েছে। সরমা ভাবগতিক দেখে 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লম্ফ-ঝম্প করে ফণী চক্রবর্তী বলে ওঠে—আবার দাঁড়িয়ে কেন, যা বলবার বলেছি। এইবার আসুন দয়া করে।

…এই ভাদুরে গরমে ভাপসা হয়ে কোথা থেকে ফিরতে দেখে এগিয়ে যায় মঞ্জু; টকটকে ফর্সা রং দুপুরের রোদে সিঁদুরের মত লাল হয়ে গেছে।

—কোথায় গিয়েছিলে মা? খাওয়া-দাওয়া না করে?

—হাওয়া কর।…বাব্বা! দাওয়ায় বসে হাঁফাতে থাকে সরমা, মঞ্জু তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, মা আপন মনেই গজ গজ করে চলেছে—ভারি পয়সার গুমোর হয়েছে। ঝাঁটা মার মুখে মড়ুই পোড়া বামুনের। চালকলা বাঁধা বামুন, আমার মরণ নেই—আমি গেছি ওই হাড়কিপ্পুনের ঘরে মেয়ের সম্বন্ধ নিয়ে।

…চমকে ওঠে মঞ্জু, মায়ের ও অভ্যেসটা বরাবরই আছে। আপাতত চাপা পড়েছিল কিছুদিন। আজ আবার সেই কাজেই বের হয়েছে নিজে।

—কোথায় গিইছিলে?

—ওই ফণী চকোত্তীর কাছে; হারামজাদা মিন্‌সে—দূর—দূর করে দিলে গা!

এতক্ষণে মায়ের অভিমানের কথা প্রকাশ পায়; নিজেই দুঃসহ লজ্জায় ভেংগে পড়ে মঞ্জু। গণির বাবার কাছে গেছল প্রস্তাব নিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে। সর্বাংগ জ্বলে ওঠে মঞ্জুর; তাকে যেন বিয়ের বাজারে পণ্য পেয়েছে লোকে! সাত সতেরো প্রশ্ন করবে—জবাব দাও, হাঁ করে চেয়ে থাকবে, ওদের বুভুক্ষু দৃষ্টির সামনে বসে থাকো ঠায়।…তারপর আছে দরদাম; পছন্দ অপছন্দ। এ যেন পণ্যেরও অধম। ফোঁস করে ওঠে মঞ্জু,

—কেন গিয়েছিলে গাল বাড়িয়ে চড় খেতে? বেশ ভালো হয়েছে।

সরমা অবাক হয়ে যায়—ওমা। তুওই বললি শেষ কালে? যার জন্য চুরি করি সেইই বলে চোর। ঘাট হয়েছে মা।

…মঞ্জু চীৎকার করে চলেছে—ফের যদি কোনদিন তুমি যাও কোথাও এই সব নিয়ে আমি শুনতে পেলেই গলায় দাড়ি দোব। আমার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না, আমার পথ নিজেই করে নোব—নিতে পারি আমি।

গোলমাল শুনে উপর থেকে রমণবাবু নেমে আসেন। জীর্ণ ক্লান্ত দেহ, এই ক'দিনেই আধখানা হয়ে গেছেন। স্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করেন,

—কি হয়েছে?

সরমা বলে ওঠে—কি আর হবে। গিয়েছিলাম ওর ভালোর জন্যই—তা বরাত মন্দ কি হবে বলো। ফণী চকোত্তীর বাড়ীতে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি অন্যায়? তবে ও যে এত ছোটলোক হয়েছে তা জানতাম না।

…কথাটা শুনে একটু কঠিন হয়ে ওঠেন, ওঁর মুখ কপালে দেখা দেয় বিরক্তির কুঞ্চন রেখা; একটু কঠিন কণ্ঠেই বলেন,

—আমাকে না জানিয়ে যাওয়া তোমার ঠিক হয় নি। আমার মতামত একটা আছে।

চটে ওঠে সরমা—মেয়েকে আদর দিয়ে মাথায় তুলেছো। মণির মত ছেলে সহরে ক'টা আছে?

—থাকা না থাকার প্রশ্ন নয় সরমা; আমারও কথা আছে। ছেলে ভালো কিন্তু ঘরটাও দেখতে হবে।

…সরমা ফণী চক্রবর্তীর নাড়ী ছেঁড়া কথাগুলো ভুলতে পারে না, বাড়ীতে পা দিয়েও এমনি ব্যবহার; রাগে—অসহায় অপমানে দুচোখ ঠেলে জল আসে। গজরাতে থাকে—বেশ—বেশ। কারো ভালো মন্দে আমি আর নেই। মেয়ে সাবালক হয়েছে—যা ইচ্ছে করুক। আমি দেখবো না। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো। এবাড়ীর অনেকেই তো এমন সাজা সান্নিস্যি আছেন। ভেক্ কি! দেখে শুনে গা পিত্তি জ্বলে যায়।

…কথাটা রমণবাবুর উদ্দেশে,…স্তব্ধ হয়ে যান তিনি। অসহ্য বেদনায় মুচড়ে ওঠে সারা অন্তর। তখনও গজ গজ করছে সরমা,

—মন চায়—ঘর বাঁধো কেন নোতুন করে, আর কাউকে নিয়ে। আমি হয়েছি যত আপদ। বলো চলে যাই কোন চুলোয়!

—সরমা! আর্তনাদ করে ওঠেন রমণবাবু। তাঁর জীবনের এই শান্তি অনুসন্ধান—নিরাসক্ত জীবনাদর্শ নিয়ে সরমা এই হীন মন্তব্য করবে ভাবতে পারেন নি। চেয়ে থাকেন ওর দিকে রাগে সারা দেহ মন জ্বলে উঠেছে।

মঞ্জু বাধা দেয়—মা! থামবে তুমি?

সরমা রোদে তেতে পুড়ে এসেই এইসব কথাবার্তায় জ্বলে উঠেছে।

বলে ওঠে—না, আমি এতকাল থেমেই ছিলাম। দেখছি আমার সব যেতে বসেছে। একটা মাত্র মেয়ে সেও গলগ্রহ হয়ে রইল। ওই ওর জন্যই জীবনে কোনদিনই শান্তি পাই নি, জ্বলে পুড়ে মরেছি।

উত্তেজনার আবেগে ঠুই ঠুই করে শানের মেজেতেই মাথা ঠুকতে থাকে সরমা।

রমণবাবুর বিতৃষ্ণা এসে গেছে সারামনে।

অসহ্য হয়ে উঠেছে এই পরিবেশ···ওর কথাগুলো। এর চেয়ে সেই গঙ্গাতীরই ভালো। এক মুহূর্ত আর থাকবেন না এখানে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েই চোখের সামনে অন্ধকার দেখেন।

হঠাৎ কোথায় যেন নিবিড় তমসা নেমেছে :···ঝলসে উঠল বিজলীর আলো—সশব্দে বজ্রাঘাত হলো তাঁর চোখের সামনে। অস্ফুট আর্তনাদ শোনা যায় মঞ্জুর, সরমাও উঠে দাঁড়িয়েছে! সিঁড়ির উপর থেকে রমণবাবুর জ্ঞানহীন দেহটা গড়িয়ে পড়ে ওদের মাঝখানে।

—একি করলে মা! মঞ্জু কান্নায় ভেঙে পড়ে। সরমা পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যা নেমেছে গাছের মাথায় মাথায়। দোতালার জানলা হতে চেয়ে থাকে দূর প্রান্তরের শেষে গ্রামসীমার পানে। বাঁশবন আর নারকেল গাছের সীমা পার হয়ে অন্ধকারের রাজ্যে ডুবে গেছে মঞ্জু।

ঘরে বাতি দিয়ে গেল খুকির মা। ম্লান আভায় ভরে উঠেছে ঘরখানা, স্তব্ধতা ভেদ করে উঠেছে বাবার নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ। পাখীর ডাক থেমে গেছে, মুছে গেছে সব কলরব। দূরে কোথায় সন্ধ্যাশঙ্খ বাজছে—গ্রামসীমায় জ্বলে ওঠে সন্ধ্যাদীপের ভীরু প্রকম্প শিখা ; কোন যাযাবর মন যেন শান্তিনীড়ের সন্ধান করে।

…হঠাৎ বাইরে গাড়ী থামার শব্দে তার মনের অসাড়তা দূর হয়, সিঁড়িতে কাদের পায়ের শব্দ! অনিমেষের সঙ্গে ঢুকছেন প্রবীণ একজন ডাক্তার—সিভিলসার্জন।

…মঞ্জু উঠে দাঁড়াল, দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রেণুপদ, সে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে আছে ওদের। দুজন ডাক্তারে কি আলোচনা হচ্ছে।

—ঠিকই ধরেছো তুমি।

অনিমেষ বলে—তবু একবার 'স্যাঙ্গুইন' হওয়া দরকার ছিল। যেমন চলছে চলুক ট্রিটমেণ্ট। কোরামাইনও দাও।

…ইতিমধ্যে চায়ের আয়োজন করে ফেলেছে মঞ্জু। ডাঃ সান্যাল বলে ওঠেন—এসব আবার কেন? স্রেফ চা দিও মা আমাকে।…হ্যাঁ—আইসব্যাগ দিতে ভুলো না।

রেণুপদ বলে ওঠে—বরফ আনিয়েছি স্যার, দুবেলা বরফ আসবে সহর থেকে। ডাক্তারবাবুর কথামত বৈকালেই আনিয়েছি বরফ।

রাত্রি হয়ে আসে। ডাঃ সান্যাল চলে গেছেন। অনিমেষ তখনও বসে রয়েছে। নোতুন ইনজেকশন দিয়ে হাওয়া করছে রোগীকে। মঞ্জু স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রয়েছে শূন্য দৃষ্টিতে।

অনিমেষ নিজেই সব ভার নিয়েছে। তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

…সেরিব্রাল হ্যামারেজ থেকেই হয়েছে। কোন উত্তেজনা বা মানসিক চাঞ্চল্যের মধ্যে ছিলেন কি?

প্রশ্নটা মঞ্জুর উদ্দেশ্যেই। মঞ্জু কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। বাবার মানসিক অবস্থা কিছুদিন থেকে ভালো ছিল না, কি সব গণ্ডগোল বেধেছে।

…হুঁ!—অনিমেষও শুনছে এক আধটু। শচীনই তাকে শুনিয়ে এসেছে গিয়ে।

…স্তব্ধ হয়ে বসে আছে অনিমেষ রাত্রির প্রহর জেগে। রোগীর অবস্থা খারাপের দিকেই চলেছে। যে কোন মুহূর্তে একটা কিছু ঘটতে পারে। মঞ্জুর অসহায় দৃষ্টির সামনে নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হয়।

—বাবা কেমন আছেন?

মঞ্জুর স্থির কণ্ঠে অনিমেষ মুখ তুলে চাইল। ও যেন সত্য কথাই জানতে চাইছে, যত কঠিনই হোক সে সত্য ও সহজভাবে গ্রহণ করবার জন্য তৈরী হবে। একটু ভেবে বলে ওঠে অনিমেষ,

—আমাদের যা সাধ্য করেছি মঞ্জু, এখন সবই ভগবানের হাত।

মাথা নামালো মঞ্জু; ও বুঝতে পেরেছে অনিমেষের বক্তব্য। নীরবে চেয়ে থাকে মেজের দিকে: টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ে অসহায় অশ্রু! সারামন হাহাকার করে ওঠে; জীবনে এত বড় দুর্দিন আর আসে নি। চারিদিক থেকে অন্ধকার গ্রাস করে আসছে নিবিড়তর হয়ে; আকাশের বুকে কোথাও তারার সংকেত নেই—নেই একটুও আলোর নিশানা। বাতাসে জেগে ওঠে হাহাকার: ছেয়ে আসে একটা কালো স্তব্ধতা—আদি অন্তহীন আকাশের বুক।

কার পদধ্বনি শুনছে তারা দুজনে জাগর রাত্রির বুকে। মৃত্যুর জগতে জেগে আছে দুটি প্রাণী; অনিমেষের সামনে এ দৃশ্য নূতন নয়, মৃত্যুর শান্ত সমাহিত প্রশান্তিময় রূপ বারবার এসেছে তার সামনে: মঞ্জু স্তব্ধ হয়ে বসে আছে শিয়রে।

অনিমেষ বলে ওঠে—এ সময় উতলা হয়ো না মঞ্জু, মাও ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

মঞ্জু কথা বলে না; নীরবে দুচোখ বয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা।

সারা কাজল গাঁ স্বস্তির মাঝে ডুবে গেছে। জেগে আছে তার বিনিদ্র রজনীর প্রহর ঘোষণা করতে একা একটি জাগর মন। মদনবাবু লিখে চলেছেন—হাওয়ায় উড়ছে পত্র দল; জানালার উপর আছড়ে এসে পড়ে রাতের বাতাস—ম্লান শিখায় বসে ভবিষ্যৎ মানুষের কাছে অতীতের রোজনামচা লিখে চলেছেন তিনি।

লক্ষ্মণ সেনের আমল ; বাংলার শেষ হিন্দু রাজবংশ সমাজের বুকে সনাতন স্বাক্ষর রূপে ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে। মুনাফালোভী বণিক সম্প্রদায় একযোগে বিপ্লব সুরু করেছে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষের সমাজ জীবনকে সুস্থতর—সুন্দরতর করে তুলতে চেষ্টা করেছেন সেনরাজবংশধর : অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু রাজকোষ নিঃশেষিত প্রায়। বণিক—শ্রেষ্ঠীসম্প্রদায়ের কাছে প্রভূত সঞ্চিত ধন সংগ্রহের জন্য আবেদন নিবেদন করেও নিষ্ফল হয়ে রাজতন্ত্র চাইল অধিকার করতে সেই সম্পদ। পণ্ডিত কুমারিল ভট্টের পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে উদ্যত হয়ে উঠলো শ্রেষ্ঠীসমাজ।

চশমা খুলে রেখে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন মদনবাবু : অন্ধকার ঢাকা জগৎ—অতীতের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে যেন কি এক পরম সত্য তার মনে রেখায়িত হয়ে ওঠে। ইতিহাস চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পথে, কাজল গাঁয়ের ভাগ্য ইতিহাসও বিবর্তিত হচ্ছে। এক যায়—অন্যের পথ প্রশস্ত করে। মহাকালের গতিপথে কারোও আসা যাওয়া বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটে না। সে অচঞ্চল, জীর্ণপত্র দল ঝরে যায়—আবার আসে কচি কিশলয়—ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে, অসীম অন্তহীন কালের বুকে ঝরে পড়ার ইঙ্গিত। পরম সান্ত্বনা এই যে কেউই চিরকাল থাকবে না, কোন তন্ত্রও কায়েমী বন্দোবস্ত নিয়ে আসে না।

…লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু সেই কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি মত—একটি সত্যের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন অসহায়—হতভাগ্য ভীরু শেষ নরপতি।

…কাজল গাঁয়ের ঘুম ভাঙগার আগেই সংবাদটা বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে—ঠাকুরমশায় দেহ রেখেছেন। কাজল গাঁয়ের অন্ধকার দিনের আকাশ হতে একটি নক্ষত্র খসে পড়লো :…চলমান জীবনের ইঙ্গিত এনেছিলেন তিনি কাজল গাঁয়ের বুকে…এনেছিলেন বৃহত্তর জগতের সংবাদ। বর্তমান সভ্যতার প্রথম বাহক তিনি। আজও মটর কোম্পানীর অপিসে কাজল গাঁয়ের গতিময় জীবনে পেট্রলের গন্ধমাখা বাতাসে তাঁর কথাই মনে পড়ে লোকের। নোতুন মানুষ ভুলে গেছে তাঁকে ; তারা জানে না—আজকের এ্যাসফাল্টের চকচকে রাস্তায় পূর্ণ বেগে টাটাবেনজের পাঁচটনে ডিল্যাক্স গাড়ী চলেছে—হাওয়ার বেগে চলেছে নোতুন

মডেলের লেল্যাণ্ড ডিজেল—ব্যস্তসমস্ত জনতা—যাত্রীর ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে অতীত দিন ; বর্ষামুখর শ্যামছায়াঘন রাস্তা, গাছে গাছে পেকেছে কালো জাম,…টোকা মাথায় দিয়ে ভিজছে রাখাল ছেলে—তারই পাশ দিয়ে দাঁত বের করা খোয়ার রাস্তায় একাৎ ওকাৎ হয়ে চলেছিল কাজল গাঁয়ের প্রথম আসা বাসগুলো যাত্রী নিয়ে ; গেরুয়া জলধারায় দুকূল প্লাবিত দ্বারকার তীরে খেয়া নৌকা হতে যাত্রীদল চেয়ে থাকতো টোইনটি এইট্ মডেলের বাক্সের মত ছোট বাসগুলোর দিকে।…কাজল গাঁয়ের জীবনতন্ত্রীতে এনেছিল তারাই সেদিন প্রাণের চাঞ্চল্য।

সেদিন আজ হারিয়ে গেছে। অতীতের গর্ভে বিস্মরণের পলিচাপা পড়ে গেছে সে যুগের মানুষ দ্রুত বিবর্তিত কাজল গাঁয়ের ইতিহাসে। কিন্তু রেণুপদ ভোলে নি। কিছুমাত্র ভোলে নি সে।

কয়েক দিন পর ফণী চক্রবর্তী'ই বাড়ী বয়ে সুখবরটা শোনাতে আসে ভগ্ন-দূতের মত ; মঞ্জুর সামনে কে যেন মৃত্যুদণ্ড পাঠ করে শোনাচ্ছে।

—তোমার বাবার কাগজপত্র দেখে শুনে নিও, তবে বিশেষ কিছু রেখে যান নি, অত্যন্ত খরচে মানুষ ছিলেন।

মঞ্জু কোন কথার জবাব দিল না, মহাকালের মত নিয়তির অখণ্ড লিপি পাঠ করে চলেছে ফণীবাবু।

—অনেক দেনা রেখে গেছেন।

—তার যে অনেকটাই মিথ্যে তাও জেনেছিলেন তিনি। এ নিয়ে মামলাও করতে গিয়ে আপনার সম্মান রক্ষা করবার জন্যই তা করেন নি।

মেয়েটি খুব সোজা বস্তু নয় তা বেশই বুঝতে পারে ফণীবাবু ওর কথাতে।

—সেই চেষ্টা করে তুমিও দেখতে পারো। ফণীবাবু জবাব দেন।

—বাবা যা করেন নি তা আমি করতে যাবো না।

—বেশ তাহলে বাকী দেনা মিটিয়ে তোমাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে নাও, বন্ধকী টাকারও সুদ আছে একটা।

মানসিক অবস্থা বিশেষ ভাল নেই ; বাবার শ্রাদ্ধ-শান্তি সবে চুকেছে। এমত অবস্থায় এসব বোঝাপাড়া করবার মত মানসিক প্রস্তুতি তার নেই।

বলে ওঠে—দু'চারদিন যাক, তারপর যা বিবেচনা হয় করবেন। আপনিও বাবার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, আপনার উপর আমি কথা কইবো না।

ফণীবাবু চেয়ে থাকে মঞ্জুর দিকে, ওপাশে সরমার থানপরা মূর্তিটা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে স্থাণুর মত। মঞ্জু যেন কোণঠাসা হয়ে আসছে; তাই বোধ হয় এই আত্মসমর্পণ। ফণীবাবুর সন্ধানী দৃষ্টির উপর ফুটে ওঠে অসহায় চাহনি। বলে—আমার কাছে অবিচার পাবে না মা; হিসেব দৃষ্টে কড়াক্রান্তি আমি বুঝিয়ে দোব। তঞ্চকতা আমার কাছে নেই। ওসব আমি করি না।

...মণির কাছে এ ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগে না। অনাথা বিধবা আর তার মেয়েকে এই ভাবে বঞ্চিত করাটা কোনদিনই সমর্থন করতে পারে না। অনেকেই মনে মনে গজরায়, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারে না। সুযোগ বুঝে দু'চারজন দোকানদারও উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের সঙ্গে রমণবাবুর কাজ কারবার ছিল, অনেকেই জাবেদাখাতা বগলে নিয়ে গিয়ে হাজির হয় তার বাড়ীতে, এতদিন যেন ওৎ পেতে বসেছিল, সুযোগ পেয়েই নখদন্ত বের করে একযোগে আক্রমণ করেছে।

বনোয়ারী দাস বলে—সাড়ে তিনশো টাকা বাকী।

জনাইহাটির ভাইপো এসেছে—সেখানেও নাকি শ'দেড়েক বাকী আছে। যদি দয়া করেন তারা—পিতৃঋণ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন।

মঞ্জু কাউকেই ফেরায় না; চারদিকে টলমল করছে তরী দুরন্ত তুফানে, এ সময় এক মুহূর্ত অসতর্ক হলেই সমূহ বিপদ। পাওনাদারদের প্রত্যেককেই আশ্বাস দেয়—দু'চারদিন সময় দিন, আমি সব ব্যবস্থা করবো।

মণিকে হঠাৎ আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল। একটা খাতায় হিসাব করছিল মঞ্জু: এসময় মণি এসেছে হঠাৎ, মঞ্জুর দিকে চেয়ে থাকে মণি।

...ক'দিনের মধ্যেই তার দেহমনে এসেছে পরিবর্তন। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, সারা মুখখানা ঘিরে ফুটে উঠেছে দুঃখের নিবিড় স্তব্ধতা, দুচোখের দৃষ্টিতে কি এক ব্যথাকাতর অনুভূতি! ম্লান হয়ে গেছে সে, তবু মনে হয় দুঃখের দহনে অগ্নিশুদ্ধ একটি শিখা—অন্ধকার তমসায় তার ঔজ্জ্বল্য যেন বেড়েছে বই কমে নি।

—তুমি কি কিছু পেতে বাবার কাছে ?

বিস্মিত হয়ে ওঠে মণি—মানে ?

ম্লান হাসি ফুটে ওঠে মঞ্জুর মুখে—এখন পাওনাদার ছাড়া আর কেউ বড় একটা আসে না।

…চুপ করে চেয়ে থাকে মণি। মানুষ সত্যিই বড় অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত, সময় কার আছে! নিজে সেও সময় করতে পারে না।

মণি সেদিন সরমার যাওয়ার কথা শুনেছিল, শুনেছিল কেমন ভাবে নিগৃহীত হয়ে এসেছে সে বাবার কাছে। এও বেশ অনুভব করে মণি—আজ রমণবাবুর পূর্বাবস্থা থাকলে বাবা নিজেই সেধে আসতেন ছেলেকে পণ্য হিসাবে বিয়ের বাজারে দর করতে এইখানেই।

বর্তমানেও সেই দর কষছে ফণীবাবু অন্যত্র। দু তিন জায়গায় নিলামে উঠেছে মণির বাজার দর পাত্র হিসাবে।

মণি এখনও কোন কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে নি।

—বাবার সঙ্গে হিসাব চুকলো ?

—তারই জন্য আজ তাগাদা দিতে এসেছো ? মঞ্জু কথাটা বলে চেয়ে থাকে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে। মণি যেন অনুভব করে কোথায় একটা ভুল বোঝা-বুঝি হয়েছে, সেই ভ্রান্ত ধারণাই তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে মঞ্জুর কাছ থেকে বহু দূরে। আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—কত হাসি উছল স্বপ্নমাখা সেইদিন।

কবে যেন বর্ষার বেলা ; খিড়কীর গাছে আম পেকেছে। বাবা মায়ের নজর এড়িয়ে বের হয়ে গেছে তারা দুজনে। কালো কালো পাতার প্রান্তে আমগুলো ঝুলছে। ঢিল মেরেও ঠিক নিশানা করতে পারে না ; মঞ্জুই ক্লান্ত হয়ে বলে—গাছে ওঠ না মণিদা, কেমন পেকে রয়েছে ওই ডালে।

মণির অভ্যাস নেই, তবু উঠে যায় ; হঠাৎ কি হয়ে গেল বুঝতে পারে না, সশব্দে ডাল ভেঙে পড়ে গেল নীচে ; বাঁ হাতের সেই কাটা দাগ এখনও মিলোয় নি।…রক্ত বন্ধ হয় না, মঞ্জু কাঁদতে থাকে।

—আমার জন্য হ'য়তো তোমার হাত কাটলো, এমন জানলে কক্‌খনোও বলতাম না।

সেই ঝাঁকড়া চুলচুলো মেয়েটি আজ সামনে বসে নিস্পৃহ ভাবে। বহুদিন বহু পথ চলে গেছে তাদের জীবনযাত্রায়। আজ জীবন তাদের দুজনকে দুদিকে নিয়ে গেছে—কোন ঘূর্ণাবর্তের মাঝে।

...সাঁতার কাটতে গিয়ে সেবার পুকুরে ডুবেই যেতে বসেছিল মঞ্জু! বগলের ঘড়াটা ভেসে গেছে হাত ফসকে অনেক দূরে, অথৈ জলে পড়ে হাবু-ডুবু খায়, বেশ কয়েক ঢোক জল খাচ্ছে!

...অস্ফুট আর্তনাদ শুনে চমকে ওঠে মণি। জামাটা কোন রকমে খুলেই জলে নেমে পড়ে।

—জড়িয়ে ধরিস্ না, তুই তো ডুববিই, সেই সঙ্গে আমাকেও ডোবাবি।

..মঞ্জুকে ঘাটের কাছে এনে হাজির করলো. হাসছে মঞ্জু—একসঙ্গে ডুবলে বেশ হতো—না মণিদা!

মণি সবে চন্দ্রশেখর শেষ করেছে: প্রতাপ শৈবলিনীর উপাখ্যান মনে আছে, ওর একরাশ কোঁকড়া চুলের গোছা ধরে টেনে বলে ওঠে—বড্ড ডেঁপো হয়েছিস্ আজকাল?

অতীতের স্বপ্নদেখা দিন, শৈশব কৈশোরের বুক চিরে বহু শ্যামলিমার স্পর্শ মাখা কত মহানুহূর্ত।...জ্যোৎস্নার প্লাবন ঢালা কত রাত্রি—শিউলির সুবাসস্রোত মদির স্বপ্নময় কত বিনিদ্র প্রহর।

...আমাকে ভুল বুঝোনা মঞ্জু। বাবার এই নীচতাকে আমি সমর্থন করতে পারি নি। তোমরা যদি মামলা করো—আমি তোমার হয়েই সাক্ষী দোব, যতটুকু দেখেছি আমি বলবো।

হেসে ফেলে মঞ্জু—তুমি এখনও ছেলে মানুষ রয়ে গেলে। তাই কি কখন হয়? পরে সহরে তুমি আমি মুখ দেখাবো কি ক'রে!

মণির সারামনে অদম্য সাহস—সে সামর্থ্য আমার আছে।

মঞ্জুর দিকে চেয়ে থাকে মণি আশাভরা চাহনিতে, এ সময় মঞ্জুকে সাহায্য করতে চায়। মঞ্জু কি যেন ভাবছে!

—মামলা আমি করবো না।

—সব ছেড়ে দিয়ে আসবে ?

—বাবাই ওসব ছেড়ে দিয়ে গেছেন, আমি বা বাধা দিতে যাবো কোন দুঃখে।

মণি যেন কথাটা বিশ্বাসই করতে পারে না।

ও যে নিঃস্ব হয়ে যাবে—একেবারে পথে বসবে তাও কি কল্পনা করতে পারে না। এই সর্বনাশ মঞ্জু কি টের পায় নি! মঞ্জু বলে ওঠে,

—তোমার উপকার নিতে পারবো না; বাবার সঙ্গে ভবিষ্যতে ঝগড়া করবো না, তাতে তোমার ক্ষতি বই লাভ হবে না।

মঞ্জু আবার খাতায় মন দেয়। মণি বুঝতে পারে না কোন অভিমানে সে এই দারিদ্র্যের মাঝে নেমে যেতে চাইছে।

মণি চুপ করে গেল। মঞ্জু কোথায় কঠিন হয়ে উঠেছে। ওদের সঙ্গে কোন সংস্রবই রাখতে চায় না।

দরজা বন্ধ করে দিতে আসছে মঞ্জু, মণি চলে যাচ্ছে, হঠাৎ মঞ্জুর কথায় ফিরে দাঁড়ালো।

—দয়া করে না এলেই খুসী হবো। আমাদের সবই গেছে তোমার বাবার খপ্পরে, বাকী আছে সম্মানটুকু, সেটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতে দাও।

ইঙ্গিতটা বোঝে মণি। ···এর কি জবাব সে দেবে। নীরবে পথে নামল।

কানাই কবরেজ হাঁপাচ্ছে। সাঁই—সাঁই শব্দে বুকপিঠ এক হয়ে যাচ্ছে—কপালে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অতীতের সাক্ষী কানাই কবরেজ আজ একলা বসে কালের পদধ্বনি শুনছে।

অন্ধকার ঘরখানাতে কে যেন ঢুকলো।

—কে ? চোখে ভালো দেখতে পায় না আজকাল ছানি পড়েছে।

—আমি গো। চিনতে পারছো না কবরেজ ? এগিয়ে এল গঙ্গামণি।

—তুই!···কানাই কবরেজ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সত্যিই আজ তাকে চেনা যায় না। কাজল গাঁয়ের সম্রাজ্ঞীর এই দশা! সে দুধে আলতায় গোলা বর্ণ

—নিটোল পুরুষ্ট রূপ—সেই বিলোল চাহনি কোথায় মুছে গেছে। কানাই কবরেজ ওর দিকে চেয়ে আছে। কালো হয়ে উঠেছে, হাড়ক'খানা ঠেলে বের হয়ে এসেছে গালে—চোয়ালের দুপাশে, চোখ ঢুকেছে কোটরে। ও যেন চলন্ত একটা কঙ্কাল —মৃত্যুপুরীতে দূত হয়ে এসেছে। চমকে ওঠে কানাই কবরেজ।

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে গঙ্গা। প্রবল প্রতাপ আজ ধুলোয় মিশিয়ে গেছে। রূপ যৌবন লুটে নিয়েছে কাজল গাঁয়ের নীলরক্ত ঘেঁষা মানুষ, দেউলিয়া হয়ে পথে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসা চলে গেছে মটুর হাতে—গঙ্গা আজ নিঃস্ব। দয়া করে ঘরের এককোণে ও থাকতে দিয়েছিল এতদিন : আর দেবে না। মটু বলে দিয়েছে,

—ওসব কুৎসিত রোগ নিয়ে এখানে থাকলে খদ্দের কেউ আসবে না মাসী, তুমি পথ দেখ।

···কানাই কবরেজ ওর আদুড় গায়ের দিকে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে। আবছা আলোয় ছানিপড়া চোখে ঠিক মালুম হয় না : সারা গা ছেয়ে গেছে চাকা চাকা দাগে ; থিক থিক করছে ঘা। বিবিয়ে উঠেছে।

—ভালো করে দাও কবরেজ। দুটি পায়ে পড়ি তোমার।

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে কবরেজের হাড় পাঁজর ভেদ করে। আজ দুঃখ হয়। কাল মহা নিষ্ঠুর। কবরেজের খ্যাতি প্রতিপত্তি কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে মুখের অন্ন ; আজ গঙ্গাকে দেখে মনে হয়—গঙ্গামণি কালের নিষ্ঠুর সত্য বিচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। ও মরবে – নিঃস্ব হয়ে মরতে বসেছে।

—পারার বিষ ঘা। চাপা পড়া রোগ বের হয়েছে।

—কবরেজ !···ওর পা দুখানাই ধরে ফেলে গঙ্গা।

—আমার দ্বারা কিছুই হবে না গঙ্গা। হাসপাতালে যা। চিকিৎসা আমি ছেড়ে দিইছি। তুই সেখানেই দেখ।

···গঙ্গামণি হতাশ হয়ে চোখ মুছে বের হয়ে যাচ্ছে। কবরেজের ডাকে ফিরে চাইল—শোন।···

ওর হাতখানা তুলে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করতে থাকে। দ্রুত স্পন্দিত নাড়ী জীবনের বিন্দু বিন্দু প্রাণশক্তি শিহর তুলেছে ; বঙ্কিম তির্যক গতি। অন্ধকারের

জগৎ থেকে কি যেন আহ্বান আসছে! ক্ষীণ সে আহ্বান। কিন্তু ক্রমঃধাবমান। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে আসছে সে—অন্ধকার থেকে আলোর জগতে। ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গঙ্গা কবরেজের দিকে।

—কি দেখলে কবরেজ?

—নাঃ, খারাপ কি!···হাসপাতালেই যা তুই।

চলে গেল গঙ্গামণি। ও এখনও বাঁচবে। দুঃখভোগের মাত্রা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাল তাকে নিষ্কৃতি দেয় না। গঙ্গামণির আয়ু পূর্ণ হতে দেরী আছে।

···কিন্তু! তার!···নিজের নাড়ীর স্পন্দন শুনতে পায় না বোধ হয়। বুক পিঠ এক হয়ে যাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড প্রাণশক্তি যেন ছাড়া পেয়ে আবার সহজ গতিতে চলতে থাকে। কবে স্তব্ধ হয়ে শান্তির সমুদ্রে অবগাহন স্নান করবে—জানে না। তার নিজের বেলায় নিদেন হাঁকা ব্যর্থ হয়ে গেছে আজ। আয়ুকাল অনেক আগেই শেষ হয়েছে—আজ বেঁচে আছে তার প্রেতাত্মা।

গঙ্গার শীর্ণ বিষাক্ত রোগজীর্ণ চেহারা বার বার ফুটে ওঠে—কাজল গাঁয়ের অতীতও অমনি গলে গলে পচে খসে পড়বে বর্তমানের দেহ থেকে—খসবে কানাই কবরেজ;···গঙ্গামণি আরও সব্বাই একে একে।

বারকোণার মামলা কোন রন্ধ্রপথে তলিয়ে গেল এই গোলমালে। শচীনই তদারকতদ্বির করছিল। কলকাতায় গেছে, সেইখানেই ফটিকের সঙ্গে দেখা; মামলায় জয় শচীনদের পথের অনিবার্য। ফটিকের আজ প্রয়োজন পড়েছে বারোদেউলের মাঠের—গুদাম হবে ওর। কলের লাগোয়া জমি; হাতছাড়া করলে তার সমূহ ক্ষতি। হরেরামগিন্নীও গেছেন কলকাতায়। সেখানেই হাজির করলো ফটিক শচীনকে তাদের বাসায়। বহুদিনের বন্ধুত্ব। আজ আবার বিলেতী বারে বসে সেই বন্ধুত্বের ঝালাই করে নেয় কলকাতায়।

শচীন তবু বেসামাল হয় নি। এ তার অভ্যাস আছে। বরং মদের ঝোঁকে আরও সাফ হয়ে ওঠে ওর বুদ্ধি।

হরেরামগিন্নী বলে ওঠেন,

—তোমাকে হাজার কয়েক টাকা দিচ্ছি; মামলার কাগজপত্র কিছু এদিক সেদিক করে দাও।

টাকার গন্ধ পেতেই শচীন সতর্ক হয়ে ওঠে; বন্য আদিম জানোয়ার যেন রক্তের নোনতা আস্বাদ পেয়েছে। মেতে ওঠে সে। তবে ফট্ করে কিছু করে ফেলতে চায় না। আন্দাজ বুঝবার চেষ্টা করে,

—কিন্তু সাধারণের কাজ, তারা ছাড়বে কেন? আমার তো একটা কর্তব্য-বোধ আছে। সবদিক বিবেচনা করা দরকার।

পথে এসেছে শচীন, হরেরামগিন্নী বুঝতে পারেন শয়তান লোকটা মোচড় মেরে কিছু আদায় করতে চায়। যাহোক একটা মীমাংসা করা দরকার।

—আজ রাত্রে খেয়ে-দেয়ে কথা হবে। তুমি ঠকবে না এতে!

বাসাতেই এ্যাটর্নীর লোককে ডেকে পাঠিয়ে শচীনকে বসিয়ে রাখলেন তিনি। শুভ কাজ আজই সেরে ফেলা দরকার। শচীনও ভাবতে থাকে—হরেরামবাবু, ফটিককে এ সময় চটানো ঠিক হবে না। সহরের মধ্যে ওরাই এখন চলতি। মনে মনে বহু আশা রাখে সে; তার কাছে সামান্য অন্যায়—অন্যায়ই নয়। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে অবহিত হতে গেলে এ অন্যায় তাকে করতেই হবে। শচীন কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে।

...ফটিকবাবুদেরই জয় হোল। জয় হোল বণিকী চালের, অর্থের—সাধারণ মানুষের দাবী নিগৃহীত হোল কাঞ্চন কৌলিন্যের কাছে; স্তব্ধ হয়ে গেল সহর; বারোদেউল থেকে ওরা বিতাড়িত হোল।

...কেউ গর্জায়—শচীনকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো।

কমলবাবু মদের ঘোরে বলেন—জুয়েল। শচীন একটি জুয়েল।

করুণাময়বাবুর পেটে তখনও গজ গজ করছে শচীনের দেওয়া মদ আর মাংস। বলে—মামলার হারজিত আছেই বাবা। বলে সোনা ফসলের চরের মামলায় হাজার হাজার টাকা উকিল মোক্তারকে খাইয়ে স্রেফ হাতচেটে ঘরে ঢুকলাম। তার কাছে বারোদেউল তো পতিত মাঠ। মামলার মুখে সব ফাঁক হয়ে যায় বাবা তায় আবার হাইকোর্ট! স্পিকটি নট, কাগজের মামলা—

বাহুবল সেখানে কাগজ রোকড়—পড়চা; এসো লড়ে যাও—যার বুকের জোর আছে।

মোহনবাবু অনবরত ফুঁ—ফুঁ করছেন। সবই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চান তিনি।

…বেশ দুটো দল গজিয়ে ওঠে সহরে। শচীন মৌনব্রত অবলম্বন করেছে। বড় জোর বলে,

—হেরে এসেছি, বলবার কি আছে বলো। জজের রায় দেখছি সবই উলটো।

চুপচাপ থাকে সে, 'চাঘরে' বসে বসে কি প্যাঁচ কষে। ডানাপালক আবার মেলবে কাজল গাঁয়ের আকাশে। তবে ঝড়টা একটু কমুক। দু'চারদিন সময় কেটে যাক।

মদনবাবুর পরিক্রমা ঠিকই চলেছে। বৈকালে তিনি পড়ন্ত বেলায় বের হন পথে—একপাক স্কুলের চারপাশে ঘুরে না এলে তাঁর মনটা যেন ভাল থাকে না। দূর থেকে চেয়ে থাকেন সাদা বাড়ীখানার দিকে, প্রতিটি ঘরে ঘরে ওঁর পায়ের ধুলো জমে আছে, প্রতিটি ইটে রয়েছে তার বক্ষ রক্তমাখানো।…মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে—সেই দিনের পর আর ঢোকেন নি ওখানে।…স্তব্ধ হয়ে গেছে সব কামনা—সব চিন্তা। শত শত ছাত্র আসে যায়—কত নোতুন মুখ। হাসি কলরবে ভরে ওঠে নির্জন রাস্তাটা, দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন মদনবাবু; ওই স্বপ্নজগৎ থেকে নির্বাসিত করেছেন নিজেকে। পরিচিত দু'চারজন প্রণাম করে—অপরিচিত নবাগতের দল কৌতুক বিস্ফারিত চাহনিতে ওর দাড়ি ঢাকা মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ওরা জানে না ওঁর পরিচয়। আগামী দিনের কাজল গাঁ তাকে এমনি নিষ্ঠুর ভাবে ভুলে যাবে—মদনমাষ্টারের নাম শুনে হাঁ করে চেয়ে থাকবে—সে আবার কে? ভাবখানা এমনি গোছের।

মনীষা বইগুলো হাতে পেয়ে খুসীতে উপছে পড়ে।

—এনেছেন?

শচীন কলকাতায় গিয়েছিল, মনীষা নিজের জন্য—মদনবাবুর জন্যও কয়েক-খানা বই আনতে দিয়েছিল।

—বসুন।

শচীন বসলো ; মনীষা ওর দিকে চেয়ে থাকে। সারা মুখে বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি।

—ও সব বই কি সহজে মেলে, কলেজ ষ্ট্রীট, নিউ মার্কেট ঘেঁটে তবে পেলাম।

—যথেষ্ট ধন্যবাদ। আবার চা কেন ?

—নিন্ ! মনীষা এগিয়ে দেয় পেয়ালাটা। একটু স্পর্শ লেগে যায় হাতের। শচীন চেয়ে থাকে ওর দিকে। কোথায় যেন শচীনের মনে কি এক গুঞ্জরন উঠেছে।

—একা একা থাকেন কি করে ?

মনীষা হেসে ফেলে—উপায় কি আছে বলুন ! তাছাড়া এতেই সময় পাই না। স্কুলের কাজ, নিজের পড়াশোনা করা—হাঁপিয়ে উঠি।

সন্ধ্যা নেমে আসছে, নীল আকাশের বুকে তারার টিপ জ্বলে উঠেছে, বকুল গন্ধমাখা বাতাস ভরিয়ে দিয়েছে মনের তাকে। বার বার কেন জানে না অনিমেষের কথাই মনে হয়। সে আজ ক'দিনই আসতে পারে নি।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দ পেয়ে একটু চমকে ওঠে শচীন, মদনমাষ্টার আসছেন—মণিমা ! তিনি কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। শচীনকে এখানে দেখে একটু আশ্চর্য হন ! কিছুদিন থেকেই দেখছেন শচীন এখানে আসছে মাঝে মাঝে। ঠিক যেন কেমন সহ্য করতে পারেন না লোকটিকে ; মনে মনে ওর একটা সরীসৃপ কোথায় বাসা বেধে আছে—লালসার তাড়নায় ওর দীর্ঘ দেহটা পাক দিয়ে ওঠে থেকে থেকে।

মনীষা তুলে দেয় নোতুন বইখানা : বাঙ্গালীর ইতিহাস।

আলোতে বইখানা উলটে পালটে দেখে খুব খুসী হন,—বাঃ, চমৎকার বই। কিন্তু মা এত দাম দোব কি করে ?

হাসে মনীষা—দাম দিতে হবে না। আমি দিলাম আপনাকে।

শচীন উঠে গেছে কখন নিঃশব্দে। মনীষা বুঝতে পারে মদনবাবুর মত লোককে শচীন সহ্য করতে পারে না, মদনবাবুও ওকে কেন দেখতে পারেন না,

ওরাই একালের যোগ্য লোক ; অশান্তি সৃষ্টি করতে ভালবাসে। শান্তি—তৃপ্তিকে ওরা ঘৃণা করে। ওই দুটি বস্তুর সন্ধানকে বলে মানুষের দুর্বলতা। মনুষ্যত্বকে ওরা বলে—পরাজিত মনোবৃত্তির পরিচয়।

মনীষা কথার জবাব দেয় না, কোথায় যেন সমর্থন করতে পারে না মতটাকে। মদনবাবু ইতিহাসে ডুবে থেকে মনটাকে ওই পুরোনো মৃত অতীতের গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়েছেন—বর্তমান কাল তার কাছে যেন অসহ্য।

মনীষা বলে ওঠে—অতীতকালের সবকিছুই সত্য—সুন্দর, কল্যাণকর, আজকের সমাজের সব কিছুই কি ক্ষতিকর ?

—কোনটা ন্যায়—কোনটা অন্যায় মানুষ তার বিচার করতে পারে না মা, কালই একমাত্র বিচারক। কালের কষ্টিপাথরে একমাত্র সত্যের সোনাই উজ্জ্বল হয়ে টিকে থাকে, আবর্জনা যা কিছু উড়ে যায়। তাই ইতিহাস ন্যায়বিচারক। সেই ইতিহাসের শিক্ষাই বলে আজকের মানুষের এই স্বর্ণমৃগয়া—ছায়ামারীচের পিছু ছোটা নোতুন কিছু নয়। কিন্তু ইতিহাস তার দাম কিছু দেয় নি। বিস্মৃতির অতলেই তলিয়ে গেছে তারা। চেঙ্গিস খাঁ—তাইমুরলঙ্গ আজ দুঃস্বপ্ন ; বুদ্ধ—অশোক সেখানে সত্যের আলোতে ভাস্বর।

মনীষা বলে ওঠে—একই আদর্শে জগৎ চলে না মাস্টার মশাই। নীটশের কথাও শুনেছে মানুষ।

—Can it be possible that they have not yet heard of it—that God is dead. Dead are all the Gods : now do we desire the superman to live.

ঈশ্বরের রাজ্যও বিবর্তিত হয় ; মানুষ সেখানেই প্রধান। তার সমাজে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর জনই কর্তৃত্ব করবে ; একটি মানুষ না হয় একটি শ্রেণীর হাতেই থাকবে কর্তৃত্ব। জগতের এও সত্য।

—The beast of prey, the race of conquerors and masters shall rise again from the ashes of man—they shall rise in a mightier, more deadly from.

আরও শক্তিমান হয়ে উঠবে সেই সমাজ—সেই একক মানুষ—সাধারণের চিতাভস্ম থেকে। নীটশের দর্শনও মিথ্যা নয়।

মদনবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে মনীষার দিকে চেয়ে থাকেন, একি বলছে সে? কাজল গাঁয়ের বুকেও আগামী নিষ্ঠুর সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটছে, বিপ্লব এনেছে এর সমাজ জীবনে, চিন্তাধারায়; মনীষাও বাদ যায় নি সেই সংক্রমণ থেকে।… অনুভব করেন মদনবাবু মনীষা আজ শচীনের কথাগুলোকে সমর্থন করে মনে মনে। ক্ষমতার পূজারী নারী, সমাজের বুকে স্বাধীন অধিকার তাদের অর্জন করতে অনেক বাধা, তাই ক্ষমতা অর্জনকারীদিকে মনে মনে পুজো করে শ্রদ্ধা করে। নিজের ন্যায়বিচার শক্তি তার এই মোহ ভঙ্গ করতে পারে না। কোথায় যেন নিরাশ হয়েছেন তিনি। ক্লান্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন,

—নীটশের দর্শন যে ভুল তা আজকের জার্মানীর অবস্থা থেকেই বুঝতে পারবে না। হিটলারের মত সুপারম্যানের কি নিদারুণ পরিণতি হয় তাও দেখো, সেদিন মনকে প্রশ্ন করো এর জবাব পাবে।

হিটলারের ক্ষমতা তখন আকাশস্পর্শী; সারা পৃথিবীর একশ্রেণীর কাছে তিনি দেবতা: তাঁর সম্বন্ধে এই হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য যেন মনীষা সহ্যকরতে পারে না,

—হিটলার কি অন্যায় করেছেন?

—ইতিহাস তার উত্তর দেবে মণিমা, ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারক। আজ উঠি—রাত্রি হয়ে গেছে।

বের হয়ে গেলেন বৃদ্ধ, টেবিলে বইখানা পড়েই রইল, মনীষা বুঝতে পারে ইচ্ছা করেই তিনি গ্রহণ করলেন না বইখানা।…কোথায় যেন মনের সুর কেটে গেছে মনীষার। তার যৌবনরক্ত আজও ধমনীতে উষ্ণতর হয়ে প্রবাহিত হয়;…বার্দ্ধক্যের সহজাতধর্মকে নির্বিচারে মেনে নিতে কোথায় বাধে মনীষার, আজও জীবনে আশা হারায় নি সে। ব্যর্থতার সুর বাজে নি—যে তার মধ্যে মাধুর্য মিশিয়ে মনকে স্তোক বাক্য শোনাবে।

বার বার মনীষা ভুলতে পারে না এক ঝড়ো রাতের স্মৃতি—অনিমেষ আর মঞ্জুর সেই আলোছায়া মাখা মূর্তি—তার চোখকে ফাঁকি দিতে তারা পারে নি। কোথায় যেন নিদারুণ আঘাত পেয়েছিল সে।

মনীষা সেই রাত্রের পর থেকেই মনস্থির করে ফেলেছে। অনিমেষকে প্রশ্রয় দেবে না আর। নোতুন করে গড়ে তোলার জন্য নিজেকে তৈরী করছে। এমনি

সময় শচীন এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। জীবনের সমস্ত আনন্দ সম্পদ সে জোর করে ছিনিয়ে নিতে চায়। আগামী দিনের মানুষ ওরা ; অনিমেষের মত যা আছে তাই নিয়েই তৃপ্ত নয়, উপরের দিকে তাদের দৃষ্টি ; মনীষা এক নজরেই ওদের চিনেছে।

স্কুলের বার্ষিক উৎসব। সহরের গণ্যমান্য অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়েছেন। অনিমেষও গেছে।

বহুদিন সেই ঘটনার পর থেকে আর বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হয় নি তাদের, আজ দেখা হতে নেহাত যন্ত্রচালিতের মতই এগিয়ে এল মনীষা।

—আসুন।

মনীষার এ যেন অন্য কোন সত্তা। পরক্ষণেই সে অন্যদিকে চলে যায়। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে শচীন। সব তাতেই তার প্রাধান্য। অনিমেষ এই পরিবেশে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে।

…রাত্রি হয়ে আসে উৎসব চুকতে। শচীন ঘর্মাক্ত কলেবরে তখনও কাজকর্ম চুকিয়ে ফেলতে ব্যস্ত। মনীষাকে ধমক দিয়ে ওঠে সে,

—আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন, সব দেখছি আমি। কত খাটবেন বলুন তো ?

সত্যি…মনীষা যেন ভেঙ্গে পড়েছে পরিশ্রমে। ছাদের উপর বসে আছে একটা চেয়ারে। অতিথিরা সবাই চলে গেছে। হঠাৎ অনিমেষকে দেখে যেন চমকে ওঠে মনীষা—আপনি ?

এগিয়ে আসে অনিমেষ—চলো, বাড়ী ফিরবে না ?

অস্পষ্ট তারার আলোয় মনীষা চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে, কি যেন অব্যক্ত ব্যাকুলতা ফুটে রয়েছে তাতে। মনে মনে তৃপ্তই হয় মনীষা, কিন্তু এইটুকু নিয়েই খুসী হবে না সে। দেখতে চায় অনিমেষের সারা মন বেদনায় ছটফট করছে —তবেই তৃপ্ত হবে সে। এ যেন কি এক প্রতিশোধ নেবার সংকল্প তার। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে,

—আপনি যান, আমার দেরী হবে।

উঠে অন্য ঘরের দিকে চলে গেল মনীষা, যেন অপমান করবার দৃঢ় পথই নিয়েছে সে।

পায়ে পায়ে নেমে এল অনিমেষ। রাত্রি নেমেছে আকাশে। নিঃসঙ্গ নির্জন রাত্রি। একাই চলেছে সে বাড়ীর দিকে।

হঠাৎ কাদের হাসির শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে। কাদের হালকা কথার শব্দ ভেসে আসছে। দেখতে পায় মনীষা আর শচীন ফিরছে বাড়ীর দিকে, অবাধ হাসিতে ফেটে পড়ছে মনীষা—শচীনের কথায়।···ওই মনীষাকে চেনে অনিমেষ—চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের কত স্বপ্নরঙ্গিন দিন—মনীষা আর সে। এমনি প্রাণখোলা হাসির মুক্ত ঝরণার মত লুটিয়ে পড়েছে সে। আজ!

সেই অর্ঘ্য রচিত হয়ে চলেছে অন্য কোন দেবতার উদ্দেশে—অনিমেষের কোন দাবী সেখানে নেই। ওদের আবছা মূর্তি রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল দূরে। একলা ফেলে যাওয়া সাথীর মত দাঁড়িয়ে আছে অনিমেষ স্মরণের বালুচরে।

ফণীবাবু কিছুদিন থেকেই ভাবছিল কথাটা; সব আপদই গেছে। এত সহজে গোলমাল মিটে যাবে ভাবতেই পারে নি সে।···কোম্পানীর মালিকানা—রুট পারমিট, শেয়ার সবই তছনছ করে ঘরে তুলেছে। বাধা আছে একটি মাত্র লোক। তাকে এর মধ্যে রাখতে চায় না ফণীবাবু; ক'দিন হতেই মনে মনে ভাবছিল। পথ পেয়েছে এইবার।

···অন্ধকার নেমে এসেছে; ঘরের ভিতর ম্লান আলো জ্বলছে। অপিস—আঙিনা জনহীন হয়ে গেছে। বাইরের তক্তপোষে কারা যেন শোবার আয়োজন করছে—ওপাশে নারকেলগাছের নীচে আলো জেলে একখানা গাড়ী মেরামত করা হচ্ছে! মুখোমুখি বসে আছে ফণী চক্রবর্তী—ওদিকে দাঁড়িয়ে রেণুপদ; মাঝখানে বড় বড় হিসাবের খাতা, কয়েকখানা টিকিট বই।

—তা হলে! দুশো সাতাশ টাকার কি হবে? প্রথম তো তুমি উড়িয়েই দিতে চেয়েছিলে।

রেণুপদও স্তম্ভিত হয়ে গেছে—এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানি না আমি।

ফণীবাবু বলে ওঠে—তা জানবে কেন ? এসব কাজ অনেক দিন থেকেই হচ্ছে নইলে ঠাকুরমশায়ের নামে ওই সব কে লিখবে ? কোথায় কোন দিকে সে খরচের টাকা গেছে জানি না। এমন দেবতুল্য লোককে পথে বসিয়ে ছেড়েচো—এইবার আমাকে নিয়ে পড়েছো।

চমকে ওঠে রেণুপদ, ঘৃণায় রি রি করে ওঠে মন ; এমন হীন মন্তব্য করতে পারবে কল্পনাও করেনি। রেণুপদ বুঝতে পেরেছে ওর পরিণাম কি ; তাকে চলে যেতেই হবে। তবু অন্যায় অপবাদ সহ্য করে যাবে না।

বলে ওঠে—ওকথা বলবেন না, ওই টাকার কেনা যন্ত্রপাতির ভাউচার আমার সন্ধানে আছে, সেই নম্বরী চেসিস, ইঞ্জিন, সেই মেকারী ডায়নামো কোন গাড়ীতে বসানো আছে—আমি তা ভালো জানি। বিশ বছর ধরে কোম্পানীর চাকরী করছি। আজ এই চোর সাজিয়ে বিদেয় না দিয়ে বলুন সোজা কথায়, আমি কালই চলে যাবো। আমাকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করলে আপনিও রেহাই পাবেন না।

থেমে গেছে চকোত্তী মশায় ; ওর মত সন্ধান আর কারোও নেই। এ সময় ওসব কথা না ঘাটানোই ভালো। চুপ করে থেকে বলে ওঠে চকোত্তী,

—আহা ! হিসাবের ভুল মানুষ মাত্রেরই হয় ; ওটা কোথায় গোলমাল হয়েছে। হয়তো ওপারের অপিসেও বই পড়ে আছে খেয়াল করোনি। আমি তাই-ই বলছিলাম। চোর বদনাম দেবার কোন কথাই আসেনি।

রেণুপদ রাগে গজরাচ্ছে, মনে মনে গোঁফদাড়িগুলো ফুলে উঠেছে সিংহের কেশরের মত ; চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। ফণী চকোত্তী চুপ করে যায় ওর জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে। একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তার।

অপিস থেকে বের হয়ে আসছে রেণুপদ ; আবছা অন্ধকারে দেখতে পায় আম গাছের নীচে কে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে : লাল আভা লেগেছে ওর মুখে ; একটু বিস্মিত হয় রেণুপদ—কালামদন দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ এই সময় এখানে ওইভাবে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে থাকবার অর্থ বুঝতে পারে না।

ওর দিকে না চেয়েই রেণুপদ অন্ধকার পথে নামলো—মনে তখনও ঝড় বয়ে চলেছে।

মনীষা সেদিন মাধববাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছে। মাধববাবুর মেয়ের জন্মতিথি, সহরের মধ্যে পদস্থ উকিল; গাড়ী বাড়ী চলতি ব্যবসা; স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান—তার উপর হাসপাতালের গভর্নিং বডিতেও রয়েছেন। সহরের অভিজাত সম্প্রদায় সকলেই এসেছে—নোতুন এস-ডি-ও সাহেব আছেন মধ্যমণি হয়ে।

বাইরের প্রশস্ত হল ঘরটা সাজান হয়েছে ফুল দিয়ে। ও পাশের ঘরে বসানো হয়েছে জন্মতিথি যাকে কেন্দ্র করে সেই মেয়েটিকে। ফুলচন্দন রংগীন শাড়ীতে বিশ্রী দাঁত বের করা মেয়েটি সেজে বসে আছে। মুন্সেফ গিন্নী নোতুন ডিজাইনের হার ছড়াটা দেখাবার জন্যই কাপড়টা সরিয়ে রেখেছেন; সেরেস্তাদার গিন্নী আড়ালে মন্তব্য করে—না হয় রূপ যৌবন আছে, ছেলে পুলে নেই দেবা আর দেবী; তাই এত গুমোর!

অবশ্য রোজকারের দিক থেকে সেরেস্তাদার মশায়ও কম যায় না, হাকিম হাতে থাকলেই—ব্যস! সব কাজ পাকা। মনীষা ছোকরা সার্কেল অফিসারের ওপাশে একটা পুরোনো অর্গান বাজিয়ে গান গাইছে—

মোর জীবন পাত্র উছলিয়া

হাসি—আনন্দে ফেটে পড়ছে সে।

...দরজার বাইরে থেকে উঁকি মেরে মহিলাসম্প্রদায় দেখছে; পেশকার গিন্নী দোক্তা খাওয়া দাঁত বের করে বলে ওঠে,

—ওই বুঝি পুঁটুদের মাষ্টারনী? ছেমড়ির চটক আছে দেখ্‌তিছি।

দেশজ-টান এখনো যায় নি তার। তাই নিয়ে সমাজে এখনও মাঝে মাঝে কথা শুনতে হয়। মুন্সেফ গিন্নী বলে ওঠেন ঠোঁট উলটিয়ে,

—ছাই গান জানে।

...মনীষাকে মেয়েমহল ছেড়ে বাইরের ঘরে ওদের মধ্যে সহজভাবে মেলামেশা করতে দেখে ওরা একটু বিরক্তই হয়েছে। হাজার হোক স্বামীদের উপর অনেকেরই নাকি নজর আছে।

মনীষা হাসছে ওদের প্রশংসায়—কি আর গাইতে পারি। অনেকদিন গান ছেড়ে দিইছি।

···মনীষার মনে আজ কি এক বাঁধভাঙা আনন্দ কল্লোল। শচীন বসেছে ওদিকে। চাঁদের আলো ভেঙে পড়েছে নারকেল গাছের পিছল পাতায়, শিউরে উঠছে রুপোলী পাতাগুলো, অমনি কোন শিহর তার দেহমনে।

গানের সুর যেন উপছে বের হয়ে আসছে; উৎসবমুখর হয়ে ওঠে ঘরখানা ওর সুরে সুরে। সহরের উছল জীবনযাত্রায় সে আজ মিশিয়ে দিয়েছে নিজেকে।

শচীন ওর দিকে চেয়ে আছে স্তব্ধ দৃষ্টিতে; মনে মনে কোথায় ঝড় উঠেছে; সব মুছে গেছে ওর সামনে হতে; লোকজন—আনন্দ কোলাহল মিশিয়ে গেছে; জেগে থাকে স্তব্ধ নির্জন অন্ধকারে আকাশপ্রদীপ শিখার মত ওই সুর—কার চোখের চাহনি···অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারার স্নিগ্ধতা আনে; পথ দেখায় শ্রান্ত ক্লান্ত পথিককে।

কেমন সুশ্রী ওর দুটো চোখ; নাকের উপর জমেছে বিন্দু বিন্দু স্বেদ রেখা; কপালে উড়ে এসে পড়েছে চূর্ণ অলকদাম; শচীন এভাবে কোন নারীকে কোন দিনই দেখেনি।

···হঠাৎ ঢুকলো অনিমেষ। ওদের উৎসবের সাজসজ্জা ধোপদুরস্ত ছিমছাম পোষাকের বেষ্টনীর মধ্যে ম্লান সুবাস মাখা বাতাসে ওর আবির্ভাব যেন ছন্দপতন ঘটায়; প্যাণ্ট কোট ছাড়বার সময় পায়নি, হাতে লেগে রয়েছে লাইজলের তীব্র গন্ধ; ঘামে ধুলোয় ভিজে রয়েছে মুখ, চুলগুলো উড়ছে সেই বৈকাল থেকেই। মাধববাবু অভ্যর্থনা জানায়—এসো, এসো ডাক্তার।

পদাধিকার বলে তিনি ইদানীং অনিমেষকে তুমি সম্বোধন করতে সুরু করেছেন। অনিমেষ এক নজর চাইল ওদের দিকে। মনীষা মধ্যমণি হয়ে বসেছে; ওর দিকে চেয়েই বলে ওঠে,

—মদনবাবু খুব অসুস্থ, হাসপাতালেই আনা হয়েছে তাঁকে; আপনাকে একবার দেখতে চান।

একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে ছোকরা সার্কেল অফিসার, বেশ জমে উঠেছে গানের আসর, তিনি জিজ্ঞাসা করেন—মদনবাবু! তিনি আবার কে?

পেশকার জবাব দেন—হেই যে—পাগলা মাষ্টোর কয় হেই তিনিই।

মনীষা বলে ওঠে—একটু পরে যাচ্ছি।

অনিমেষ মাধববাবুকে বলে ওঠেন—আমাকে মাফ করবেন, ওদিকে কেসটা ভালো নয়, আমাকে সেখানেই থাকতে হবে। আমি চলি। নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

মাধববাবু যেন একটু মনক্ষুণ্ণ হ'ন। মুন্সেফবাবু বলে ওঠেন,

—বিজি ডাক্তার, ভেরি রেসপনসিবিল বয়।

কে বলে ওঠে—এত পয়সার নেশা ধরলে সকলেই বিজি হয়। পয়সা লুটছে দুহাতে।

সেরেস্তাদার মশায় বলেন—এইতো সময়।

মাধববাবু মনে মনে অসন্তুষ্ট হন। তার মেয়ের জন্মতিথির চেয়ে কোথাকার ওই হাভাতে মদন মাষ্টারের অসুখ হোল বেশী! এতগুলো লোক সকলেই কাজের, হাকিম স্বয়ং এসেছেন—তাদের নাকের উপর কাজ দেখিয়ে গেল ছোকরা।

ওঘরে খাবার জায়গা হয়েছে; মনীষা জুতো খুলে নিজেই পরিবেশন করতে সুরু করেছে। মাধববাবু খুব খুসী।

—এই না হলে মেয়ে, লেখাপড়া, গান-বাজনা, সেলাইফোঁড় থেকে সুর করে পরিবেশন পর্যন্ত সবতাতেই ফাষ্ট ক্লাস।

হাসে মনীষা—মেয়েদের এ তো চিরকালের অভ্যেস।

...হা—হা করে হাসতে থাকেন মাধববাবু ভুঁড়ি কাঁপিয়ে।

—শোন গো, মায়ের আমার কথা শোন। এই তো প্রকৃত শিক্ষা মা, কাজল গাঁয়ের বহুভাগ্য তোমার মত শিক্ষয়িত্রী পেয়েছে।

নিমন্ত্রিত সকলেই একবাক্যে কথাটা স্বীকার করে, ওর অযাচিত প্রশংসায় মেয়ে-মহলে গুঞ্জরন শোনা যায় অন্দরে। কে যেন বলে—মাগো মা, বেসরম একেবারে।

—না হলে কি কোন তেপান্তরে আসে চাকরী করতে?

...মনীষার কোন দিকে নজর নেই; নিঃশেষে ভুলে গেছে অনিমেষের কথা; হাসিতে ঝরণার মত উপছে পড়ছে।

—আপনাকে এক চামচ পোলাও দিই ফটিকবাবু?

মিলমালিক ফটিক আজকাল ফটিকবাবু, সহরের অন্যতম গণ্যমান্য কুলীন ব্যক্তি। নিজের গাড়ীতে আজকাল ঘোরাফেরা করে; ফটিক বলে ওঠে—না—না, ওরে বাপরে, কতো খাবো!

কৃত্রিম বিস্ময়ে ফেটে পড়ে মনীষা—ওমা! কিই বা খেলেন?

শচীনের পাতের কাছে গিয়ে বলে ওঠে—পাতে এতো নষ্ট করা চলবে না।—আপনাকে?

স্বয়ং হাকিমকেই আক্রমণ করেছে—মনীষা মাংসের বালতি হাতে, সমস্বরে সমর্থন ওঠে—হ্যাঁ—হ্যাঁ, দিন ওর পাতে।

হাকিম বেচারা ঘাবড়ে গেছে: সমারোহ চলেছে মাধববাবুর ঘরে।

কাজল গাঁয়ের আকাশে নেমে এসেছে রাত্রির তমসা ঢাকা স্তব্ধতা; কালোর গহনে অবগাহন স্নান করছে জনপদ। মিটমিট করে আলোটা কাঁপছে হাসপাতালের গেটে; দমকা বাতাসে এখুনিই যেন নিভে যাবে, অতল অন্ধকারের মাঝে প্রাণের ওই স্পন্দনটুকু স্তব্ধ হয়ে যাবে।

অনিমেষ আর নার্স জেগে আছে; মদনবাবুকে বাঁচাবার সমস্ত চেষ্টাই করে চলেছে তারা; অনিমেষ নিজের চেম্বার হতে সদ্যকেনা অক্সিজেন সিলিণ্ডার এনেছে। যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে চলেছে অনিমেষ। জীর্ণ দেহ থেকে থেকে মুচড়ে ওঠে যন্ত্রণায়।

কাকে যেন দুচোখ মেলে খুঁজছেন মদনবাবু।

—ডাক্তার! অনিমেষের দিকে চেয়ে রয়েছেন মদনবাবু; যদি সংসার করতেন তিনি তাঁর ছেলেও এতবড় হোত—এমনি মহৎ প্রাণ সদাশয় সন্তান! দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে বুক চিরে।

কি যেন ভাবছেন তিনি। স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি চলে গেছে বহুদূর অতীতে; গরুর গাড়ী করে প্রথম এসেছিলেন যাযাবর জীবনের প্রারম্ভে এই কাজল গাঁয়ে। সামান্য একটু সহরের ভ্রূণ; মাত্র ক'টি বাইরের প্রাণী—নেহাত পালাই পালাই করে অনবরত; মাঠের ধারে টিম টিম করছে ইস্কুল—একতলা খানকয়েক ঘর; ছেলেরা নিজের খুসীমত আসে যায়; মাষ্টাররাও বিশেষ মন দেবার প্রয়োজন বোধ করে না, হাজিরা খাতা সই করে কেউ বা বাড়ী চলে যায় দিবানিদ্রা দিতে, কেউ বা ছিপ নিয়ে পাশের পুকুরেই সারা দুপুর বসে থাকে।

…ক্রমশঃ একতলা থেকে আরও বড় দোতলা উঠলো; বোর্ডিং—ছাত্র-সংখ্যা বেড়ে উঠলো;…সহরের সমৃদ্ধির মূলে স্কুলেরও প্রয়োজন ছিল। কত

হাসিমুখ—প্রাঙ্গণের মেহগিনি গাছের সবুজ ছায়ায় ছেলেরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাকে,

—মাস্টার মশাই !

...চোখ মেলবার চেষ্টা করেন মদনবাবু...কি যেন স্বপ্ন দেখছেন—তুমি !

অনিমেষ কি বলছে ; তার কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে দূর থেকে ভেসে আসে কাদের হাসি—কলরোল !...কার ডাগর দুটো চোখ—মনীষা যেন কাজল গাঁয়ের নেশায় মেতে উঠেছে।

এ কোন অন্য নগর ; অতীতকে ভুলিয়ে দিয়েছে—তার কাঠামোর উপর নবজন্মের সাধনা করে চলেছে।

...কিন্তু এর স্বপ্ন দেখেন নি তিনি

...কেমন আছেন ?

মাস্টার মশায় চোখ খুলবার চেষ্টা করে—মনীষা ! মনীষা !

নার্স নীরবে চাইল অনিমেষের দিকে ; চুপ করে বসে আছে অনিমেষ ; মনীষা আজ হারিয়ে গেছে—তার কাছে মদন মাস্টারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

...উপরের ধাপে উঠে নীচের অপ্রয়োজনীয় সিঁড়ির মায়া ত্যাগ করতে মনীষার এতটুকুও বাধে নি। রাত্রির প্রহর গুনছে অনিমেষ আর হাসপাতালের স্টাফ নার্স। মহাকালের পদধ্বনি গুণছে মুমূর্ষু মদনবাবুর হৃৎস্পন্দনে।

—আমার পাণ্ডুলিপিগুলো রেখে দিও।

অনিমেষ মুখ নামিয়ে ওর ক্ষীণকণ্ঠের কথাগুলো শুনছে ; ওর দুচোখে কি ব্যাকুলতা !...সান্ত্বনা দেয়—ঠিক থাকবে ওগুলো !

—ওগুলোই আমার সব। যদি কেউ যোগ্য লোক থাকে—বইপত্র দিয়ে দিও। তার মর্যাদা যেন রাখে।

.. তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করতে কি আসবে কোন উত্তরসাধক ! বৃদ্ধের দুচোখে ব্যাকুলতা।

—দক্ষিণরাঢ়ের ইতিহাস শেষ করা হোল না আমার।

হাঁফাচ্ছেন তিনি।

…অনিমেষ ওর নাকের কাছে অক্সিজেন ফ্লানেলটা ঠিক করে দিতে থাকে। সাবধান করে—এখন ওসব কথা থাক !

হাসেন মদনবাবু, মলিন বিষণ্ণ হাসি—ওকথা আর শেষ হবে না অনিমেষ, না বলাই রয়ে যাবে হয়তো।

স্তব্ধ তমসার বুকে জেগে আছে হাজারো তারার রোশনী,…অশরীরীর দল সাশ্রুনেত্রে চেয়ে আছে তাদের ফেলে যাওয়া পৃথিবীর দিকে—অতীত ভবিষ্যৎকে বেষ্টন করে রয়েছে মহাকাল; ইতিহাসের ভাষায় তারই বন্দনা; তারই অনুরণন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিন্তাধারায়, কালাশ্রয়ী জীবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে।

…কাজল গাঁ সেই জগতের বাইরে নয়; মহা যুগ—মহাকাল-মহামানবের চিন্তাধারা—দুঃখ সুখ—উত্থান পতনকে কেন্দ্র করেই হাজারো গ্রহের আবর্তনের মাঝে কাজল গাঁ একটি চলিষ্ণু বিন্দু। এর অন্তরে বিভিন্ন মানুষ—বিভিন্ন পথে চলেছে একই সম্পূর্ণতার দিকে। জীবনের মহাস্রোত বয়ে চলেছে কোথায় তার কূলে কূলে শ্যাম উপবন পাখীডাকা ছায়াচ্ছন্ন বনভূমি—কোথাও বা ফসলের ইসারাভরা ক্ষেত: কোথাও জেগে থাকে উষর মরুভূমি—বালুঝড়, কোথাও তার বুকে ওঠে ঘূর্ণি—সর্বনাশা মাতন; কিন্তু চলা তার ফুরোয় নি; এক মহাসাগরের দিকে চলেছে অন্তহীন স্রোতে। হঠাৎ তার বুকে একটি বুদবুদ উঠেছিল; সূর্যের সোনা রোদ তাতে এনেছিল রামধনুর বর্ণালী; ক্ষণিকের মাঝেই তা মিলিয়ে গেল। বাতাসটুকু গেল উপরে—জলরেখা আশ্রয় নিল জলের বুকে; ক্ষতিবৃদ্ধি কোথাও ঘটলো না।

মদনবাবুর মৃত্যুও তাই স্বাভাবিক গতিতেই ঘটলো, কাজল গাঁয়ের চলমান জীবনস্রোতে ক্ষয়ক্ষতি কিছুই ঘটেনি তাতে।

কাছারী পাড়ার ওপাশে নোতুন সহর গড়ে উঠেছে; স্কুল-কলেজের অদূরে ফাঁকা মাঠখানায় ভিৎ গড়ে উঠেছে।

নোতুন সহরের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে শচীনের নোতুন ব্যবসাকেন্দ্র।

কাজল গাঁয়ে সিনেমা হাউস গড়ে উঠছে। থিয়েটার হল হিসাবেও ভাড়া দেওয়া যাবে নাট্যকে ক্লাবকে—আর হবে সিনেমা ; শচীন দিনরাত ডিজাইন—যন্ত্রপাতি কেনা-কাটা—ডাইনামো বসানো নিয়ে ব্যস্ত। বারোদেউলের মামলা বানচাল করা টাকা এইবার কাজে লাগাচ্ছে শচীন এতদিন চুপ করে বসে থাকার পর। এ বিষয়ে সাহায্য করেছে মনীষাই সব থেকে বেশী।

শচীন অবাক হয়ে গেছে ওর কর্মক্ষমতা, বুদ্ধি বিবেচনা দেখে। যেখানে সুঁচ গলে না মনীষা ফাল চালিয়েছে সেখানে।

—ম্যাজিস্ট্রেটের পারমিশান চাই।

—বেশতো! চলুন একদিন।

…ওর সাবলীল গতি, কথা বলবার ভঙ্গী ম্যাজিস্ট্রেটকেও মুগ্ধ করেছিল।

—আমার দরখাস্তটা—

…মনীষা ব্যাগখুলে কাগজখানা এগিয়ে দেয় তাঁর দিকে। একটু অবাক হ'ন তিনি—আপনার এতে স্বার্থ?

—আমিও অংশীদার। মনীষা কথাটা সহজভাবেই বলে ফেলে। শচীন ওর উপস্থিত বুদ্ধিতে চমৎকৃত না হয়ে পারে না। পারমিশানের জন্য সব আটকে ছিল, জট যে সহজে ছেড়ে যাবে ভাবতেই পারে নি।

—সিনেমা আজকের শিক্ষা-সভ্যতার অঙ্গ।

ডি-এম সাহেব কথাটা একেবারে অস্বীকার করতে পারেন না,—তা সত্যি কিন্তু—

মনীষা বলে ওঠে—সব কিছুরই সুফল-কুফল আছে।

কাজ-কর্ম সেরে ফিরছে ওরা দুজনে। কাজল গাঁয়ের রাস্তা এখন অনেক ভালো হয়ে উঠেছে। বাস ছাড়াও ট্যাক্সি আছে।

—বড্ড ভিড় একটা ট্যাক্সি নিই। বলে ওঠে শচীন। একটু যেন একা পেতে চায় ওকে। মনীষা ওর দিকে চেয়ে থাকে, ভাবটা সেও বুঝতে পেরেছে। বাধা দেয় না, মনে কি যেন মুক্তির আনন্দ। শচীনকে ভালো লাগে—ভাল লাগে ওর দৃপ্ত চাহনি—কর্মনিষ্ঠা আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। যৌবন তাকে সব সম্পদ এনে দিয়েছে।

···চলেছে গাড়ীখানা নির্জন তারাজলা রাতের অন্ধকার ভেদ করে; আবছা চাঁদের আলোয় তেলকাঁড়ার বিল ঝলসে উঠেছে, জলো হাওয়া আছড়ে পড়ে ওর চুলে—শাড়ীর আঁচল নিয়ে মাতামাতি করছে। শচীন চেয়ে আছে ওর দূরে প্রসারিত দৃষ্টির পানে; ও যেন অধরা—অমনি দূর আকাশের তারা।

···হঠাৎ একটু স্পর্শ! যেন শিহরণ খেলে যায় মনীষার সারা দেহের রক্ত-কণিকায়। ব্যর্থ যৌবন যেন অতর্কিতে জেগে উঠেছে! ফিরে পেয়েছে সে প্রাণ—যে প্রাণ এতদিন পথ চলার মাঝে হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে।

···শচীন চেয়ে আছে তাঁর দিকে, দুটো তারায় কি যেন ব্যাকুলতা, গাড়ীর ঝাঁকানিতে এসে পড়ে মনীষা ওর গায়ে; নিবিড় উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করে সারাদেহে, জেগে উঠেছে কি এক আদিম প্রবৃত্তি প্রকৃতির অন্তহীন নির্জনতার মাঝে; নিজেকে উধাও করে দিতে চায় সে, মনের আগল খুলে আজ বেরিয়ে আসতে চায় অন্য কোন আদিম নারী, যাকে মনীষা এতদিন চিনেও চেনে নি।

কতক্ষণ সে স্বপ্নঘোরে ছিল জানে না, দূরে গোকর্ণ থানার ক্ষীণ আলো দেখা দেয়; অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে মনীষা,

—সরে বসো; ড্রাইভার দেখতে পাবে।

···নিজের কাপড়চোপড় ঠিক করে নিল। গাড়ীখানা ছুটে চলেছে বেগে। হেড লাইটের আলোয় অন্ধকার ঝলসে উঠেছে; ঘন নীল হয়ে উঠেছে দুপাশের ঘন পাতাঢাকা গাছগুলো; রাত্রি নেমেছে।

সরমা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বাড়ীটার প্রাণ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে; কোন কোলাহল – সাড়া নেই। সন্ধ্যার সংগে সংগেই নিস্তব্ধ হয়ে যায় বাড়ীখানা। বৈঠক-খানায় কত লোকজন আসতো—হাসি-গল্পের শব্দে মুখর হয়ে থাকতো বাড়ী; মোটর অপিস থেকে ড্রাইভার, কর্মচারীরা আসতো, আজ বৈঠকখানা ঘর স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে; আলো জ্বলে না বাড়ীতে। তেলের পয়সাও নেই, প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। মাত্র সরমা আর মঞ্জু; আর টিকে আছে খুকির মা; বহুদিনের কর্মচারী; এমনি করে মা-মেয়েকে অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে যেতে পারেনি। বাড়ীখানা ঘিরে রয়েছে মৃত্যুর স্তব্ধতা; দাওয়াতে মিটমিট করে জ্বলছে একটা লণ্ঠন, সরমা বসে আছেন একা প্রহর জেগে। এ কোন দুর্দিনের সামনে এসে

পড়েছে তারা জানে না ; নিজেই কত লোকের চাকরী দিয়েছিল, দিয়েছিল আশ্রয়, আজ তাঁরই মেয়েকে কিনা বেরুতে হয়েছে চাকরীর সন্ধানে ; রোজকারের চেষ্টায় ।

কার পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে—মঞ্জু এলি ?

…আমি ! পুরুষ কণ্ঠে জবাব আসে । একটু বিস্মিত হয় সরমা—তুমি !

মণি অন্ধকার থেকে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো ; সরমা সাদর অভ্যর্থনা জানায় —বসো বাবা ।

চারদিক দেখে চলেছে মণি, পিছনের খিড়কির দিককার পাঁচীলটা পড়ে বাগান আর উঠোন একাকার হয়ে গেছে। উঠোনে ধানের মরাইএর ভিড়ও নেই, ফাঁকা শূন্য পড়ে আছে উঠোন ।

—মঞ্জু কোথায় ? তাকে দেখছি না ?

সরমা কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল, দুচোখ ফেটে যেন জল আসে তার। জীবনের সব কাজ ফুরিয়ে গেছে ; অপর ইন্দ্রিয়গুলো অসাড় হয়ে পড়েছে, সাময়িকভাবে তীব্রতর হয়ে উঠেছে চেতনা ;…স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে মন । অশ্রু-ভিজে কণ্ঠে বলে ওঠে সরমা,

—চাকরীর চেষ্টায় গেছে বাবা ; স্কুলে কোথায় মাষ্টার নেবে, সেইজন্যে গেছে কার কাছে।

মণি অবাক হয়ে যায় কথাটা শুনে—চাকরীর সন্ধানে গেছে ?

ওদের অবস্থা যে এতখানি চরমে উঠেছে তা স্বপ্নেও ভাবেনি, নইলে কাজল গাঁয়ে চাকরী করতে পাঠাতো না তারা ; আজ মনে হয় এর জন্য দায়ী পরোক্ষভাবে সেও ; তার বাবারই হীন জঘন্য মনোবৃত্তির জন্য এই এদের অবস্থায় এসে পড়তে হয়েছে। বলে মণি,

—বি-এ পাশ করুক, তারপর !

—মেয়ে শোনে কই ? বলে চাকরী করা অপমান নাকি ? লেখাপড়া শিখেছি কেন করবো না ; আজ যদি তোমার ছেলে থাকতো তাকে কি আটকে রাখতে ?

…মঞ্জুর সারা মনে কেন এই বিক্ষোভ তার কিছুটা অনুমান করতে পারে মণি ; সাধারণ মেয়ের মত মন নিয়ে বা সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মেনি।

ছেলেবেলা হতেই তার স্বাতন্ত্র্য আছে—সেটা সে বজায়ও রেখেছে আজ পর্যন্ত। নিজের মত কোনদিনই সে ছেড়ে আসবে না। শত দুঃখ পাক তবুও না।

আজ মনে হয়—মঞ্জু অসীম আকাশের তারা; ক্ষুদ্র ঘরের সীমা ছাড়িয়ে অসীমে তার ব্যাপ্তি; মণিকে পিছনে ফেলে সে এগিয়ে গেছে অনেক দূরে—সংঘাতময় জীবনের মাঝে সংগ্রামী সে, নব অভিজ্ঞতার সম্পদ তার মনে।

—ওকে বোঝাতে পারলেন না?

—বুঝবে না ও; এই বয়েসে বিয়ে-থাও দিতে পারলাম না; লেখাপড়া নিয়েই থাকুক; কিন্তু তারও খরচ আছে তো।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে চুপ করলো মণি।

রাত্রি হয়ে আসছে—স্তব্ধ অন্ধকার জোনাকীর আলোয় ভরে উঠেছে। তারায় তারায় জ্বলছে আলোর শিহরণ, ঝিঁঝিঁর ডাকে মুখর হয়ে উঠেছে নির্জন সন্ধ্যাকাশ।

স্কুলের সামান্য মিসট্রেসের চাকরীর উমেদারী করতে গিয়েছিল মনীষার কাছে। কিন্তু হতাশ হয়েই ফিরছে। ওরা আগে থেকেই সব ঠিক করে রেখেছে। নিদারুণ অবহেলা আর অপমান সহ্য করেই ফিরে এল মনীষার কাছ থেকে। অন্ধকারে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে সব কিছু। মনের মাঝে সেই অতল অন্ধকারের স্পর্শ—কোন আলোর নিশানা নেই। একটা গাড়ী—ধুলো উড়িয়ে চলে গেল; হেড-লাইটের আভায় রাস্তার ধারে নারকেল বন খড়োঘর ঝলসে উঠেছে; তার মুখে ছিটকে পড়েছে একটু আলো, বাস ভর্তি যাত্রী যেন দেখে গেল তাকে—সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বের হয়েছে কাজল গাঁয়ে চাকরীর সন্ধানে; তাদেরই গাড়ী; বাবার কেনা—বহু বৎসর তাদের অন্ন যুগিয়েছে, আজ চলে গেছে ফণী চক্কোত্তীর হাতে।

সরে দাঁড়ালো সে, ও কথা আর ভাবতে চায় না। এককালে কি ছিল আজ তার শূন্য হিসাব করতে রাজী নয়। আজ সে সত্তোর টাকা মাইনের মিসট্রেস পদের উমেদার। পিছনে মর্যাদার একটা আবছা মুখোস ছিল—তাও খসে পড়েছে প্রায়। মনীষার কথাগুলো মনে পড়ে—কেমন যেন অবহেলাই করলো তাকে, আজ পিছনে তার কোন পরিচয়—সম্ভাবনা নেই হয়তো সেই কারণেই।

—এত দেরী হ'ল যে!

বাইরে বাড়ীতে অন্ধকার নির্জনে মণিকে দেখে একটু আশ্চর্য হয় মঞ্জু; হঠাৎ কি যেন উদ্দেশ্য নিয়ে আসে ওরা।...সারা বৈকালের হতাশা ভরা মন—দপ করে জ্বলে ওঠে; একটু চুপ করে থেকে বলে মঞ্জু,

—সেকথা তোমার জেনে লাভ কি ?

সরমার ব্যথাভরা কথাগুলো তখনও মনে পড়ে তার।

মণি চুপ করে গেল; যে মেয়ে জীবনের সব আশা হারিয়ে—অন্তর বাইরে প্রতারিত হয়েছে, সামান্য একটু আশ্রয়—দুমুঠো আহার্য, নিজের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত যাকে অনুসন্ধান করে তৈরী করে নিতে হয়, তার কাছে এই ধরনের উত্তরই স্বাভাবিক।

—চাকরীর কি হোল ?

—খুব খুসী হয়েছো দেখছি। বাবাকে গিয়ে বলো সংবাদটা—শুনলে তিনিও খুসী হবেন।

আর্তনাদ করে ওঠে মণি—মঞ্জু! এসব কি বলছো ?

—ঠিক বলছি।...মঞ্জু আজ দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে। আগেকার সেই ভালোবাসা, প্রেমের নীলস্বপ্ন আজ তার কাছে নেহাত অবাস্তব বিলাস; ঘর বাঁধা তাঁর কাছে ছেলেমানুষি। মনকে সতেজ করে তুলেছে সে—মঞ্জু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টি, সমস্ত মোহের উর্দ্ধে যেতে চায় সে।

—বাড়ীখানা তোমাদের কাছে বন্ধক নেই; আমাদের দারিদ্র্য অভাব নিয়ে তামাসা না করতে এলেই খুসী হবো।

এগিয়ে আসে মণি—তুমি কি সব ভুলে গেছো ? তোমাকে সাহায্য করবার দাবী আমার আছে।

হাসবার চেষ্টা করে মঞ্জু, পরিহাসভরা কণ্ঠে বলে—তাই নাকি! আমাকেও যে বাবা বন্ধক রেখে গেছেন—তা জানতাম না। মণি স্তব্ধ হয়ে ওঠে।

কঠিন হয়ে ওঠে মঞ্জু—অতীত অতীতই। তার জের টেনো না। আমাকে একলা থাকতে দাও; দয়া করে আর এসো না এখানে। যাও—

...মণি চলে গেল, অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে মঞ্জু। হঠাৎ আবিষ্কার করে তার দুচোখে জল; নিজের অজ্ঞাতেই অন্যমন আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

মণি! অতীতের শ্যাম সজীবতাময় দিন—স্মৃতিরঙ্গীন সুর—কত বিদায়ী চৈত্র সন্ধ্যার বকুল গন্ধমাখা বাতাস, সবকিছু সে দূর করে দিয়েছে জীবন থেকে।

—মণি এসেছিল। মেয়েকে দেখে সরমা ব'লে ওঠে।

—হুঁ! বিশেষ কোন কথা না বলে মঞ্জু উপরে উঠে গেল! চোখমুখ তখনও থমথমে। মনের এই দুর্বলতার সংবাদ মাকে জানাতে পারে না সে।

রেণুপদ বেকার। সেই সন্ধ্যাতেই তার চাকরী খতম হয়ে গেছে; ত্রিশ বছরের কত হাসি অশ্রুর দিন, সজল সন্ধ্যার মেঘ ঢাকা আকাশ তলে কত স্মৃতি—বৈশাখের রৌদ্রমাখা ঘুমঢাকা কত মধ্যাহ্ন রেখে এসেছে ওই বাঁশবন ঘেরা ঠাঁই-টুকুতে। কাজল গাঁয়ের ইতিহাস সে জানে, সে জানে মানুষের নীচতার কথা; সে দেখেছে কত নোতুন মানুষের আসা যাওয়া।

…মটর অপিসের কাছাকাছি না এসে থাকতে পারেন না সে। কি যেন দুর্বার আকর্ষণে সে রোজই আসে। মটরগুলো ছাড়ছে; তার আমলের কাঁচা খোয়া-ওঠা শিরদাঁড়া ভাংগা রাস্তা নয়; বর্ষাকালে দুর্গম নদীর বাধা দূর হয়ে গেছে। ফোরোকংক্রিট স্লাব পড়ছে; ওদিকে সাঁইথিয়া রোড সুরু হয়েছে।… সাঁইথিয়া থেকে কাজ করে আসছে একদল অন্যদল কাজ করে চলেছে কাজল গাঁয়ের দিক থেকে—নোতুন পথে নোতুন সভ্যতার ধারা আসছে বন্যাব জলের মত কাজল গাঁকে ভাসিয়ে দিতে।

—এক কাপ চা দিই গো দাদা?

গোঁপদাড়ির অযত্ন বর্ধিত জংগল ভেদ করে চকচকে দুটো চোখ চেয়ে থাকে চা-ওয়ালার দিকে। ও বেইমান নয়; শ্যামকে সেই-ই ঠাঁই দিয়েছিল—সে আজ বিশ বছর আগে। চায়ের আমদানী তখন হয়নি বিশেষ।

ঠাকুর মশায় বলতেন—ওসব খেয়ো না রেণুপদ। সাহেবদেরই পোষায়।

সেই চা আজ জনপ্রিয় স্বাস্থ্যকর পানীয়। শ্যামের দোকানেই টাংগান আছে ক্যালেণ্ডারটা, কত কলকারখানার লোক—মেয়ে মজুর হাসিমুখে সেই স্বাস্থ্যকর পানীয় গ্রহণ করছে।

রেণুপদ গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলে ওঠে—এগারোটার গাড়ী আজ দেরী করছে কেনরে ?

শ্যাম জবাব দেয়—আর বলো না দাদা, একি তোমার আমল যে ঘড়িতে টং করলো আর তোমার ইঞ্জিনও গর···গর···র···।

···একটা ঝকঝকে গাড়ী আসছে সদর থেকে ট্রিপ নিয়ে ; রেণুপদ গাড়ীর গায়ে লেখা নামটা পড়ে চমকে ওঠে—'পথের সাথী'

প্রোঃ শ্রীমদনবিহারী দে।

স্পিড পঁচিশ মাইল।

শ্যাম চা ঢালতে ঢালতে বলে—মদনবাবু গাড়ী করেছে।

অবাক হয়ে শোনে রেণুপদ ; মাত্র কয়েক বছর আগেকার কথা মদনকে সেই বাঁচিয়েছিল সেবার ঠাকুর মশায়কে বলে কয়ে। তিনিই বলতেন—

—ওকে বিশ্বাস করো না রেণু, ও সব পারে। সাধ করে কালা সেজেছে। সেই বুকিং ক্লার্ক কালা মদন আজ গাড়ীর মালিক ; ঠাকুরমশায়ের হিসাব ফণী চক্রোত্তী একাই তছরূপ করতে সাহস করে নি, মদনও ভাগ পেয়েছে কিছু।

রেণুপদ কি ভাবছে !···জীবনে সে কি পেল ? গাড়ী—ট্যাক্সিও চালাতে পারে নি, ব্যবসাও করে নি। আজীবন বিশ্বস্ত কেরাণী থেকে—শেষ বয়সে আজ বিতাড়িত হয়েছে।

মশ্ মশ্ শব্দে চালাঘর ভরে ওঠে—একটা তীব্র সুবাস ! শ্যাম ব্যস্ত হয়ে ওঠে,

-আসুন মদনবাবু।

—এক কাপ চা দে, ডবল ডিমের মামলেট। কি গরম রে এখানে একেবারে যে রোস্ট হয়ে যাবো।

রেণুপদ মুখ তুলে চাইল—ওর দিকে। ঠিক যেন ঠাওর করতে পারে না। দামী ফিনফিনে ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে চকচকে পামসু। সেদিনের কালা মদন আজ রাতারাতি বদলে গেছে। রেণুপদকে যেন দেখতেই পায় নি। বলে ওঠে,

—শ্যামা, ওদিকের রাস্তার কতদূর রে ?

—আজ্ঞে শুনছিলাম আদি বহড়া পর্যন্ত এয়েছে।

হুঁ।…ও লাইনের রোড পারমিটের জন্য দরখাস্ত করেছে—সেটার একটু তদ্বির করা দরকার। চালু লাইন হবে। মনে মনে কি ভাবছে মদন। রেণুপদ গেলাসটা নামিয়ে বের হয়ে এল নীরবে।

হঠাৎ একটা চীৎকারের শব্দে সকলেই সচকিত হয়ে যায়; কংকাল যেন মূর্তি ধরে নেমে এসেছে। ছেঁড়া ময়লা কাপড়খানা লুটাচ্ছে ধুলোয়—চোখ দুটো ঠেলে বের হয়ে আসছে। হাতে গায়ে-পায়ে দাগড়া দাগড়া ঘা। মটর অপিসের দু একজন ক্লিনার তাকে তাড়াবার চেষ্টা করছে। কাছে যেতে সাহস করছে না কেউ, পাগলী থুপু ছিটোচ্ছে থু থু করে। অবাক হয়ে যায় রেণুপদ: গংগামণি!… গংগামণি পাগলের মত হয়ে গেছে—রাস্তার ভিখেরী আজ সে। ঘরবাড়ী প্রসার প্রতিপত্তি কোন দিকে নিঃশেষ হয়ে গেছে। মটুরাণী আজ সব হস্তগত করে তাকে দূর করে দিয়েছে। চীৎকার করছে গংগামণি,

—বেইরে আয় আঁটকুড়ীর ব্যাটা; বিটলে বামুন কোথাকার। তোর পয়সার নেশা—কাঁচা মাংসের নেশা আমি ঝেঁটিয়ে ঠাণ্ডা করে দোব। মর মর তুই। সারা গায়ে লট লট করে পোকা পড়ুক! থু—থু। ওয়াক থু।

ফণী চকোত্তী বেগতিক দেখে অপরাধীর মত ঘরের ভিতর ঢুকে গেছে। বাজখাঁই গলায় চীৎকার করছে গংগা,

—সব বিজাতের ব্যাটা। কুকুর—নেড়ি কুকুরের বাচ্চা।

…ফণী চকোত্তী আর মটুরাণীর চক্রান্তের কথা কোন ক্রমে হয়তো ফাঁক হয়ে গেছে। গংগাকে আজ পাগল করে ছেড়েছে। কাজল গাঁয়ের নীল রক্তের সঞ্চিত বিষ তার সর্বনাশ করেছে—তাকে নিঃস্ব করেছে ওদের অর্থ পিপাসা। আকাশ জোড়া রূপ আর রূপার বুভুক্ষার সামনে গংগামণির বলি হয়ে গেছে।

কে একটা রড নিয়ে তাড়া করতেই আপাততঃ সরে গেল গংগা, দূর থেকেই গাল দিতে থাকে—বেইরে আয় আঁটকুড়ীর ব্যাটা।

অনিমেষ একটু বিস্মিত হয় মনীষার কথা শুনে; জগবন্ধুই সংবাদটা আনে, রমণবাবুর মেয়ে চাকরী করতে চেয়েছিল স্কুলে—কিন্তু শচীন মাধববাবুর জন্যই পেল না। হেড মিসট্রেসও মত দেয় নি।

…স্কুল কমিটির সভ্য অনিমেষও। সেদিন মিটিংএ গিয়েছিল, কিন্তু এসব কথাই উঠতে দেয় নি ওরা, গোপনে গোপনে নিয়োগপত্র দিয়েছে পেশকারের শালীকে। ক্ষুব্ধ হয় অনিমেষ। মঞ্জুর সম্বন্ধে বিবেচনা ওরা করেনি।

মনীষার দেহে এসেছে মেদাধিক্য ; অর্থাগমও হচ্ছে কিছু। সিনেমা হাউস চালু হয়েছে। কাজল গাঁয়ের জীবনে এনেছে প্রাণের নোতুন চাঞ্চল্য। রোজ দুপুরের আগে মোহনবাগানের দবির খাঁ কয়েকজন সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে সহরের অন্যতম এক ঘোড়ার গাড়ীর ছাদে বসে ব্যাণ্ড বাজিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করে বেড়ায়। আশে-পাশে দরমা দেওয়া তাতে আগামী ছবির বিজ্ঞাপন ; তেমাথার দেওয়ালে দেওয়ালে রংগীন পোস্টার।…বাইরের গ্রাম হতে লোকজন এসে চেয়ে থাকে ছবির দিকে ;…বৈকালের আগেই সুরু হয় মাইক্রোফোন! দূর শ্যামল প্রান্তর—মাঠের মধ্যে ছায়াঘন দুইলে কালীবাড়ীর দীঘির টলটলে কালো জলে ভাসমান বালিহাঁস দম্পতি শিউরে ওঠে ; ঘন কালো জলপাই গাছের পাতায় মাঝে মাঝে লাল রংএর সমারোহ—পাখীগুলো অবাক হয়ে শোনে—বাতাসে বাতাসে কিসের সুর ভেসে আসে।

সিনেমা হাউসের পাশে ভিড় জমে ছেলেমেয়ে আবালবৃদ্ধবণিতার। ওরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে—ওই বিশাল হলের মধ্যে কি যেন স্বপ্নপুরী রচনা করেছে। সহর জীবনে এনেছে চাঞ্চল্য!…বিজলীর আলোয় পানের দোকান ভরে গেছে।…বিড়ি বাঁধছে আর গুনগুন করে আওড়ায় সদ্যশোনা গানটা—

প্রেমের গোকুলে কুটির বাঁধিব গো
প্রেমের যমুনা তীরে-এ-এ।

কাজল গাঁয়ের জীবনের সংগে এই আলো ঝলমল জীবন কোথায় যেন মেলে না। মোহমদির চাহনিতে চেয়ে থাকে ওরা ; ছায়ালোকের মেয়েদের চালচলন—চুলবাঁধা—শাড়ী, ব্লাউজের ডিজাইন, কথা বলার ভংগী মগজে ভাবনা এনেছে। এতদিনের জীবনযাত্রায় কোথায় বিপ্লব আনছে—আমূল বিপ্লব।

…মনীষা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অনিমেষের দিকে। ওর কথাগুলো ঠিক যেন বুঝতে পারে না।…

—কি বলছো তুমি ?

অনিমেষ বলে ওঠে—ঠিকই বলছি। ইচ্ছা করলে তুমি এ উপকারটুকু তাদের করতে পারতে। সত্যিই অভাবে পড়েছে তারা।

মনীষা গলার ভাঁজে পাউডার দিচ্ছে, বলে ওঠে—অভাব তো সকলেরই।

—তাহলে কোয়ালিফিকেশন দেখতে পারতে, যাকে চাকরী দিয়েছো সে তো ম্যাট্রিকুলেট, আর মঞ্জু আণ্ডার গ্রাজুয়েট।

মনীষা বলে ওঠে—কিন্তু সেইটাই বড় কথা নয়। আরও কারণ থাকতে পারে। স্কুলের সেইটাও দেখা দরকার।

অনিমেষ ওর দিকে চেয়ে থাকে। এ যেন অন্য কোন মনীষা, অন্তরের সমস্ত মনুষ্যত্ব—শিক্ষার সব শালীনতা মুছে গেছে ওর মুখ চোখ থেকে। চোখের নীচে, গালে, কাঁধে জমেছে চর্বি, চোখ দুটোয় সেই মাদকতাময় মিষ্টি আকর্ষণও নেই। এ যেন অন্য এক নারী : অন্তরের সমস্ত শুচিতা হারিয়ে ফেলেছে, দেহের মত কুৎসিত হয়ে উঠেছে ওর মন। অনিমেষ প্রশ্ন ক'রে,

—সেটা কি জানতে পারি ?

– ভালোই জানো সেটা। তোমার কাছে সেই সংবাদ অজানা নয়।

বিস্মিত হয় অনিমেষ, ওর কথায়। কি এমন কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারে না। কমিটিতেও উঠলো না সে কথা। নেহাত লোক দেখানো কমিটি খাড়া করা আছে। নিজেকে সেই সাক্ষীগোপাল হিসেবে ভাবতেও লজ্জা বোধ হয়।

—কি সেই কারণ ?

মনীষা চোখের পাতায় কাজল টানছিল ; ওর চোখে কি এক নেশার মত মাদকতা ; স্থির কণ্ঠে বলে ওঠে—ওর স্বভাব চরিত্র বিশেষ ভালো নয়।

চমকে ওঠে অনিমেষ—আমি এর প্রতিবাদ করবো কমিটির কাছে। একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মেয়ে আজ বিপদে পড়েছে—তার নামে এই জঘন্য মন্তব্য প্রকাশ করতে লজ্জা হওয়া উচিত।

অনিমেষ রাগে যেন ফুলে উঠেছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে চলেছে কথাগুলো, মনীষা ওর ক্রুদ্ধ মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে, একটু পরিহাস ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে,

—সেই ঝড়ের রাত্রে তোমার ওখান থেকে ধুতি পরে সারা সহর হেঁটে এসেছিল – সে রাত্রের অভিসারের সাক্ষী আর কেউ ছিল না ?

চমকে ওঠে অনিমেষ। কয়েক বৎসর আগে সামান্য একটা ঘটনাকেও ভুলতে পারেনি মনীষা। মনে মনে তাই নিয়েই জট পাকিয়ে চলেছে। অনিমেষ বিস্মিত হয়ে যায় ওর মন্তব্যে।

—এই রুচি নিয়ে যে স্কুল কমিটি গড়ে উঠেছে তা জানতাম না। তুমিও এক্স‌অফিসিও জয়েণ্ট সেক্রেটারী—আমার রেজিকনেশন লেটার দিয়ে যাচ্ছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনিমেষ লিখে ফেললো চিঠিখানা, এই রইল !

...মনীষা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সামান্য ব্যাপার থেকে যে এতখানি ঘটবে তা কল্পনা করতে পারেনি। ও কথাটা ওর নিছক মনগড়া, মঞ্জুকে চাকরী না দিয়ে পেশকারের শ্যালিকাকে দেবার প্রয়োজন ছিল মাধববাবুরই বেশী। মামলাগুলোর সুরাহা হবে ভবিষ্যতে তাই হয়েছে ওই কথাটা। মনীষা ফস্ করে কথাটা বলেই বেকুব হয়ে গেছে। কিন্তু আর ফেরানো যায় না। জানে—এই নিয়ে আলোচনাও হতে পারে, এবং আর পিছানোর উপায় নেই।

কাগজখানা বাতাসে উড়ছে। মনীষা হঠাৎ চকিতের মধ্যে অনুভব করে ওর অনুমান মিথ্যা নয়—অনিমেষের কোথায় একটা দুর্বলতা আছে, নইলে ওর জন্য এমনি করে প্রতিবাদ করে যাবে কেন ? সে রাত্রের ঘটনার মূলে কোন সত্য হয়তো ছিল।

...হঠাৎ মনীষা যেন বদলে গেছে ; অতীতের সেই দিনগুলো ভিড় করে আসে। কয়েকটি স্বর্ণসন্ধ্যা ; জীবনের প্রথম জাগরণী সুর—একটু স্নিগ্ধ স্পর্শ ; তাকে অবলম্বন করেই সে এসেছিল কাজল গাঁয়ে, জীবনের পথ খুঁজতে পূর্ণ সার্থকতা আনতে। কিন্তু মধ্য থেকে অন্য কোন নারীই তার সব কামনাকে ব্যর্থ করে দিল।

মঞ্জুকে হিংসা করে মনীষা ; প্রথম থেকেই ঠিক যেন সহ্য করতে পারেনি ; কেন—জানে না তা। সেই সন্ধ্যার কথা ভোলে নি আজও, ধুতি পরা মঞ্জুর সারা দেহে যৌবনের প্রাচুর্য ; বৃষ্টিধোয়া যুঁই ফুলের মত শান্ত স্নিগ্ধ মধুর সুবাস সজীবতা ওকে ঘিরে রেখেছে ; অজানা খুসীতে উপচে পড়ছে সে।

মনীষার অবচেতন মন হিংসায় ব্যথায় টন টন করে ওঠে। প্রতিটি কাজের ফাঁকে দেখা দেয় অনিমেষ-মঞ্জুর সেই একত্রিত মূর্তি। ব্যাকুল করে তুলেছে সারা মন অজানা ব্যথায়। সেই ব্যথাকেই ভুলতে চেয়েছে মনীষা বার বার—কাজ আর শত অকাজের ছলে ছুতোয়। অনিমেষ চলে গেছে।

…স্তব্ধ আকাশে শোনা যায় লাউডস্পীকারে বাজছে সিনেমার গান : কাজল-গাঁয়ের আকাশে তারই প্রতিধ্বনি : পাখীডাকা—ঝিঁঝিঁজাগা রাত্রির সুন্দররূপ হারিয়ে গেছে ; বাতাসেও মুছে গেছে বকুল গন্ধ।…আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করে ওঠে, রাইসমিলের বাঁশী ; রাত্রি আটটা বাজছে। দীর্ঘতান ক্রন্দনের মত শোনা যায় বাঁশীর ডাক। বর্ষার সজল আকাশের নীচে—হিজলের বিলে ময়ূরাক্ষীর জলে কাঁপছে সেই সুর। কাজল গাঁয়ের অন্তরাত্মা কাঁদছে—গুমরে উঠছে চাপা আর্তনাদ :

শচীনের ডাকে চমক ভাঙলো মনীষার।

—একি এখনও বসে ! ওদিকে সময় হয়ে গেছে। ওরা সব আসতে সুরু করেছেন।

শচীনের কথায় যেন জ্ঞান ফিরে আসে তার। সাজপোষাক সেরে বসেছিল। নোতুন এস-ডি-ও সাহেব এসেছেন তারই অভিনন্দন সভা, আয়োজন করেছে শচীন, মাধববাবু, ফটিকবাবু সকলেই। হাজার হোক হাকিম—তাদের ব্যবসা প্রতিপত্তির জন্যও তাঁকে হাতে রাখা প্রয়োজন। মহকুমার তিনিই প্রথম পুরুষ।

ক্লান্ত কণ্ঠে বলে মনীষা—শরীরটা ভালো নেই।

বিছানায় কাৎ হয়ে পড়ে আছে মনীষা ; আজ সত্যই সে ক্লান্ত ; শচীন ওর দিকে চেয়ে আছে। বাইরে তমসাচ্ছন্ন রাত্রি, দূরে রাস্তার মোড়ে একটু আলোর সংকেত ; লোকচলাচল কমে গেছে ; গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ধারা কালো আকাশের বুক থেকে ঝরছে। শচীনের শিরায় শিরায় নির্জনতার মাঝে কোন মাদকতার স্বাদ ; মুচড়ে উঠছে সরীসৃপ।

—মনীষা !

…আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে ঘরে ; আলোটা ম্লান হয়ে আসে !

…একটু স্পর্শ ! মনীষার ক্লান্ত ব্যাকুল মন যেন আবেশে তৃপ্ত হয়ে ওঠে : কথা কইলো না—শচীনের দিকে চাইল। সব ভুলে যেতে চায়—তুচ্ছ পাওয়া

না পাওয়া, মান-অপমানের জ্বালা সব বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হতে চায় সে।

নিঃশ্বাস উষ্ণ হয়ে আসে—সজোরে বৃষ্টি নেমেছে। সব কিছু ঝাপসা যবনিকার অন্তরে ডুবে যায়।

শত অভাব-অনটনের মধ্যেও মঞ্জু বি-এ দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। সরমা মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন—অবাক হন ততই। কোথায় সে এই দুর্মদ শক্তি পেয়েছে কে জানে! অভাব তাকে পঙ্গু করেনি, হতাশা তাকে স্থবির করে দেয়নি। দুর্বার সাহসে এগিয়ে চলেছে সে।

একখানা শাড়ী—তাই সাবান কেচে ইস্ত্রী করে পরে পরীক্ষা দিতে গেছে আঠারো মাইল দূর সহরে ; আবার সন্ধ্যায় বাসে ফিরে এসেছে। পরীক্ষার ফিস্ দেবার সময় মঞ্জু ভাবনায় পড়ে। এত টাকা, সামান্য ওই টাকাই আজ তার কাছে মহাসমস্যা হয়ে এসেছে।

—পরীক্ষা কি দিবি না শেষ পর্যন্ত ?

—টাকা না জুটলে দোব না।

সরমা মেয়ের অবিচলিত কণ্ঠে জবাব শুনে অবাক হয়ে যায়।

চাকরীটার আশা করেছিল, কিন্তু অনিমেষই এসে সংবাদটা দিয়েছে। সব কথা অনিমেষ বলতে পারে না, শুধু বলে,

—ওখানে চাকরী না হওয়াতে আমি খুসী হয়েছি।

মঞ্জু মুখ তুলে চাইল, অনিমেষের মুখ চোখ থমথমে। প্রশ্ন করে—কেন ?

একটু থেমে বলে ওঠে অনিমেষ—অনেক কথাই শুনতে হোত, ভদ্রলোকের জায়গা ওটা নয়।

হাসবার চেষ্টা করে মঞ্জু—আপনি যে কিছু শুনেছেন তা বুঝতে পেরেছি। ব্যাপারটা কি ? ঝগড়া-টগড়া করেছেন নাকি ? আপনি তো কমিটির মেম্বার।

...অনিমেষ ভুলতে পারে না মনীষার কথাগুলো, মনে পড়লে এখনও সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরে ; বলে ওঠে—রেজিগনেশন দিয়ে এসেছি ওদের কমিটিতে।

চমকে ওঠে মঞ্জু; বোধ হয় একটা কিছু ঘটেছে যার জন্য সম্মানরক্ষার্থেই অনিমেষের এছাড়া পথ ছিল না; মঞ্জু স্থির কণ্ঠে বলে—ওদিকে চটিয়ে কাজ ভাল করেন নি। ওরা সব পারে, চাই কি এই প্রসংগ নিয়ে কোন কিছু রটনা করাও ওদের পক্ষে সম্ভব।

অনিমেষ বলে ওঠে—করুক ওরা যা পারে। ওদের কাহিনী আমিও জানি, দরকার হয় তাও প্রকাশ পাবে।

মঞ্জু বাধা দেয়—ছিঃ, কুকুরে কামড়াবে তাই মানুষও কামড়াবে নাকি?

—কামড়াবে না, তবে লাথি মারতে দোষ নেই।

অনিমেষ পকেট থেকে ভাঁজ করা ফর্মখানা বের করলো, টেবিলের উপর মেলে দিয়ে বলে ওঠে—সই করো। আজ সহরে যাবো জমা দিয়ে আসা হবে।

পরীক্ষার ফর্মখানা এগিয়ে দিল। চমকে ওঠে মঞ্জু। অনিমেষের দিকে মুখ তুলে চাইল।

—সই করো। আবার নানা হাংগামা আছে, জমা দেওয়ার।

মঞ্জুর মন আজ নির্মুক্ত হয়ে গেছে। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রও থাক যেখানে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে সে নিঃশেষে। অনিমেষকে দেখে মনে হয় ওর কাছে মনের কোন সংবাদই গোপন নেই। বলে ওঠে,

—আমার পরীক্ষা দেবার এখনও ঠিক নেই।

যেন আকাশ থেকে পড়ল অনিমেষ—ঠিক নেই। সেদিন বললে।

কথাটা পরিষ্কার করে দেয় মঞ্জু—টাকার যোগাড় করতে পারি নি, ফিস দোব কোত্থেকে?

অনিমেষ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে, চারিপাশে নজর সে এখানে দেয় নি। নিজে আবাল্য প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ; মঞ্জুদের প্রথম অবস্থাও দেখেছে সে, আজ তার সংগে কোন মিলই নেই। উঠোনের একপাশে খুকীর মা চাট্টি মোটা কেলে ধান সিদ্ধ করে শুকোতে দিয়েছে। ওই ভেনে চাল হবে—কি যে চাল বের হবে তা অনুমান করে অনিমেষ, মঞ্জুর পোষাক ও আগেকার তুলনায় সামান্য—একখানা শাড়ীই পরতে দেখেছে বার বার; আঁচলের কাছে সেলাইও রয়েছে খানিকটা। অবস্থাটা অনুভব করতে পারে অনিমেষ।

—পরে দেবে এখন আমিই জমা দিয়ে দিই।

মঞ্জু কি যেন ভাবছে ; অনিমেষ বলে ওঠে—নাও সই করো লক্ষ্মীটি।

মঞ্জু কি ভেবে ফর্মখানা ভর্তি করে সই-সাবুদ করে দিল ; অজ্ঞাতেই গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা অশ্রু। অনিমেষের নজর এড়ালো না।

—মঞ্জু! ··

মঞ্জু ডাগর অশ্রুসিক্ত চোখ দুটো তুলে চাইবার চেষ্টা করলো।

—মা জিজ্ঞাসা করলে কি বলবো ?

—বলো রমণবাবুর কাছে আমার ঋণ কিছু আছে—তাই থেকে নিয়েছি।

মঞ্জু কথা বললো না, অনিমেষ কাগজপত্র নিয়ে বের হয়ে গেল। মঞ্জু স্তব্ধ হয়ে বসে কি ভাবছে। যে সম্মানের আসনটুকু ছিল অনিমেষের কাছে তাও বোধ হয় হারালো সে, অন্যমন কোথায় গুঞ্জরন তোলে, যে বাধা ছিল আজ যেন তাও দূর হয়ে গেছে। অনিমেষকে কোথায় আপন করে পেয়েছে সে আজ।

···তারপরই কোন রন্ধ্রপথে শনি ঢুকেছে। সহরের মাধববাবু—শচীনের সমাজ যেন আজ উঠে পড়ে লেগেছে। অনিমেষ সেদিন রোগী দেখতে গেছে, অবনীহাটীর পুত্রবধূকে। বনেদী বেনে গুষ্টি ; পয়সায় নাকি শেওলা পড়ে তাঁর ; মনটাও যেন তেমনি অন্ধকূপে শেওলাকালো হয়ে আছে।

···হাঁটুতক গামছা পরে বাইরের বাড়ীতে হুঁকো টানছিলেন হাটীমশায়, ডাক্তারকে আসতে দেখে বের হয়ে এলেন, ওপাশে বসে আছে সদ্য আগত ডাঃ মনোময় বসু! এককালে পূর্ববঙ্গের নাকি খাস নামকরা ডাক্তার, পরোপকারী। বর্তমানে দেশবিভাগের ফলে এসে ভাসতে ভাসতে হাজির হয়েছেন কাজল গাঁয়ের ঘাটে ; বিনা ভিজিটেই রোগী দেখতে যান ; গল্প করে চলেছেন তিনি,

—আমাগোর চিকিৎসা আজকালের পোলাপানের মত হতি পারে না, কথায় কথায় ইনজেকশান—হাবিজাবি ওষুধ···তালিবালি কথা ; ওতে লাভ কি রে মশোয় ? দিমু তিন দাগ কি ছ দাগ ওষুধ। ব্যস দেখতি পাবেন কথা কইবে আমাগোর ওষুধে।

তিনি ব্যাগ থেকে কথা কওয়া ওষুধ বের করছেন। অবনীহাটী অনিমেষের গাড়ী থামতে নিজেই ছুটে আসেন রাস্তায়। অনিমেষ বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা ; একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে,

—আমাকে ডাকবার কি দরকার ছিল তাহলে ?

—রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু, স্ত্রী মানে মেয়েরা বলে—মানে। থেমে গেলেন হাটী মশায় !

অনিমেষ চেয়ে থাকে তার দিকে, বলে ওঠে—বলুন ! মানে কি জানা দরকার।

—মানে, বুঝতে পারেন তো মেয়েদের কথা ; বলে মেয়েদের রোগ ছেলে-ছোকরা ডাক্তার দিয়ে তেমন—এই মানে ধরুন অনেকেই অনেক কথা বলে, ...তবে আমি বিশ্বাস করি না, আপনার মত দেবচরিত্র বিশ্বাসী ডাক্তার পেয়েছি আমাদের ভাগ্য শুভ বলেই। ওসব ইতিলোকের কথায় কান দেবেন না। সেদিন সহরে নাকি সিনেমা হলে কি দেখে এসেছে ওরা, আপনি আর একটা মেয়ে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনিমেষ, কয়েকদিন আগে মঞ্জুকে নিয়ে সদরে যেতে হয়েছিল সত্যি, কিন্তু তাই নিয়ে এতখানি রটবে তা কল্পনাও করে নি। অপমানে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে তার ; মুখ চোখ থম থমে হয়ে যায়, নীরবে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন হাটীমশায় : ওঁরই বা দোষ কি ! কারা এর মূল ও যেন খানিকটা অনুমান করতে পারে।

রেণুপদোর দাড়িগুলোতে পাক ধরেছে, গোঁফের ডগা বেঁকে নেমে এসেছে ঠোঁটের উপর, ময়লা হয়ে উঠেছে কাপড়খানা, হাফসার্টের একটা হাত ছিঁড়ে গেছে অর্ধেকটা : কাজল গাঁয়ে ওই নিয়েই ও ঘুরে বেড়ায়। শ্যামের দোকানে গিয়ে বসে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মটর অফিসের দিকে—তার অতীত তিরিশ বছরের জীবনের পানে। নিজের হাতে গড়া ওই ঘর দাওয়া ; নিজের পোঁতা ওই বাতাপি গাছটা—ঠাকুরমশাই বসিয়েছিলেন ও পাশের গন্ধরাজ গাছ, আজও ফুলে ফুলে ছেয়ে উঠেছে।

কাজল গাঁয়ের জীবন নাড়ী ওই বাস সার্ভিস ; ওখানে এলেই সব স্পন্দন ধ্বনিত হতে শোনা যায়। হরিপদ মিস্ত্রী বুড়ো হয়ে আসছে—তবু আজও তার মন বদলায় নি। ওরা একপাশে বসে আছে দল বেঁধে—চায়ের দোকানে আড্ডা জমাচ্ছে। রেণুপদ নীরবে এককোণে বসে কি ভাবছে। হঠাৎ কানে আসে কথাগুলো।

নিতাই বাবাজী বলে চলেছে—কাজল গাঁয়ের সব্বাই সমান বাবা, ফুতেহাড়ির জায়গা ; ভদ্দর লোক কোন শা—

হরিপদ বলে ওঠে—তা যা বলেছিস্, দেখনা ছোকরা ডাক্তারের কাণ্ড। বেশ পটিয়ে নিয়েছে মাইরী।

কে যেন বলে ওঠে—শুধু কি তাই, সেদিন দেখি সদরে রাসলীলা চলেছে সিনেমা হলের ভিতরে।

নিতাই বাবাজী বলে ওঠে—আদি রসের ফোয়ারা ছুটছে। দেখবি শ্যাষকালে ফাঁসিয়ে দিয়ে সরে পড়বে নির্ঘাৎ। মেয়েটা রাস্তা দিয়ে যায় দেখেছিস যেন অনবরতই খাই খাই করছে। ঠাকুর মশায়ের মেয়ে কিনা শেষকালে এ্যাট হোল—

হরিপদ মিস্ত্রী বলে—লেখাপড়া জানা বউশ্যে।

হঠাৎ কোনদিকে কি হয়ে গেল জানে না, একটা গরম চা ভর্তি গেলাস সজোরে এসে পড়েছে হরিপদের মাথায়, অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে সে। রেণুপদ বসেছিল এককোণে সে আর স্থির থাকতে পারেনি ওই কথাগুলো শুনে। লাফ দিয়ে উঠে এগিয়ে আসে এই দিকে হাতের গেলাসটা ছুঁড়ে দিয়ে, রাগে ফুলছে। বেইমানের দল সব কেড়ে নিয়েছে ওদের, অর্থ সম্পদ সব। বাকী আছে ওই সম্মানটুকু তাও রাখবে না। শয়তানের দলকে সে শায়েস্তা করবে।

লাফ দিয়ে এসে সিংহবিক্রমে হরিপদোর শীর্ণ কণ্ঠদেশ টিপে ধরে,

- শেষ করে দোব তোকে। যতবড় মুখ নয়—ততবড় কথা।

…অতর্কিতে ব্যাপারটা ঘটে, কেউ যেন ঠিক করতে পারে না, এদের দল ছাড়াবার চেষ্টা করে, বজ্রমুষ্টিতে রেণুপদ সিংহবিক্রমে টিপে ধরেছে, হরিপদের চোখ মুখ কপালে উঠেছে। অস্ফুট আর্তনাদ করছে সে। কে যেন একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি মেরে বসতেই রেণুপদের বজ্রমুষ্টি আলগা হয়ে যায়, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল থেকে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত। ওদের তরফ থেকে পড়ছে কিলচড় ঘুঁষি। শ্যামার দোকানে যেন তাণ্ডব বয়ে চলেছে। ছিটকে পড়ে কাপ—ডিস—গেলাস। চেয়ার বেঞ্চি উলটে পড়েছে। মটর অপিস থেকে ছুটে আসে লোকজন। রেণুপদ তখনও গজরাচ্ছে, চোখমুখ টকটকে জবাফুলের মত রাংগা হয়ে গেছে; রাগে দুঃখে অপমানে বেদনায় কেঁদে ফেলে সে ঝর ঝর করে। পুরোনো ড্রাইভার তারিণী ছুটে আসে,

—রেণুদা !···জড়িয়ে ধরেছে আহত বৃদ্ধকে। তারিণীর চীৎকারে জমায়েত হয় লোকজন।—ধর ওদিকে। বড্ড বাড় বেড়েছে ব্যাটাদের। দল বেঁধে সহরে গুণ্ডামী করতে সুরু করেছে। কাউকে ছাড়বি না।

ড্রাইভার ক্লিনারের দল একটা করণীয় কাজ পেয়ে যায়, কেউ জ্যাক, কেউ বা হ্যাণ্ডেল, কে একটা পুরোনো এক্সেল তুলে নিয়ে ছুটে আসে। বাধা দেয় রেণুপদ, পুরোনো দিনের হারানো মানুষ যেন চকিতের জন্য জেগে ওঠে,

—যা তোরা যা। কোম্পানীর ইজ্জৎ আগে। তোরা দাঙ্গা করতে আসবি কেন ?

হিঃ হিঃ হিঃ হেসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পাগলী গঙ্গামণি—ওমা, এ মিনসে আবার কোন নাগর রে ; মরি মরি কি সং সেজেছো মাইরী !

আহত রেণুপদোর কাছে এসে দাঁড়াল গাছ-গাছালির আড়াল থেকে। কপালে একরাশ মেটে সিন্দুর লেপটে, বগলে এটা সেটা কুড়িয়ে বিরাট এক পুঁটুলি। সেইটাই আঁকড়ে ধরে ঘুরে বেড়ায় মটর অপিসের কাছাকাছি সেই বিটলে বামুনের খোঁজে। দিনরাত আপন মনেই বিড়বিড় করে। পায়ের ঘা হাঁটু অবধি উঠেছে ; অবাক হয়ে চেয়ে থাকে রেণুপদ।

—কার ঘরে ঢুকছিলে নাগর, আহা !

কথা বলে না রেণুপদ। দুজনেরই যেন একই অবস্থা। গঙ্গামণি সব হারিয়ে পথে পথে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রেণুপদোর সব গেছে, পাগল হতে বাকী।

···বাঁ হাতের জামাটা দিয়ে ঠোঁটের নোনতা রক্ত মুছে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সে। গঙ্গামণি একটু চুপ করে থেকে চীৎকার করতে থাকে—কইরে মড়ুই-পোড়া বিটলে বামুন। ভালবাসার নোক ! ওয়াক থু—থু।

চীৎকার করছে পাগলী। বিষে বিষে সর্ব্বাঙ্গ ওর জ্বরে গেছে—ফুটে বের হয়েছে সেই তীব্র বিষ। আর্তনাদ করছে কাজল গাঁয়ের অন্তরাত্মা। মটুরাণীর পাড়ায় যাবার সাহস তার নেই। বিশুয়া গুণ্ডাকে সেই ভাত দিয়ে রেখেছিল, সেই বিশুয়া আজ মটুরাণীর পার্শ্বচর। ওকে চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে—রাস্তায় লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দিয়েছিল।

—একটা পয়সা দাও না গো। ও বাবু।

গংগামণি ভিখেরীর মত হাত বাড়িয়ে দেয় তার দিকে। নবাগত ভদ্রলোক বেশী দিন কাজল গাঁয়ে আসে নি ; ওর পরিচয় জানে না ! মুখ ফিরিয়ে চলে গেল হন্ হন্ করে।

খিদের জ্বালায়—বিষের জ্বালায় ঘেঁংড়ে কাঁদছে—কাজল গাঁয়ের নরকের ক্রিমিকীট। খোলস ছেড়ে মূর্তিমান অভিশাপ সহরের পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

রেণুপদোর মনে আগুন জ্বলছে।···বাইরে যত না আঘাত লেগেছে—মনে সে ব্যথা তার চেয়ে দ্বিগুণতর হয়ে বেজেছে। বার বার রমণবাবুর কথা মনে পড়ে —অসহায় ও একান্ত অসহায় সে।

—মাঠান !···

সরমা রান্না করছিল, ও পাশে খড়ের রান্নাচালা চাউনি অভাবে ভেংগে পড়েছে, ন্যাড়া দেওয়াল কোন দিন ধ্বসে পড়বে ; বারান্দার এক কোণে উনুন পেতে তাতেই মাটির হাঁড়িতে সিদ্ধ পক্ক চাপিয়েছে। জনহীন বাড়ীর উঠোনে জন্মেছে জামালকোটা —কুকসিমে গাছ। একফালি সরু পায়ে চলা পথ জেগে আছে মাত্র ; মাটির সবুজ আস্তরণ আর বাড়ীটার চুনকাম অভাবেও পড়েছে তেমনি ঘনসবুজ স্পর্শ। সরমা ওকে দেখেই আঁতকে ওঠে।

রেণুপদোর জামাটা ফালা ফালা করে ছেঁড়া ; পিছনের দিকে ঝুলছে, কাঁচা পাকা গোঁফ দাড়িতে লেগে আছে রক্তের ছাপ, ধূলিধূসর মূর্তি, এ যেন অন্য কোন এক মানুষ।

—কি হয়েছে রেণু ?

—কিছু না মা,···দিদিমণি কোথায় ?

মঞ্জু বের হয়ে এসে ওকে দেখে অবাক হয়ে যায়।

—রেণুদা ! ওসব কি হয়েছে ? কোথায় মারামারি করে এসেছো ?

—পারলাম না দিদি, ওই শয়তানদের টুঁটি ছিঁড়ে দিতে পারলাম না, তোমার নামে হাটে বাজারে যা-তা বলে বেড়াবে ? ওই মটর অপিসে বসে বলবে ওই কথা— এতবড় বুকের পাটা ! এই ফণী চক্কোত্তীও আছে দলে।

—কি হয়েছে ? কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না। তবে অনুমান করে নেয় খানিকটা,···ও নিয়ে আর কেলেংকারী বাড়িয়োনা রেণুদা; ওতে আমাদের অপমান

বাড়বে বই কমবে না। সবইতো করেছে ওরা, বাকী আছে ওটুকু। মঞ্জুর কণ্ঠস্বর ভিজে হয়ে আসে—আর ক'দিনই বা আছি!

মনে মনে পথ ঠিক করে ফেলেছে সে, যেখানে হোক চাকরী নিয়ে চলে যাবে পাশ করলেই। কাজল গাঁয়ের মায়া কাটাবে সে।

রেণু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মঞ্জু বলে চলেছে;

—কোন প্রতিবাদ করো না রেণুদা। সব সয়েছি, এ-টুকুও পারবো।

সরমা কথাগুলো শুনেছে, রেণু চলে যাবার পরই ঘরে এসে ঢোকে—কি বলে গেল রে?

মঞ্জু স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। মায়ের কথাতে জবাব দিল—কিছু না।

মা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না, মঞ্জুর কাছে এগিয়ে এসে ওর সর্বাঙ্গে সস্নেহে হাত বুলোতে থাকে—মহাগুরু নিপাত হয়েছে আমাদের, ও সব অনেক কিছুই সহ্য করতে হবে মা; বুক বাঁধ!

মঞ্জু মায়ের দিকে চেয়ে থাকে; মাকে এতদিন সে চেনেনি; আজ যেন প্রথম ওর মাতৃ অন্তরের স্পর্শ পেল; সমবেদনা, সান্ত্বনাভরা একটি মন। চোখ ঠেলে কান্না বের হয়ে আসে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মঞ্জু মায়ের বুকে, মা কোন কথা বলে না। নীরবে ওর মাথায় হাত বোলাতে থাকে। দুটি নিভৃত অন্তরের বোঝা বুঝিতে গড়ে ওঠে দুর্দম শক্তিভরা মন। মঞ্জু পরম সান্ত্বনা পায়, আর যে যাই বলে বলুক—মা তাকে ভুল বোঝেনি।

অনিমেষ অবাক হয়ে যায় মানুষের নীচতায়। অক্লান্তভাবে সে সেবা করে এসেছে সহরের। কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ, যারা তার কাছে সুযোগ সুবিধা নিয়েছে সব থেকে বেশী তারাই অগ্রাহ্য করেছে, অপবাদ দিয়েছে তাকে। মনীষা এর মূলে নইলে কবে ঝড়ের রাতে কি করে এসে পড়েছিল মঞ্জু তার বাড়ীতে এ খবরই বা ওরা জানলো কি করে। শচীন·মাধববাবুকেই তার প্রয়োজন বেশী। চাকরী করতে গিয়ে এত নীচে নামবে সে কল্পনা করতে পারেনি। নিজের কাছেই আসে অপরিসীম লজ্জা; মঞ্জুদের বর্তমান ব্যবস্থা সে ভালো ভাবেই জানে। এই সময় এই হীন অপবাদ তাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে মনীষা!

সহরের লোক তবু তাকে ডাকতে বাধ্য হয়—নেহাত প্রয়োজনের জনাই। নইলে হয়তো ডাক্‌তো না। হাটীমশায় শেষ পর্যন্ত তাকে ডেকেছেন, নোতুন ডাক্তারের কথা কওয়া ওষুধ রোগিণীর কথা প্রায় বন্ধ করে এনেছিল। হাটীমশায় হন্ত দন্ত হয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন নিজে। ঘেমে নেয়ে উঠেছেন।

—ডাক্তারবাবু একবার যেতে হবে। কবে কি বলেছি ভুলে যান। আমি ওসব দলাদলির মধ্যে নেই, সাতে পাঁচে থাকি না মশাই। আমার সবাইকে দরকার।

—কি হ'ল?···অনিমেষ প্রশ্ন করে।

—বৌমার অবস্থা খুব খারাপ। পাঁচজনের পাঁচ কথায় আমার চের শিক্ষা হয়েছে, নাক কান মলেছি। চলুন একবারটি।

সেদিনের কথাটা মনে পড়ে, কি বলতে গিয়েও পারলো না অনিমেষ। ডাক্তার সে, তার কর্তব্য আগে। তবু বলে ওঠে,

—আবার এ নিয়ে বিপদে পড়বেন না তো?

বুক ফুলিয়ে বলে হাটীমশায়—সহরের সবাইকে জানি মশাই। লোকাট আপনার আর লজ্জা দেবেন না আমাকে।

অনিমেষ না গিয়ে পারেনি।···

ফটিক এখন সহরের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ক'দিনেই সামান্য পরিচয় স্কুলকে কেন্দ্র করে নিবিড় হয়ে উঠেছে।

মনীষা ফটিকের অনুরোধেই বেড়াতে বের হয়েছে সেদিন ওর গাড়ীতে। সাঁইথিয়া রোড ধরে চলে গেছে অনেক দূরে—নির্জন প্রান্তরে সন্ধ্যা নামছে! ফটিকের মুখে খই ফুটে চলেছে—বুঝলেন, দিলাম ফর্ম জমা দিয়ে, স্ক্রুটিনিতে বের হয়ে যাবো নিশ্চয়। কংগ্রেস টিকিট পেয়েছি এইবার রিটার্ন ঠিকই হবো। দেখবেন কাজল গাঁয়ের হাল বদলে দোব, হাসপাতাল—ওই হাসপাতালকে ঢেলে সাজাবো। আর স্কুল বিল্ডিং তোলা হবে। মেয়েদের কলেজেরও স্কিম আছে নোতুন করে বাড়াবো।

মনীষা ওর দিকে চেয়ে আছে; ম্লান অন্ধকারে জেগে উঠেছে দু'একটা তারা; দূর থেকে ভেসে আসছে হিমেল হাওয়া। ফটিক কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে; ওর দু'চোখের সামনে জেগে ওঠে অতীতের কত সন্ধ্যা; পাশে এমনি বসে থাকতো

একজন—সে যমুনা। ডাগর কালো দুটো ইসারাময় চোখ, মনের মাঝে কতদিন ঝড় তুলেছে ; অলক্ষ্যে বারবার তাকে ছুঁয়ে গেছে শত কাজের ফাঁকে, আজ সে যেন মূর্তি ধরে নেমে এসেছে।

মনীষা ওর চোখের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে, ও যেন ঝড়ের পূর্বাভাসের স্তব্ধতায় নেয়ে উঠেছে।···পুরুষের এ প্রকৃতি সে চেনে। কাজপাগল—অর্থ-সন্ধানী মনও মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়, পৃথিবীর আকর্ষণে ধরা দিতে চায় ওরা : মনীষা রূপবতী সেই ধরিত্রীমায়া !

—বাড়ী যেতে হবে না ?

ফটিকের চমক ভাঙলো—হাঁ। উঠুন।

ভীরু সে ; ফটিক চিরকালই ভীরু। আজ একথা বার বার মনে হয় ফটিকের, এই ভীরুতার জন্যই সে যমুনাকে হারিয়েছে। বাঁধনে বাঁধতে চায় না—ধরাও দিতে চায় না নিজে। এ তার মন জোড়া দুর্বলতা। কঠিনভাবে সে দমন করতে চায় এই ভীরুতাকে।

—শুনুন।·· গরীয়া হয়ে উঠেছে ফটিক, মুখচোরা লাজুক যুবক। অন্ধকারে বুঝতে পারে মনীষাও ঘামছে ; ঘেমে নেয়ে উঠেছে। একটু কাছে এসেই দাঁড়াল মনীষা ওর—বলুন। ইচ্ছা করেই দু চোখ মেলে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

ফটিক বলে ওঠে—মানে,···আমি—আমি আপনাকে ভালবাসি। খুব ভালবাসি।

হাসি চাপবার চেষ্টা করে মনীষা—বেশ ত !

কি যেন প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে—সৃষ্টি ওলোট-পালট হয়ে যাবে, কথা বলার পরই-- ভেবেছিল ফটিক। কিন্তু কিছুই হ'ল না। সেই রাতের তারা জেগে আছে—তেমনি বইছে বাতাস। মনীষাও শান্ত ভাবে বলে,

—বেশ শুনে খুসী হলাম। চলুন ফেরা যাক্।

—হ্যাঁ···ফটিক যেন অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে মনের ভারমুক্ত করে, খুসীর আমেজ দেখা দেয় তার মনে। মনীষা ওর দিকে চেয়ে থাকে, কিই বা বয়েস ; জীবনে অর্থ প্রতিপত্তিই পেয়েছে, কোন দিন কারও ভালবাসাও পায় নি। সে স্বাদ থেকে জীবনে বঞ্চিত হয়েছে ও। তাই মনে মনে এত উতরোল—কোলাহল।

অর্থের জন্য যারাই ওর কাছে এসেছে—তারাই ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে অর্থ। নিজেরা কিছুমাত্র দিয়ে যায় নি ওকে।

শচীন দোকান থেকে বের হয়ে চলেছে সহরের দিকে একটা সাইকেল রিক্সায় করে ; হঠাৎ পাশ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল ফটিকের গাড়ীটা ; একটু অবাক হয় শচীন, ফটিক গাড়ী চালাচ্ছে পাশে বসে রয়েছে মনীষা। ওর খোঁপায় জড়ানো একগাদা বেলফুলের মালা, ফটিক হাসছে তার দিকে চেয়ে।

কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল ঘটে গেছে ! শচীনের সারামন অসহ্য জ্বালায় ভরে ওঠে। নিজের দিকে চেয়েই যেন ক্ষেপে ওঠে ; ও মিল চালায় ; জমিদার-নন্দন। গাড়ীও আছে ঝকঝকে। তার তুলনায় সে সামান্য দোকানদার—সিনেমাহাউসের মালিক। ভাড়াটে রিক্সা তার সম্মানের মাপকাঠি। মনীষা তাকে ফেলে ফটিকের দিকে ঝুঁকবে তা আর অস্বাভাবিক কি। মনের মধ্যে কি যেন মোচড় দিচ্ছে। জেগে উঠছে ঘুমন্ত শয়তান—সরীসৃপের মত পাকে পাকে ওকে জড়িয়ে ধরছে। শচীন ব্যাপারটা এত সহজে মন হতে দূর করতে পারে না।

মনীষা রাস্তায় নেমে গেল। ফটিক আশা করেছিল তাকেও আমন্ত্রণ জানাবে বাড়ীতে। কিন্তু হতাশ হোল।

—চলি আজ।

ফটিক চেয়ে থাকে ওর দিকে। মনীষা আমন্ত্রণ জানায়—কাল আসছেন তো মিটিংএ ?

—হ্যাঁ, ঘাড় নাড়ে ফটিক।

মনীষা হালকা মনে শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে ছোট্টখুঁকিটির মত লাফ দিয়ে সিঁড়ি ভেংগে বাড়ীতে ঢুকেই অবাক হয়ে যায় ; আবছা অন্ধকারে কে যেন বসে আছে, সিগারেটের লাল আভা ছিটকে পড়েছে তার কপালের এক পাশে। পায়ের শব্দ পেয়ে আগন্তুক উঠে দাড়াঁলো।

—তুমি ! মনীষা অবাক হয়ে যায়।

—হ্যাঁ !

—অনিমেষ এগিয়ে আসে তার দিকে, মুখে চোখে ওর শীতল কাঠিন্য, ভয় পেয়েছে মনীষা। মনে মনে তখনও ফটিকের সেই ভাব গদগদ কথাগুলো ভেসে

আসে। নারীজীবনের চিরন্তন কামনা—সে হতে চায় পুরুষের জীবনে শেষ নারী; ফটিককে কোথায় যেন ভাল লেগে গেছে। শচীনের মত চতুর ধূর্ত নয়। ভালবাসাটা তার অভিনয়, কাজ হাসিল করবার ফন্দী নয়। মনের সহজ সরল প্রবৃত্তির মতই সহজাত-কলুষমুক্ত। তার তুলনায় শচীন হিসেবী; তার সংগে চলতে গেলে সর্বত্রই—সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতে হয়, দুর্বল মুহূর্তে সে কোণঠাসা করে ফেলবে। তাকে খেলানো যায় না—সে সদাজাগ্রত, তার তুলনায় ফটিক অনেক তরুণ অনেক ভাববিলাসী।

অনিমেষের সামনে পড়তেই মনের সেই সুন্দর সুরের রেশটুকু আজ স্বর্ণ-গোধূলির স্মৃতি যেন রক্তাক্ত বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

—এসব তোমার কাছে আশা করি নি? অনিমেষ বলে ওঠে গভীর কণ্ঠে।

মনীষার মনের কোণে কি যেন অজানা সম্পদ আজ ধরা দিয়েছে। আজ সে কাংগাল নয়। বলে ওঠে,

—কি বলছো তুমি? বুঝতে পেরেছে মনীষা অনিমেষ কি বলতে চায়, তবুও না জানার ভান করে।

অনিমেষ বলে ওঠে—মেয়ে হয়ে অন্য মেয়ের নামে যা তা কলংক রটাতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা তোমার করেনি?

মনীষা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দেয়,—তার জন্য দায়ী কি আমিই? সহরের আর কেউই কি দেখেনি তোমার সংগে মঞ্জুকে? তুমি কি সদরে যাওনি? গাড়ীতে ফিরেছো ওকে নিয়ে। ঝড়ের রাত্রে ও কি তোমার ওখানে যায় নি? এ সব মিথ্যা কথা?

মনীষার কণ্ঠে জ্বালা ফুটে ওঠে, সে যেন খুব খুসীই হয়েছে এই ব্যাপারে।

—সত্য মিথ্যার কথা নয়, বিকৃত করে রটনা করার কথা বলছি আমি?

মনীষা জবাব দেয়—তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে আমায়? আজও তাদের সংগে তোমার নিবিড় যোগাযোগ, সহরের লোক কেউ অন্ধ নয়—তারা দেখেছে, বলেছে।

বলে ওঠে অনিমেষ—তারা অনেক কিছুই দেখছে। একজন শিক্ষয়িত্রী সহরের সমাজে এসে যা সুরু করেছে—তার তুলনা নেই। তুমি যে এত নীচে নামবে কল্পনাও করিনি।

চমকে ওঠে মনীষা, পরক্ষণেই হাসিতে ফেটে পড়ে—তাই নাকি ?

রাতের বাতাসে ভেসে আসে সিনেমা হাউসের একক সুরধ্বনি। অনিমেষ বলে চলেছে—প্রথম যেদিন তোমাকে সদর সহরে দেখি—ভালই লেগেছিল। ভাল-বেসেছিলামও ; তারপর হারিয়ে গেলে তুমি। কিন্তু হঠাৎ যেদিন ফিরে পেলাম তোমাকে—খুসী হয়েছিলাম। মনে মনে অনেক আশাই করেছিলাম—কিন্তু !

হেসে ফেলে মনীষা,···হাসিতে ফেটে পড়ে খান খান হয়ে। অনিমেষ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। হাসছে নারী—জয়ের হাসি। করুণা অবজ্ঞা পুঞ্জীভূত হয়ে ঝরে পড়ে, নিজেরই খারাপ লাগে তার।

হাসি থামিয়ে বলে ওঠে সে—জানতাম না, আগে সংবাদটা পেলে ধন্য হতাম ডাক্তারবাবু।

অনিমেষ যে রাগ দ্বেষ নিয়ে এসেছিল ওর মনের অবস্থা দেখে নিজেরই করুণা হয় ; ভালবাসা আজ হয়তো তার কাছে সহজলভ্য পণ্য হয়ে উঠেছে—না হয় প্রকৃতিস্থ নয় সে।

—চলে যাচ্ছো যে ? এত কথার পর এক কাপ চাও খেয়ে যাবে না ?

—না।

হঠাৎ বলে ওঠে মনীষা হাসতে হাসতে—মঞ্জু বড়ো ভালো মেয়ে বুঝলে, বি.এ. পাশও করেছে।

অনিমেষ কথা বলে না ; মনীষাই বলে চলেছে—গায়ে কথাটা খুব লাগলো না ?

—লাগবেই তো। মনের টান যে সেখানে।

—মনীষা ! অনিমেষ ওকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করে। মনীষা হাসছে, কুটি কুটি হয়ে ভেঙে পড়ে হাসিতে।

অনুভব করতে পারে—মনীষা আজ কোথায় আমূল বদলে গেছে। স্কুলের কাজকর্ম কোন রকমে হাজিরা দিয়েই সারে—বাকী সময় কমিটির সভ্য এবং সহরের প্রভুদের দরবারে ঘুরে ফিরেই চাকরী বজায় রেখেছে। শিক্ষয়িত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণাও ওর নেই।

—এত যদি দরদ জেগে থাকে ওর সম্বন্ধে, মঞ্জুর সম্মান—তোমার সম্মান ; তবে বিয়েই করে বসবে নাকি শিভ্যালরি দেখাতে ?

—চুপ করে রইলে যে ? সাহস নেই—না ? কাওয়ার্ড—চিরকালের কাওয়ার্ড।
কথার জবাব দিল না অনিমেষ নীরবে বের হয়ে এলো ঘর থেকে, পিছনে তখনও মনীষার হাসির তীক্ষ্ণ শব্দটা যেন তীরের মত তাকে বিঁধতে আসছে। দ্রুতপদে এসে গাড়ীতে উঠলো।

আজ মনে পড়ে কোথায় যেন একটা নিবিড় আত্মিকতা গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে। অতীতের সব ঘটনাগুলো ভিড় করে আসে মনে।

আলো ছায়া—দিনে রাত্রে—সুখে দুঃখের মধ্যে নিবিড়ভাবে দেখেছে চিনেছে মঞ্জুকে। অজ্ঞাতেই সারা মনে ও আসন পেতেছে। আজ অকস্মাৎ মনীষা সেই পরম সত্য আবিষ্কার করে—নিষ্ঠুর মরীয়া হয়ে উঠেছে। অনিমেষ আজ জীবনের সব কাজের মধ্যে নিহিত মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছে।

বি. এ. পাশের সংবাদটা যেন তাকে খুব খুসী করতে পারে না ; মা একটা সিকি ঠাকুরের পায়ে ছুইয়ে তুলে রাখে।

—হরির লুট দোব মা !

মঞ্জুর চেতনা যেন স্তব্ধ হয়ে আসে ; সহরে গুঞ্জরন আরও বেড়েছে ওর বি. এ. পাশ করা নিয়ে ; অনেকেই এটা ভাল চোখে দেখে না ; আগেকার সঞ্চিত উষ্মা আজ গরল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ওদের জিবের ডগায়।

মণিকে আসতে দেখে একটু অবাক হয়ে যায় ; বেশ কিছুদিন পর আসছে সে। চেহারায় এসেছে শীর্ণ বিবর্ণ ভাব। শরীরে একটা ক্লান্তির চিহ্ন প্রকট হয়ে রয়েছে। গম্ভীর ভাবে বসলো মণি। ওর মুখচোখ দেখে কিছু অনুমান করতে পারে মঞ্জু। বলে ওঠে,

—সহরে আমার এত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল বুঝতে পারিনি।

মুখ তুলে চাইল মণি—মানে ?

—হিতোপদেশ, চরিত্র—নারীর কর্তব্য এই নিয়ে লেকচার দেবে তো ! ওসব আমার ঢের শোনা হয়ে গেছে। জ্বর গায়ে এই উপদেশ দিতে না এলেও চলতো।

মঞ্জুর কথায় মণি অবাক হয়ে যায় ; আজ মঞ্জু যেন ওই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাহলে ওসব অপবাদের কিছুটা সত্যি ! মনে মনে আসে পুঞ্জীভূত

দুঃখ, বেদনা। অভাব—দারিদ্র্যই বোধ হয় তার জীবনাদর্শে কোথায় আমূল পরিবর্তন এনেছে।

বেদনাহত কণ্ঠে মণি বলে ওঠে—তোমার উপর বিশ্বাস ছিল আমার ; কোনদিনই মাথা নীচু করবে না অন্যায়ের সামনে, সেই ধারণা আমার বদলে গেছে। আজ আদর্শ হারিয়ে বসেছো মঞ্জু। চারদিকে নানা কথা কানে আসে—

শত দুঃখেও হাসি আসে মঞ্জুর—আদর্শ পথ এসব কথার দাম মানুষের মনে, বাস্তব জগতে এর দাম কি? আদর্শের কথাই বলছো—তার জন্য যারা বিশ্বাস করে—তারা অবশ্য তার কানাকড়িও মূল্য দেয় না।

—অর্থাৎ? মণি প্রশ্ন করে।

বলে ওঠে মঞ্জু—আমার আদর্শের জন্য তুমি কিছুমাত্রও ত্যাগ করতে পারো কি?

মণি এ ইঙ্গিতটা বোঝে ; তার দুর্বলতার কথা বেশ জানে মঞ্জু ; এই নিয়ে সে আঘাত দিয়ে কথাও বলে, কিন্তু চেষ্টা করেও পারেনি মণি, বাবার সব অনাচার, অত্যাচার—অন্যায় মেনে নিয়েছে পরোক্ষভাবে। দূর সন্ধ্যাকাশের তারার উজ্জ্বল চাহনির দিকে চেয়ে চেয়ে পথ চলা যায় না, ওই অসীম জ্যোতিষ্কের আলো থেকে—কাঁচবন্দী কেরোসিন কুপিই তাহাদের বেশী প্রয়োজন—প্রাত্যহিক জীবনের পথ চলায়।

তাই মণির ও কথার কোন দামই দিতে পারে না মঞ্জু।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে—স্তব্ধ পল্লী অঞ্চলের পথে পথে। আকাশকোলে দেখা দিয়েছে আষাঢ়ের নবমেঘ ; আবছা অন্ধকারে তারাগুলো ডুবে গেছে অতলে।

—বৃষ্টি নামবে, শরীর খারাপ নিয়ে জলে ভিজো না।

মণি ওর কথার মর্মার্থ বুঝতে পারছে, আজ মঞ্জু নীরবে তার জীবন হতে সরে যাবার চেষ্টাই করছে ; ওই দুটি কথায় ফুটে বের হয় ওর বিরাগী মনের না বলা কথা, ওকে যেন সহ্য করতে পারছে না মঞ্জু। উঠে ধীরে ধীরে বের হয়ে এল পথে মণি। আজ অনুভব করে সব হারিয়েছে সে। জীবনের কর্মক্লান্ত পথের দুপাশে তার জন্য কোথাও নেই ছায়াশীতল একটুও আশ্রয়—জীবন আজ ঊষর ; রিক্ত। মঞ্জুও থেমে গেছে—ভুলে গেছে তাকে। বিস্মৃত হয়েছে অতীতের শান্তমধুর দিনগুলো। ক্লান্ত শরীরে জ্বরটা যেন চেপে ধরেছে।

ক্ষেত্র তৈয়ার করেছে শচীন ; অনিমেষের ওই সব কথাগুলো বেনামীতে কে পেঁছে দিয়েছে হাকিম—মুন্সেফদের কানে। জল ঘোলা হয়ে উঠেছে, রুই কাতলা খাবি খাচ্ছে এ হেন উপযুক্ত সময়ে মাধববাবু অবতীর্ণ হলেন জাল হাতে। কয়েকদিন আগে হাসপাতাল কমিটির সভাপতি হবার চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু অনিমেষই তাকে বাধা দিয়েছিল। হাসপাতালে বিশেষ কোন পাত্তাই পায়নি এরা। সেই আক্রোশটা মিটিয়ে নেবার জন্যই সেদিন প্রথম বাণী দিলেন প্রকাশ্য সভায়—সত্য হোক মিথ্যা হোক এর একটা তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন। নইলে হাসপাতাল চালানোর কাজে অত্যন্ত বাধার দৃষ্টি হচ্ছে।

হাকিমও মত দেন। কি ভাবে তদন্ত হবে তারই জল্পনা-কল্পনা হতে থাকে। সংবাদটা জগবন্ধুই এনে দেয় অনিমেষের কানে।

—যা তা সুরু করেছে ওরা, সেদিন হাসপাতাল থেকে ফিরে যাবার পর এই সব কাণ্ড ঘটছে।

—হুঁ! কি যেন ভাবছে অনিমেষ : জগবন্ধুর কথার জবাব দিল না।

পুরানো বাড়ীর কার্নিসে ডাকছে ঘুঘু—ক্লান্ত উদাস সুরে। কোন সুদূরে পাড়ি জমায় বিবাগী মন। কাজল গাঁয়ের জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে তার কাছে—ওর সমস্ত কিছু চিত্ত বৃত্তি দুভাগ হয়ে ছিটকে পড়েছে। একদিকে গেছে যত অমানুষ—শয়তানের দল ; অন্যদিকে প্রেম—প্রীতি···সে ওই অন্যমনা কোন নারীকে কেন্দ্র করে। নিজের মনের এই ভাবান্তরে আজ নিজেই বিস্মিত হয় অনিমেষ। অনুভব করেনি কোন অজ্ঞাতে ভাল সে বেসেছিল, আজ হঠাৎ সেই কঠিন সত্যের মুখোমুখি হয়ে চমকে উঠেছে সে। একদিকে নিবিড় বেদনা অন্যদিকে মধুর একটি সুর তার মনকে পাওয়া না পাওয়ার আবর্তে এনে হাজির করেছে। মঞ্জুকে নোতুন দৃষ্টিতে দেখছে সে।

মনীষা যেন নেশার ঘোরে এগিয়ে চলেছে। এ এক উদ্দাম নেশায় মাতানো জীবন। প্রতিপত্তি-প্রভুত্ব-অর্থ সবই পেয়েছে। কলেজ করবার আয়োজন করছেন মাধববাবু ; ফটিক স্বর্গগত বাবার নামে কিছু মোটা টাকা দোব দোব করছে।

কাজল গাঁয়ের ইতিহাসে ইতিমধ্যে আর একটি নূতন পর্ব সুরু হয়েছে। ওর আকাশে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘনিয়ে আসছে ; সেই সংগে কাপড়ের কণ্ট্রোল। অতর্কিতে কতকগুলো কালো যমদূত যেন শীর্ণ হাত মেলে আকাশজোড়া হাই তুলে গ্রাস করতে আসছে, সারা কাজল গাঁকে। দুঃশাসনের দল উঠে পড়ে লেগেছে দেশজোড়া দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পর্ব সুরু করতে।…রাতারাতি ফটিক কি করে মহকুমার ক্লথ সাপ্লাইয়ার হয়ে উঠলো।

ফটিকবাবু এর জন্য অবশ্য মাধববাবু আর মনীষার কাছে ঋণী।

শচীন গুমরে ওঠে ; বেশ অনুভব করতে পেরেছে তার আর্থিক অক্ষমতা ; যতই হোক না কেন তার সিনেমা হল আর 'চা-ঘরের' আমদানী রপ্তানী ফটিকের তুলনায় নগণ্য। স্বয়ং মহকুমা হাকিম দাশ সাহেব ফটিকের হাত ধরা ; সন্ধ্যার অন্ধকারে বহুবারই বিচিত্র বস্তু সব তাঁর বাংলোয় ভেট পাঠাতে দেখা গেছে ফটিককে। মনীষা হাসতে হাসতে বলে,

—আপনি একটি জিনিয়াস।

ফটিক মুখ নীচু করে না আর, সোজাসুজি মুখ তুলেই জবাব দেয়—আর আপনি ?

মাধববাবু ওদের জীবননাট্যের নীরব দর্শক মাত্র ; অন্তরালে মনীষাকে টিপে দেন—একটু মোটামুটি কিছু বের করবার চেষ্টা করো ; ও যে ধান চাল—কাপড়ে লাল হয়ে গেল। তুমি একটু বললেই হবে—বুঝলে ?

মাধববাবু কি যেন ইংগিতে বোঝাবার চেষ্টা করেন মনীষাকে। মনীষাও বোঝে ওই ইংগিতের অর্থ।

ফটিক চরকির মত ঘুরপাক দিচ্ছে সারাদিন ; বীরভূম-মুর্শিদাবাদের প্রান্তসীমা ; কোনদিনই ধানের অভাব এখানে হয় না,…হঠাৎ কি এক দুর্বার টানে অদৃশ্য পথে সেই ধান সব অন্তর্হিত হয়ে গেলো। নামালের গাড়োয়ানরা যে এর জন্য দায়ী সেই কথাটাই প্রকাশ হয়ে পড়ে ; ওরা দু'দশখানা গরুর গাড়ীতে আট দশ মণ করে ধান নিয়ে যায়, চিরকালই নিয়ে যাচ্ছে পুরুষানুক্রমে ; এতদিন তারা ওই সমুদ্রের কণামাত্র নিয়ে যেতে পারে নি, আজ যেন এই হাহা-কারের মূলে তারাই ; কয়েকখানা গাড়ী রাস্তায় লুট হয়ে গেলো, মারধোর করা

হোল দু'চারজন গাড়োয়ানকে।...আসলে ধরা পড়ে নিগৃহীত হোল চুনোপুঁটির দল, রুই কাতলা গভীরেই রয়ে গেল। পুরানো বাড়ীর ভিতর কয়েকটা নোতুন গুদাম গড়ে উঠলো ফটিকের।

শচীনের কুটিল মন পাক খাচ্ছে নীরব হিংসায়—মৃত্যুনীল বিষ ওর শাণিত জিহ্বায়; কিন্তু প্রকাশ পথ পায় না। কোন দিকে যেন তলিয়ে যাচ্ছে সব কিছু। তার কাছ হতে মনীষাও সরে যাচ্ছে দূরে।

আজকাল কলেজ তৈরীর জন্য ফটিকই ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফটিককে সেদিন মনীষা ধরে বসেছে; সোজাসুজি কোন কথা টাকার সম্বন্ধে বলে না। মনীষাকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখে ফটিক বলে ওঠে,

—কি ভাবছেন?

মনীষা জবাব দেয়—কি আর ভাববো, কলেজের ভিত খুঁড়েছি, এখন ভাবছি ওতে কলেজ বাড়ী না হয়ে—আমার কবরই হবে বোধ হয়।

ফটিকের মেজাজটা সেদিন ভালোই আছে। বর্তমানে হুহু শব্দে কেবল টাকা আনছে। ঝড় উঠেছে ঈশান কোণে, যুদ্ধের কালো ঝড়। ঝরাপাতা এতে ওড়ে না—উড়ছে নোট! কেবল নোট। যে যা ধরে ফেলতে পারে।...দশ টাকা মণ ধান আজ পঁচিশ টাকায় উঠেছে; কাপড় না বিচলেই টাকা। দিনের আলোয় নয় অন্ধকারে বিক্রী করতে হবে।

দিনরাত মিল চালিয়েও কাজ তুলতে পারছে না,...দুটো মিল বসালে ভালো হতো। এহেন কর্মক্লান্ত ফটিকবাবুও কিছুক্ষণের জন্য মানুষ হতে চায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাই এ বাড়ীতে না এসে পারে না।

মনীষা ঘাড় কাৎ করে এলো চুলগুলোকে বাঁধছে, বয়স হয়েছে তবুও দেহ যমুনায় উছল কামনালাস্যে আজও ভাঁটা পড়েনি। আগেকার সেই মুখচোরা লাজুক ফটিক আজ মাথা তুলে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে। ও দৃষ্টির অর্থ চেনে মনীষা; বুকের অসংযত শাড়ীখানাকে তোলবার বৃথা চেষ্টা করে বলে ওঠে কৃত্রিম রোষে।

—হাঁ করে দেখছো কি!

—কেন তোমাকে। মূক ফটিক আজ বাচাল হয়ে উঠেছে। অর্থ প্রতিপত্তির

সংগে সংগে তার পৌরুষও জেগে উঠেছে। নিজের বুদ্ধি পরিশ্রম দিয়ে অর্থ রোজকার করছে সে প্রচুর, নারীর উপরও তার অধিকার জন্মে গেছে। এতদিনের প্রতীক্ষার পর আজ যেন সেই পরমলগ্ন এসেছে।

চমকে ওঠে মনীষা, সলজ্জ ভীরু চাহনি ওর মিশিয়ে গেছে। ফুটে উঠেছে দুর্দম কামনাভরা একটি সদ্য জাগ্রত পুরুষ, যে ভোগ করতে চায়—পৃথিবীর সব কিছু উপভোগ্যকে নিজের মুঠোর মধ্যে আনতে চায়। মনীষা যেন এইটুকুরই প্রতীক্ষা করছিল।

শচীন কি খেয়াল বশেই ওর বাড়ীর গেটটা পার হয়ে এসে বারান্দায় উঠলো। এ বাড়ীর সব কিছু তার পরিচিত। কত মধু স্বপ্ন রচনা করেছে মনে মনে এই ছায়াঘন বাড়ীটুকুকে কল্পনা করে। তরুণ মনে সে পেয়েছে উৎসাহ—কর্মপ্রেরণা; ডাগর দুচোখের চাহনির মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলতে চেয়েছিল সে। হঠাৎ ওপাশের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো; আবছা অন্ধকারে দেখতে পায়—দুটো ছায়ামূর্তি চকিতের মধ্যে সরে গেল দুদিকে।

—কে?

মনীষা বের হয়ে এলো, কাপড়-চোপড় ঠিক নেই, চুলগুলো এলিয়ে পড়েছে, চোখেমুখে থমথমে একটা উত্তেজনা। বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে,

—হঠাৎ কি মনে করে?

শচীন অবাক হয়ে গেছে। অনুমান করতে পারে ব্যাপারটা। কিন্তু তাকে অবহেলা করার আসলতত্ত্বও প্রকাশ পেয়েছে তার কাছে। কিছু বলবার আগেই মনীষা বলে ওঠে—শরীরটা আমার ভালো নেই; আপনি আজ আসুন।

জবাবের অপেক্ষা না রেখেই মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পথে নামলো শচীন। এত অপমানিত বোধ হয় জীবনে সে হয়নি। বেশ অনুভব করে শচীন—কাজল গাঁয়ে দুটি গোষ্ঠী গড়ে উঠছে। সেদিন ছিল জমিদার আর সাধারণ লোক। আজ সেই শ্রেণীভেদের রূপান্তর ঘটেছে মাত্র; মিলমালিক ব্যবসাদার আর মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ফটিকের মর্যাদা তাই শচীনের থেকে অনেক বেশী। অনেক প্রতিষ্ঠাবান—ক্ষমতাবান সে। মনের রাগ মনে চেপেই পথে নামলো।

নোতুন এস-ডি-ও মিঃ রেনবোকে হাত করতে সকলেই বেগ পায়; ছোকরা ব্যাচিলর। বাংলোর ধারের কাছে ঘেঁসতে দেন না কাউকে। সহরের সুবিধা-ভোগীর দল দু'একবার আলাপ-সালাপ করতে গিয়েও যুত পায়নি। দু'এক কথার পর বলে ওঠে সাহেব,

—হ্যাভ ইউ ফিনিশড্?

অর্থাৎ কাজের কথার পর আর কোনও প্রয়োজন তোমার নেই। কড়া লোক। মহকুমায় কাপড়—ধান চালের অবস্থা দেখে তিনি শিউরে ওঠেন।

কোন গোপন রন্ধ্রপথে সবকিছু ব্ল্যাক হচ্ছে। কয়েক হাজার তুলোর কম্বল এসেছে শীতের আগে বিক্রীর জন্য। সামান্য কিছু বিক্রী হবার পরই—হাজার হাজার কম্বল তলিয়ে গেল কোনদিকে। সারা সহরে তাই নিয়ে আলোড়ন। মিঃ রেনবো শুনে-টুনে চুপ করে যান। সমাজে মেলামেশা করেন, নিজেই মাঝে মাঝে থলি হাতে বাজারে যান।

ফটিক বার কয়েক হাত করবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন ওদের বাড়ীতে বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সহরের গণ্যমান্য সমাজকে নিমন্ত্রন করেছে, মিঃ রেনবোও গেছেন। বিরাট বাড়ী—বারান্দা—ছাদ বোঝাই লোক বসেছে খেতে, তাদের সঙ্গেই বসে পড়েছেন সাহেব···হাত গুটিয়ে ডাল লুচি—রসগোল্লাও খাচ্ছেন, আর সন্তর্পণী দৃষ্টি মেলে দেখছেন চারদিক—গ্রাণ্ড অ্যারেঞ্জমেণ্ট। থাউজ্যাণ্ডস্ অব পিপল। খুব খুসী হয়েছেন।

ভোর রাত্রে পুলিশ ফোর্স হঠাৎ এসে ফটিকের গুদাম ঘেরাও করেছে;···সুরু হলো সার্চ! লোকজন জমে যায়—সারা সহরে তুমুল হৈ-চৈ!

বের হলো সেই তলিয়ে যাওয়া কয়েক হাজার কম্বল। কাল দুপুরে নেমতন্ন খেতে এসে রেনবো নিজে দেখেছে হাজার লোকের পাতার সামনে পাতা রয়েছে নোতুন কম্বল।···দেখেশুনে গিয়েই নিজেই এই কাণ্ড করেছেন।

শচীন আজ আত্মহারা হয়ে ওঠে খুসীতে। মুষড়ে পড়েছেন মাধববাবু। ক্রাউন ভারসাস কেস হবে, তাকেই দাঁড়াতে হবে ফটিকের বিরুদ্ধে সরকারী উকিল হিসাবে।

মালপত্র সিজ করে নিয়ে রেনবো সাহেব বলেন ফটিককে,

—আই স্যাল সি দ্যাট ইউ ল্যাণ্ড ইন জেল।

সারা সহরে তাই নিয়েই বেশ আলোচনা জমে উঠেছে।

শচীন প্রকাশ্য সভায় সেদিন গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে বসলো—ওই মুনাফা-লোভী—ছারপোকাদের বিরুদ্ধে। ওরা সমাজের শত্রু। মানুষের শত্রু। ওদের ন্যায়বিচার হওয়া উচিত।

ফটিক—ফণীবাবুর ছেলে ননী, অবনী হাটী সকলেই গোপন সূত্রে বাঁধা পড়েছে। তারাই সহরের মুনাফালোভীর দল। ফটিক দিন কতক সদরে—কলকাতায় যাতায়াত করছে সঙ্গে ননীবাবুও যাচ্ছে।

ওদিকে সহরে প্রকাশ্যে বের হতে সুরু হয়েছে ভুখা মিছিল, লাল পতাকা হাতে; আর তাদের পুরোভাগে চলেছে শচীন। গলায় শুকনো মালা; আর শ্লোগান দিচ্ছে।

—মুনাফালোভী নিপাত যাক।

—লাঙল যার জমি তার।

শচীন রাতারাতি বামপন্থী নেতা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কোন গোপন কলকাঠি নড়ে উঠেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই বেনরো সাহেব বদলি হয়ে গেলেন। কম্বল কেস কম্বল চাপা পড়ে গেল।

স্তব্ধ হয়ে গেছে সহর। ফটিক—অবনী হাটী—ননীবাবুর দল বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

থানা অফিসার ও পথে ফটিকবাবুকে দেখলে সাইকেল থেকে নেমে কুশল সংবাদ নেন। ননীবাবুর গুদোম আর একটা তৈরী হোল। হাটীমশায় সিমেন্ট টিন লোহার পারমিট সাপ্লাই করেন। তার গুদোমে দেখা দেয় কয়েক লরী গঙ্গামাটি মিহি ফাইন করে গুঁড়িয়ে চলেছে কুলিরা।

...চাকাটা ঘুরছে তবে একটু বেগে। রেণুপদ প্রথমে অবাক হয়ে যায়; এতদিনের পুরানো অফিস ছেড়ে দিয়ে মটর কোম্পানী নোতুন অফিসবাড়ী করছে নদীর ধারে সদর এবং সাঁইথিয়া রোডের উপর। তিনটে রাস্তার মোড়। ফাঁকা মাঠ এককালে নদীর ধারে পড়ে থাকতো; এখন নির্জন পথটাই মুখর হয়ে উঠেছে। নদীর উপর কংক্রিটের পাকা সাঁকো শেষ হয়ে গেছে; এখন কাজল গাঁ এক হয়ে গেছে বাইরের জগতের সঙ্গে।

শ্যাম বলে ওঠে—রেণুদা, অপিস উঠে যাচ্ছে নোতুন বাড়ীতে, এদিকে তো কেউ আসবে না।

চুপ করে ভাবছে রেণুপদ! সব বদলে যাবে। শ্যাম বলে,

—দোকান ঘর ওখানে ভাড়া দিলে তবে পাবো। অনেক ভাড়া—অনেকেই ঝুঁকেছে।

রেণুপদ চুপ করে বেঞ্চিতে বসে ভাবছে। এর মধ্যেই বড় বড় গাড়ীগুলো আর ভিতরে আসে না। এই সরু রাস্তায় সে সব গাড়ী ঢুকতে পারে না। আরও জায়গা দরকার। সেই ঝকঝকে গাড়ীগুলো ওই নোতুন অপিসের কাছেই থাকে; ধোয়ামোছারও সুবিধে, কাছেই নদী, পাম্প বসিয়ে জল তোলা হবে।

…দূর থেকে চেয়ে থাকে রেণুপদ; নোতুন অফিসের দোতালা বাড়ী উঠছে; টিনের শেড দেওয়া গ্যারেজ, কারখানা। ওপাশে লাল রং করা পেট্রল পাম্প। আগেকার সেই খড়ের চাল মাটির দেওয়াল আর আম নারকেল গাছের ছায়া কোথাও নেই। এ এক বিজাতীয় নোতুন পরিবেশ; রেণুপদ তাকে আপন বলে মেনে নিতে পারে না। পুরানো মটর অফিস ছিল ঘরের মতই, ওটা তার নেহাত অচেনা।

মঞ্জু বাড়ী হতে বেরই হয় না; সমস্ত লোক যেন তার দিকে চেয়ে রয়েছে কি এক কৌতূহলী দৃষ্টিতে। তীরের ফলার মত এসে বেঁধে ওদের নীরব চাহনি। গরীব হওয়া অপরাধ; অপরাধ সুন্দরী হওয়া, সবচেয়ে বড় অপরাধ তার বি. এ. পাশ করা। ইচ্ছে ছিল এম. এ.টা দেবে, কিন্তু সে মন এখানে যেন মরে গেছে। কাজল গাঁয়ের বিষাক্ত হাওয়ায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। একদিন সে ভালবেসেছিল এই কাজল গাঁকে; বাবা সেদিন বেঁচে ছিলেন; ভাল লেগেছিল এর শ্যামল পরিবেশ; মণিকে মনে পড়ে অকারণেই। ওই বাগানের আলোছায়ায় কতদিন কেটে গেছে কোন মাণিকের সন্ধানে রঙীন প্রজাপতির পিছু পিছু। মধ্যদিনে ভেসে আসতো রাখাল বাঁশীর সুর; আজ সে সব স্বপ্ন।

সরমা মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে, ফোটাফুলের শুকনো হয়ে ঝরে যাবার কথা মনে পড়ে, তেমনি একটি মলিনতা ঘিরে রয়েছে মঞ্জুকে, ও যেন ঝরে যেতেই চায়। আজ নিদারুণ বেদনায় ভরে ওঠে সরমার মন।

—দেশের বাড়ীতেই ফিরে চল মঞ্জু।

মঞ্জু যেন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে এইখানকার জীবনে—তাই চল মা। কাজল গাঁ আর ভাল লাগছে না।

সহরের অনেকেই কথাটা শোনে ; রমণবাবুর শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যাচ্ছে : সহরের বুক থেকে বাস কোম্পানীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, সেই সৌম্য শিখা তিলকধারী সুন্দর লোকটি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, অবশিষ্ট আছে তাঁর বাড়ী বাগানটুকু, তাও বিক্রী করে দিয়ে ওরা ফিরে যাচ্ছে দেশে।

কথাটা অনিমেষ শোনে অবনী হাটীর কাছে সেদিন রোগী দেখতে এসে,—দুঃখ হয় মশায়, লোকটা একজীবনে বড়লোক হোল, আবার একজীবনেই সব চুকিয়ে দিয়ে চলে গেলো।

অনিমেষ ঠিক বুঝতে পারে না ; হাটীমশায় হুঁকোয় টান দিতে দিতে বলেন,

—ওই যে রমণবাবু ; ওর স্ত্রী আর মেয়ে চলে যাচ্ছে এখান থেকে বাড়ী বাগান বিক্রী করে দিয়ে।

চমকে ওঠে অনিমেষ ; কেন যাচ্ছে তা বেশই অনুমান করতে পারে। বিনা প্রতিবাদে নীরবে সব অপমান মিথ্যা কলংক মাথায় নিয়ে সরে যেতে চাইছে মঞ্জু। হাটীমশায়ের কথাগুলো কানে আসে—লোকটা সজ্জন ছিলেন, অবশ্য আমিও দাম কম দিচ্ছি না, মিলিয়ে আটহাজার টাকা বলেছি।

অনিমেষ কথাটা যেন শুনতে পায় না। কোন রকমে একটা প্রেসক্রিপশন করে যা বলবার কোনরকমে বলে-কয়ে পথে বের হয়ে এল।

সন্ধ্যা নেমে আসে। সরমা প্রদীপ জেলে আজ কান্নায় ভেঙে পড়ে ; আর ক'দিনই বা থাকবে তারা এখানে। কাজল গাঁয়ের চলমান জীবন তাদের ছিটকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। যোগ্যতার মাপকাঠিতে তারা এখানে বাস করবার অধিকার হারিয়েছে। বার বার মনে পড়ে স্বামীর মুখখানা—মেয়েকেও পাত্রস্থ করতে পারেনি। এখানে থাকলেও হবে না। অন্যত্র সরে গিয়ে যদি ব্যবস্থা করতে পারে সেই চেষ্টা দেখবে।

...মঞ্জু বাইরের ঘরে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে ; সারা মনে একটা বিষাদের ছায়া ; দেশের বাড়ীতে বিশেষ যাতায়াত তাদের নেই, ছিল না। সহরের অভ্যস্ত জীবন-

যাত্রা থেকে ছিটকে গিয়ে গ্রামের পরিবেশে কি ভাবে কাটাবে তা ভাবতেই পারে না। নিজের মনের মধ্যে পরাজয়ী মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে! বাবা মারা যাবার পর হতেই সংগ্রাম করে সে আজ ক্লান্ত পরাজিত। গাছ-গাছালির মাথায় জোনাকির মিটমিটে আলো রাত্রির অন্ধকার রহস্যময় করে তুলেছে। মনে হয় তার জীবনেও অমনি পুঞ্জীভূত অন্ধকার বেড়াজাল পেতেছে; সূর্যের আলো কোনদিনই সেখানে পৌঁছবে না সেই নিরন্ধ্র পুরীতে।

—কে?

—আবছা অন্ধকারে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অনিমেষ; মঞ্জুর থমথমে মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে সে।

—আপনি! অবাক হয় মঞ্জু,—হঠাৎ কি মনে করে?

অনিমেষ এগিয়ে এলো ধীর পায়ে; সামনের মোড়াটায় বসলো। দুজনেই নীরব। কয়েক মাসের মধ্যেই যেন তাদের মধ্যে একটা অতলস্পর্শী ফাঁক গড়ে উঠেছে। দুই প্রান্তে দুই হিমশৈল, মধ্যে সেই পাতালসই গহ্বর। আলোটা ম্লান আভায় ভরে তুলেছে ঘরখানা; অনিমেষ চেয়ে রয়েছে মঞ্জুর দিকে। সমস্ত কথা তার হারিয়ে গেছে ওই দৃষ্টির সামনে। আগেকার থেকে আরও সুন্দর হয়েছে মঞ্জু; দুঃখের আগুনে পুড়ে কাঁচাসোনার মত আভা ফুটে উঠেছে ওকে ঘিরে।

—মঞ্জু!

কথা কইল না মঞ্জু—মুখ তুলে চাইল ওর দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে।

সেই মুখরা চঞ্চল মেয়েটিও থমকে গেছে ওর সামনে। হারিয়ে ফেলেছে তার সহজ সারল্য।

—চলে যাচ্ছো বাড়ী বিক্রী করে দিয়ে শুনলাম?

—হ্যাঁ; ছোট্ট একটু জবাব দিল মঞ্জু। বুক চেরা আর্তনাদ যেন ক্ষুদ্র ওই কথাতেই ফুটে উঠেছে।

—যদি যেতে না দিই?

কিছু বললো মঞ্জু, মুখ তুলে হাসলো একটু, মলিন বিষণ্ণ হাসি, জমাট কান্না তার স্তরে স্তরে মেশানো রয়েছে। ওটা একান্তই অবাস্তব—এই বিশ্বাস মঞ্জুও করছে। অনিমেষ নিজেকে ক্ষুদ্র বলেই মনে করে ওই মেয়েটির সামনে। কোন

অভিযোগ ও করে না, করে না কোন প্রতিবাদ। নীরবে যারা সরে যায় আঘাত দিয়ে যায় তারাই সবচেয়ে বেশী।

—সব কথাই শুনেছি মঞ্জু: আজ আমার কর্তব্য বলে একটা বস্তু আছে। তোমাকে এইভাবে নীরবে সরে যেতে আমি দোব না।

—তবে কি যেটুকু বাকী সেটুকুও কেড়ে নিতে চান? মঞ্জুর কণ্ঠে অসহায় বেদনা।

—ওদের সকলের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস, সামর্থ্য আমার আছে। তুমি যদি পাশে দাঁড়াও—আমি সব সহ্য করতে পারবো।

মঞ্জু চমকে ওঠে, এ যেন অন্ধকারের বুকে দূর আলোর স্বপ্ন দেখছে সে। কিন্তু সে আলো না আলেয়া তা ঠিক বুঝতে পারে না। একদিকে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে শূন্যহাতে বিদায় নেওয়া, অন্যদিকে শূন্য অঞ্জলি অমৃতের প্রসাদে পূর্ণ করা, এ যেন ঊষর মরুভূমিতে—পাখী ডাকা শ্যামল মরূদ্যানের সন্ধান। অনিমেষ আজ অধৈর্য হয়ে উঠেছে; জীবনে কাজ কাজ শুধু কাজ; মানুষটি কোথায় কাজের ভিড়ে চাপা পড়ে গিয়েছিল—সে আজ জেগে উঠেছে বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষা নিয়ে।

—জবাব দাও মঞ্জু; এ তোমার আমার দুজনেরই চাওয়া পথ। সেদিন বুঝিনি কি চাই; আজ হারাবার কথা উঠতেই দেখলাম হারাতে তোমাকে পারি না।

মঞ্জুর দুচোখে জল নেমে আসে, এ যেন স্বপ্ন দেখছে সে: কোন এক মায়াচ্ছন্ন লোকে—চেতনা প্রত্যুষে সে ফিরে গেছে। সবুজ রোদের আভায়, পাখী ডাকা বনে বনে চলেছে কার সঙ্গে—অচেনা সেই সাথী, তবু মধুর সেই সঙ্গ। হঠাৎ দেখে পাশে ওই অনিমেষ!...

—মঞ্জু! ওর ব্যাকুল আহ্বান তার দেহে রোমাঞ্চ আনে। অতল তমসার বুকে কি যেন নীল সঞ্চরণশীল শিখার দীপ্তি! আজ মঞ্জু ওকে বাধা দিতে পারে না; ওদের রটনার মূলে কোন সত্য না থাক—হোক ওরা মিথ্যাবাদী; তবু ওদের আজ সে ক্ষমা করেছে। কাজল গাঁ যেন সোনার কাঠির পরশে তার ঘুম ভেঙে দিয়েছে—নোতুন প্রাণ স্পন্দন এনেছে ধমনীতে।

...অনিমেষ আজ খুঁজে পেয়েছে জীবনে বাঁচবার উদ্দেশ্য; শুধু কাজটাই

জীবনের সব নয়; কাজ পেরিয়েও আছে একটি মানুষ, সে শান্তি চায়, ভালবাসা চায়, হঠাৎ সেই মনটিকে আজ অজানতেই আবিষ্কার করে ফেলেছে।

মঞ্জুর উষ্ণ নিঃশ্বাস তার কপোলে; স্বল্পালোকে কি যেন অপূর্ব রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে; ওই সুগৌর দেহের অন্তরালে অন্য জগতের প্রবেশ পথ ওই দুটি দৃষ্টিপথে অনিমেষ আজ নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায়; ওকে হেলায় বিদায় দিলে অন্যমনে সে নিজেরই অনেকটুকু হারাতো।

অনেকেই এসেছিল ওদের বিয়েতে, আসেনি শুধু একজন। সে মনীষা।

...কথাটা শুনে অবধি স্তব্ধ হয়ে যায় সে; নীরবে কি যেন ভাবছে। আজ মনে হয় কোথায় নিদারুণ ভাবে পরাজিত হয়েছে সে, নিবিড় ব্যর্থতা তার সারা মনের সমস্ত আনন্দকে গ্রাস করেছে। হঠাৎ আবিষ্কার করে সে মূল্যহীন পুতুল—কাজল গাঁয়ের উচ্চকোটির সমাজের ইসারায় নেচে চলেছে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে, নিজের মনকে কোন দিনই চেনবার সুযোগ পায় নি, সামনে যা পেয়েছে তাই-ই সে বুকে তুলে নিয়েছে—ভেবেছে এই তো জীবন। কিন্তু কাঞ্চন ধুলোয় ফেলে সে কাঁচই কুড়িয়ে আঁচলে গেরো বেঁধেছে আজ হঠাৎ তাই অনুভব করে চমকে ওঠে। গুমরে কাঁদে বুভুক্ষু মন।

ফটিক বিধানসভার ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে, তাই নিয়েই ক'দিন ব্যস্ত ছিল; ও পক্ষে শচীনই দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে। ফটিককে কি যেন এক নেশায় পেয়ে গেছে; কংগ্রেস টিকিট পেয়েই সে আশায় মেতে উঠেছে। চোখের সামনে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মনে পড়ে মেয়েমহলে কাজ করবার জন্য একজনকে প্রয়োজন; মনীষাকে তার দরকার।

মনীষা ওর কথা শুনতেই চমকে ওঠে, সারামনে আজ তার স্বচ্ছদৃষ্টি। শচীনও এসেছিল তার কাছে; সিনেমা হাউস হয়েছে; ফটিকবাবুও পেয়েছিলেন কাপড়ের পারমিট, চাল ধানের লাইসেন্স—তার জন্য মনীষাকে বারকয়েক সদরে যেতে হয়েছে, আজ এসেছে ফটিক বৃহত্তর নেশায়, মনীষা যদি তাকে সাহায্য করে —তবে তার কথা কোনদিনই ভুলবে না ফটিক।

—রাজরাণী করে দেবেন নাকি?

মনীষার কণ্ঠস্বরে শ্লেষ ফুটে ওঠে। ফটিক একটু ঘাবড়ে যায়, আমতা আমতা করে,

—রাজাই নেই, তার রাজরাণী; আপনার সাহায্য না পেলে আমি যে হেরে যাবো,

মনীষার মনের সব সুর ছিঁড়ে গেছে। হাহাকারে ভরে গেছে তার মন। জীবন তার কাছে অর্থহীন—শূন্য।

শুষ্ক কণ্ঠে বলে সে, আমি তার কি করতে পারি? আমাকে সহরের পি. ডবলু. ডি. ভেবেছেন নাকি?

যার যা দরকার এসে চানা দেবেন? এর জন্য আমি এখানে আসি নি। আমাকে মাপ করুন আপনারা।

ফটিক যেন আকাশ থেকে পড়ে; হয়তো শচীনের জন্য কাজ করবে মনীষা; বলে ওঠে—যা দরকার; মানে টাকাকড়ি পাবেন, কিছু না হয় নিয়েই রাখুন। শচীন ওসব দেবে কোত্থেকে? ও একটি 'ফোরটোয়েনটি'।

ফটিক ইদানীং খদ্দরের পাঞ্জাবী পরতে সুরু করেছে, পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সরু রবারের গার্ডারের বাঁধা একতাড়া নোটের বাণ্ডিল থেকে কতকগুলো নোট টেনে বের করলো।

মনীষা স্তব্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে; টাকাই ওদের সবকিছু; দেহ-মন-পরিশ্রম-সাহচর্য ওরা টাকা দিয়ে কিনতে চায়; ওদের কাছে অন্তরের দাম স্থির হয় ময়লা কাগজের তেলচিটে মার্কা নোটে।

বিরক্ত হয়ে ওঠে,—মাপ করুন, আমার শরীর বইছে না, আমাকে রেহাই দিন।

—মনীষাদেবী; প্লিজ—হাতটা ধরে ফেলে ফটিক, দরকার হলেও আজ পায়েও ধরে বসবে।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে ওঠে কঠিন কণ্ঠে,—আপনি যান। আমার যা বলবার—আমি বলেছি। যান্—

মাধববাবু দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন ফটিকের দেরী দেখে, তিনিও গাড়ীতে বসেছিলেন। দরজার কাছ থেকে মনীষার কণ্ঠস্বর শুনেই একটু অবাক হয়ে যান; ওকালতি মেজাজ—সহজে চটেন না; মনের ক্ষোভ মনে চেপে বলে ওঠেন,

—একটু ভুল করলে মা ; ফটিক এম. এল. এ. হবেই। স্কুলের হর্তাকর্তা এখনও। ওকে চটিয়ে এখানে কাজ করা যাবেনা, তোমার ভালর জন্যই বলছি।

মনীষা ঘৃণা হতাশা মিশানো দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে ; মনে মনে সে কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে ; কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয়,

—যা বলবার আমি বলেছি। তারজন্য যা করা দরকার আমি করবো। আপনারা আসুন, নমস্কার।

—শচীনের হয়েই কাজ করছো তাহলে ? মাধববাবু কথাটা বলে বসতেই মনীষা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় ; তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে—আমার কথা শুনেছেন এইবার যান।

—আচ্ছা ! ফটিক যেন গর্জন করে ওঠে সদর্পে।

মাধববাবু তাকে টেনে আনলেন বাইরে ; নীল ভুঁইহার রক্তে আগুন জেগে উঠেছে। গজরাতে থাকে—উঃ শচীনের পেয়ারের লোক আছে মাধব দাদা, আমি সবকে ঢিট্ করে দেব।

বাইরে থেকে কথাটা কানে আসে মনীষার ; ওই হীন মন্তব্যে প্রতিবাদ করার সামর্থ্যটুকুও ওর নেই।

আজ তার জীবনে এসেছে ফুলঝরানোর পালা। এতদিন কাজল গাঁকে ভালবেসেছিল—নিজের ঠাঁই খুঁজে নিয়েছিলো এরই মধ্যে। আজ মনে হয় এতবড় ভুল জীবনে আর সে করেনি। নিষ্ফল কান্নায় গুমরে কাঁদে মন। শচীন—ফটিকবাবু, মাধব উকিল সবাই একই জাতের জীব, মনীষা ওদের বহুমূল্য দিয়ে চিনেছে—কাজল গাঁ আজ তার কাছে নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। অনিমেষের কথা মনে পড়ে—অজ্ঞাতেই তাকে ভালবেসেছিল, কিন্তু সেই ভালবাসাকে নিঃশেষে হত্যা করতে চেয়েছিল মনীষা বাইরের বৃহত্তর জগতের আহ্বানে। সেই ব্যর্থ প্রেমই তাকে দুর্বার গতিতে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে তার ব্যর্থ অন্তর। আজ আর অবশেষ কিছুই নেই।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কাজল গাঁয়ের আকাশে নামছে নিবিড় তমসা—মনীষার সারামনেও তার সংক্রমণ। কোথাও এতটুকু স্নিগ্ধ তারার আলোও চোখে পড়ে না। কাজল গাঁয়ের অধ্যায় তার জীবনে শেষ হয়ে গেছে।

মিট মিট করে জ্বলছে কেরাসিনের বাতি। নদীর ধারে নোতুন মটর অপিসে

লোকজনও বিশেষ নেই রাত্রির ট্রিপ ছাড়বার আয়োজন চলছে। ওদিকে পেট্রল পাম্পের কর্মচারী বাইরে খাটিয়ে বের করে শোবার ব্যবস্থা করছে—অনিমেষ পেট্রল নিয়ে ফিরছে বাড়ীর দিকে হঠাৎ হেডলাইটের আলোয় সামনেই মনীষাকে দেখে চমকে ওঠে। একটা রিক্সা থেকে মালপত্র গাড়ীর ছাদে তুলছে; বাস-হোল্ড-অল টুকিটাকি কি সব। হঠাৎ অনিমেষকে আলোতে দেখে চমকে ওঠে মনীষা। তা-হলে নিজ'ন রাতের অন্ধকারে সে চ'লে যাচ্ছে কাজল গাঁ ছেড়ে—কারোও সঙ্গে দেখা করতে চায়নি—হয়তো মনের দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে বলে। যাকে সবচেয়ে বেশী এড়াতে চেয়েছিল—সেই অনিমেষই এসে যেন পথরোধ করে দাঁড়াল তার। বেশ অবাক হয়ে গেছে—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে।

কথা কইল মনীষাই—চলে যাচ্ছি এখান থেকে, বাইরে একটা কাজ নিয়ে।

যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে।···সেই তেজদৃপ্তা নারী আজ কোথায় হারিয়ে গেছে, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সে, পরাজিত হয়েই পশ্চাদপসরণ করছে রাতের অন্ধকারে। ওর মুখে চোখে সেই দীনতা।

—চলে যাচ্ছো ?···কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না অনিমেষ। মনীষার কি এমন ঘটলো ঠিক ভাবতে পারে না। হয়তো ফটিকবাবু—শচীনের সঙ্গে কোন মতানৈক্য ঘটেছে। তবুও প্রশ্ন করে অনিমেষ,—কেন ?

মনীষা ওর দিকে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে; সে কি জানে না মনীষার মনের গোপনতম সংবাদ; ব্যর্থ পরাজিত হয়েছে মনীষা—মঞ্জুই তাকে ব্যথা দিয়েছে সব থেকে বেশী, ফটিক—শচীনের দেওয়া আঘাত থেকেও অনেক বেশী ব্যথা দিয়েছে মঞ্জু; সে-ই ছিনিয়ে নিয়েছে তার সব স্বপ্নসাধ।

সে তুমি বুঝবে না। বোঝানও যাবে না তোমায়।

বেদনাসিক্ত কণ্ঠে জবাব দেয় মনীষা। রাতের বাতাস শিউরে ওঠে; ভেসে আসে কোন রাতজাগা পাখীর ডাক, একটু ম্লান সৌরভ; মনীষাকে হারাতে সেও ব্যথা পায়।

—না গেলেই কি নয় ? অনুরোধ করছে অনিমেষ।

মনীষার চোখের তারায় নিবিড় মায়া; অনিমেষের গোপন মনে আজও ঠাঁই তার আছে। কর্তব্যবোধে সে এই পথ নিয়েছে—কিন্তু মনের কোণ হতে মনীষাকে আজও বিসর্জন দিতে পারেনি। এই স্মৃতিটুকু নিয়েই যাবে মনীষা। ওরা সুখী হোক।

—তা আর সম্ভব নয়। কঠিন কণ্ঠে উত্তর দেয় মনীষা।

সে তার পথ ঠিক করে নিয়েছে। আজ সে শান্তি পেতে চায় দূরে গিয়ে।

—চল, তোমাকে পেঁাছে দিয়ে আসি। অনিমেষ এতটুকু সান্নিধ্য ও পেতে চায় সারা মন দিয়ে।

—না! বাসেই যাচ্ছি। রাত হয়েছে তুমিও ফিরে যাও, মঞ্জু হয় তো ভাববে।

…অনিমেষ জবাব দিল না, ওর দিকে চেয়ে থাকে। মনীষা নীরবে গিয়ে বাসে উঠলো। পিছন ফিরে চাইলো না একবারও। কাজল গাঁকে পিছনে রেখে এগিয়ে গেল সে। হারিয়ে গেল সে কোন অজানা পথে।

…একাই দাঁড়িয়ে আছে অনিমেষ অন্ধকার পরিত্যক্ত পথের ধারে, বাস চলে গেছে। কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। নদীর জলে কাঁপছে তারার আভা—বাতাসে হাহাকার জাগে। মনীষা চলে গেল, কাজল গাঁয়ের জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তনই আসবে না, তবু অনিমেষ তাকে ভুলতে পারে না। কাজল গাঁয়ের ইতিহাসে একটু মধুরতম ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সেও করে গেলো। যমুনার কথা মনে পড়ে—সে এমনি ব্যর্থ হয়ে অসহ্য জ্বালায় নিজেকে নিঃশেষ করেছিল। মনীষা তার সামান্যতম ব্যতিক্রম মাত্র।

মণি আজ সকলেরই উপর শ্রদ্ধা বিশ্বাস হারিয়েছে। জীবনে আঘাতের পর আঘাতই পেয়েছে সে। মঞ্জু তাকে কোনদিনই চেনবার চেষ্টা করেনি। বাবাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করতে তার বিবেকে বেঁধেছে। তারই জন্য নীরবে মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েছে মঞ্জুর সমস্ত আঘাত—অবহেলা।

বাবার সম্বন্ধে ধারণাও তার বদলে গেছে। চুরমার হয়ে গেছে সব শ্রদ্ধা, ভালবাসার স্বপ্ন। মঞ্জু তার ভালবাসাকে পায়ে দলে পিষে গেছে, আর বাবা! শিউরে ওঠে সে একটি আবছা সন্ধ্যার দুঃস্বপ্নের কল্পনা করে। কিন্তু স্বপ্ন তা নয়। কঠিন সত্য। শ্রদ্ধাও হারিয়েছে সে নিদারুণ বেদনায়। পাগলীর কথাই সত্যি; বাইরের বাড়ীতে সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে হঠাৎ ব্যাপারটা দেখে শিউরে ওঠে সে। ওর পায়ের শব্দে ছায়ামূর্তি দুটো সরে গেল দুপাশে। তারার আবছা আলোয় দেখে—হ্যাঁ সেই মটু বাড়ীউলিই।

বাবার উপর বিষিয়ে উঠেছে সারামন। কে বলছিল তার মা নাকি আত্মহত্যা

করেছিল ; বিশ্বাস করেনি প্রথম কথাটা। আজ মনে হয় হ্যাঁ—সত্যই। শয়তান অর্থপিশাচ ও সব পারে।

অত্যধিক পরিশ্রম অনিয়মেই ভেঙে পড়েছে তার শরীর। মন ভেঙেগেছিল অনেক আগেই। কাউকে জানায় নি, রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত ফুঁসেছে অন্তরে অন্তরে। আজ শয্যা নিয়েছে।

সব আলো নিভে আসছে, স্তিমিত হয়ে আসছে উৎসাহ।…জীবন তার সঙ্গে এমনি নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করবে কল্পনাও করেনি মণি। কয়েক বছরেই সে পাঁচখানা ট্রাক করেছে নিজের চেষ্টায়—বেশ কিছু রোজকারও করেছে। আজ সব ছেড়ে দিয়েছে শয্যা নিয়েছে। অখণ্ড একক অবসরভরা জীবন—এই ভালো। প্রশান্তির গভীরে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে জন্মান্তরের স্বপ্ন দেখে জ্বরের ঘোরে। দুরারোগ্য রোগ ধরেছে তাকে।

সংবাদটা সহরে ছড়িয়ে পড়ে কয়েকদিনের মধ্যেই। মণি টি. বি-তে ভুগছে। প্রায় নাকি শেষ অবস্থা। রেণুপদ কথা বললো না, আকাশের দিকে চেয়ে থাকে দাড়িগোঁফ ভরা মুখ তুলে। শ্যাম এক গেলাস চা তুলে দেয়,

—নাও গো রেণুদা।

রেণু বলে উঠে—ভগবান আছে বুঝলি শ্যাম। ও বামুনের সর্বনাশ হবে দেখেনিস্ তুই। পথে বসিয়েছে ঠাকুরমশায়কে। নিপাত যাবে ও!

শ্যাম কথা বলে না। মটর অফিস উঠে গেছে এখান থেকে। নির্জন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে কর্মমুখর জায়গাটা। শ্যামের দোকানে খদ্দের-পত্রও নেই।

—দোকান তুলে দিচ্ছি রেণুদা, কালই ঝাঁপ বন্ধ করে দোব। কাঁহাতক ধুনো দেব এখানে বসে।

—দোকান তুলে দিবি? কেন? এমন নামকরা জায়গা, সহরের নাক।

আফিস চলে গেছে, এ বনেবাদাড়ে কে আসবে? ওদিকে লোকজন টিনের চাল খুলছে। একমাত্র এই দোকানখানাই ছিল, এইটা চলে গেলে জায়গাটা জনহীন হয়ে যাবে। ওই দোকান গড়তে দেখেছে রেণু, আজ শাবলের ঘায়ে সব ভেঙে ফেলছে তারা। রেণু ক্লান্ত কণ্ঠে বলে,

—ভাগ, সবাই গেল, তুই বা থাকবি কেন? যা নদীর পলিতে, বানের সময়

চুরোনি খাবি। বুঝলি, ঠাকুরমশায় তখনই প্রথম আফিস করতে চেয়েছিল ও-খানেই; না, করেছিল এই শম্মা। আজ সেই এঁটো পাতই চাটছিস্ তোরা।

মণি একাই পড়ে আছে বিছানায়। মা নেই, বৌদিরা কেউ বড় একটা আসে না, পিসীমা কাজে ব্যস্ত, বাবা দরজার বাইরে হতে খবর নিয়েই সরে যায়। চিরকালই ওদের অবাধ্য, আজ সে অসহায়—কেন তারাই বা সাহচর্য দেবে। একাই কাটে তার দিন—নির্জন নদীতীরের দোতলার ঘরে; দিন দিন প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। কাজল গাঁয়ের নুইয়ে পড়া আকাশ সীমার দিকে চেয়ে থাকে, ও যেন কোন অতীত রাত্রে দেখা একটি স্বপ্ন—তারই ঘোরে সে বার বার গেছে ওই পথ দিয়ে কোন সুদূর চেতনার প্রত্যূষে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কৈশোরের দিনগুলো—মঞ্জুর কথা; বাগানের মাঝে তারা দুজনে! কত ঘুঘুডাকা উদাস গেরুয়া রোদ মাখা অপরাহ্ণ।

হঠাৎ পায়ের শব্দে পিছন ফিরে চাইল মণি। স্বপ্ন যেন মূর্তি ধরে তার সামনে এসেছে—তুমি!

বিশ্বাসই করতে পারে না সে। মঞ্জু এসেছে তার ঘরে, মেঘের আড়াল দিয়ে এক ঝিলিক আলোর মত মাধুর্য নিয়ে; দুচোখে ওর নিবিড় পুঞ্জীভূত বেদনা।

মঞ্জু এসে বসলো তার পাশের চেয়ারটায়।

—কেমন আছো?

একটু হাসলো মণি; তারার আলো আধারের বুকে প্রতিবিম্ব তুলেছে ক্ষণিকের জন্য। আজ সব গতি প্রাণস্পন্দন যেন স্তব্ধ হতে চলেছে, চোখেমুখে ওর কালোছায়া, কোন দূর জগতের আহ্বান তার দুচোখের তারায় তারায়।

—জোড়াতালি দিয়ে যে ক'টা দিন চলে। তার পরই থেমে যাবে সব কিছু। দেখলাম, দুনিয়ায় আমাদের চাওয়া-পাওয়া অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, বিদ্রোহ করলেও—তার কম বেশী হয় না। আজ তাই নিঃশেষে কোন অদৃষ্টের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। এ যেন খেয়াঘাটে পারের যাত্রী, যা করবে ওই মাঝি।

মঞ্জু ওর কথাগুলো শুনে চলেছে নিবিড় হতাশা ঝরে পড়ে ওর কণ্ঠে—তুমিই এ সর্বনাশ ডেকে এনেছো ইচ্ছে করে।

—এর জন্য কৈফিয়ৎ দেবার কেউ নেই। কারো কাছে কোন ঋণ আমি রেখে যাইনি।

মঞ্জুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে কৈশোরের একটি দিন, বাগানের ওদিকে জামরুল গাছের নীচে বসতো তারা। বলেছিল মণি,

—তোকে যদি অন্য কেউ বিয়ে করে নিয়ে যায়, আমি তাকে এই ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে দেব বুঝলি? সার্টের পকেট থেকে আমকাটা ছুরিখানা বের করে। মঞ্জুকে বলে ওঠে,

—তোরও বিয়ে হবে না, আমারও না।

—তবে? জিজ্ঞাসা করে বিস্মিত কণ্ঠে মঞ্জু।

—এমনিই কাটবে দিনগুলো।

সেই দিনগুলো এমনি চৈতী সন্ধ্যার ঝরাপাতার মর্মরে মিশে আছে আজও!

সবচেয়ে নিদারুণ আঘাত দিয়েছে সে-ই, সব আঘাত যে দ্বিগুণ হয়ে তার বুকে ফিরে আসবে কোনদিনই ভাবেনি।

—বাবার সঙ্গে আপোষ করতে পারিনি। যদি মরেই যাই—অন্তত: তুমি জেনে যাও প্রতিবাদ আমি করে গেছি অন্যায়ের।

—কেন জোর করে কেড়ে নাও নি তোমার দাবী? মঞ্জু আর্তনাদ করে ওঠে।

—সবকিছু জোর করে নেওয়া যায় না মঞ্জু। মনের নাগাল পেতে মনই পারে। সেইটুকু হারিয়ে আমি অন্য কিছু পাওয়ার নেশায় ডুবিয়ে দিয়েছিলাম নিজেকে, কিন্তু সে ফাঁক আমার ঘোচেনি। তবু ক্ষোভ নেই—একদিন আমি পেয়েছিলাম, তারই স্মৃতি আজও অক্ষয়। সেটুকু কেড়ে নিতে পারেনি—সে আমারই।

মঞ্জুর দুচোখে জল নেমে আসে। অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মঞ্জু। সামনে তারই রঙ্গীন শৈশব আজ কেঁদে চলে গেল মৃত্যুর অন্তরালে। শৈশবের সেই দিনগুলোর একটু পরিচয়ও নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে।

—বেলা পড়ে আসছে মঞ্জু, তুমি যাও।

—আলো দিয়ে যাবে না?

—যাবে, যখন ইচ্ছে। আঁধারেই বেশ আছি। এখন থেকেই চিনতে চেষ্টা করছি অন্ধকারকে। এতদিন চিনিনি; আজ দেখছি সব দুঃখের অবলুপ্তি ওই অন্ধকারেই। বিস্মৃতি তাই অন্ধকারময়, মৃত্যুও তাই কালো।

অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে মঞ্জু; কাছের অতি আপন ওই মানুষটি আজ কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ওকে ধরা যায় না, ও ধরাছোঁয়ার বাইরে কোন সুদূর আকাশের তারা।

মণিকে বাঁচাতে পারে নি। মণি চলে গেল। কাজল গাঁয়ের কোন ছন্দ পতনই ঘটলো না। কয়েকদিন আলোচনা হ'ল মুখে মুখে।

কথাটা সকলেই শুনেছে, মণির নিজের রোজকার প্রায় হাজার পঁচিশ টাকা তাই দিয়ে হাসপাতালে নোতুন ওয়ার্ড খোলা হচ্ছে। মণি নিজের হাতেই সব দান করে গেছে। জীবনে যা করতে পারে নি—মৃত্যু দিয়ে তাই করে গেছে। ফণীবাবুকে অস্বীকার করে গেছে মণি সম্পূর্ণভাবে।

সবাই ভুলেছে মণিকে—ভোলেনি শুধু একজন। অলস মধ্যাহ্ন বেলায়, সন্ধ্যার নিবিড় রক্তরাগে—শিশু চাঁদের হাসিমাখা চৈতীরাতে বসন্ত বাতাসে এক জন আজও খোঁজে তাকে। সে অন্য কোন এক মানসী, জানে না মঞ্জু। বাতাসে বাতাসে হাহাকার জাগে জাগর রাত্রির তারাজ্বালা প্রহরে।

কাঁদছে গঙ্গামণি; কাজল গাঁয়ের বিষাক্ত মৃত্যুনীল বিষ জর্জর অন্তরাত্মা, বিগত দিনের শোকে। বিষের জ্বালায়—অতৃপ্ত বুভুক্ষায় কাঁদছে সে রাতের অন্ধকারে। বাতাসে বাতাসে ওর অভিশাপ।

—মর মর তোরা! ওয়াক্ থু—থু—থু।

পথে পথে ঘুরে বেড়ায় আধ পাগল রেণুপদ—কাজল গাঁয়ের অতীত।

যমুনা কেঁদে গেছে; কেঁদে গেছে তার সারা মন নিদারুণ অপমানে; ব্যর্থ হয়ে বিদায় নিয়েছেন মদনবাবু—সমাজের শুভ বুদ্ধি হার মেনে গেছে অকল্যাণের স্তূপমূলে, চোখের জলে দৃষ্টিপথ ঝাপসা করে ফিরে গেছে মনীষা শূন্য হাতে। দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে এগিয়ে চলেছে ফটিকবাবু ভাগ্যের সিঁড়ি বয়ে।

কাজল গাঁয়ের জীবনযাত্রাও চলেছে নিঃশব্দে, আপনার গতিপথে।

বারদেউলের স্তূপ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মহাকাল মূর্তির পায়ের নীচে ধূপ জ্বলছে—মিটিমিটি জ্বলছে প্রদীপ। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে—কোথাও ওর গায়ে বিন্দুমাত্র জীর্ণতা আসে নি। কয়েক শতাব্দী আগে ওর সামনেই ঘটেছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন—আজও সেই পরিবর্তন ধারা জীবনে জীবনে বয়ে চলেছে, কাজল গাঁয়ের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী কষ্টিপাথরের দেবতা—ওই মহাকাল।